মকা

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র এত সুপরিচিত লেখক যে তাঁর পরিচয়ের জন্য
।মিকার কোনও প্রয়োজন আছে বোলে মনে হয় না। তবুও যাদের
।ধু চেষ্টায় বইখানি প্রকাশের আলো পেল, হয় তো বইখানিকে পূর্ণাংগ
রার জন্যেই তাঁদের ভূমিকার একটা দাবী যে আছে, সে বিষয়ে আমার
ণ্ছুমাত্র সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্রের জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে আমার বহু দোষ-ত্রুটি থেকে
।ছে। কল্লোল মাসিক পত্রে এই কাজের শুরু হয়। সর্বাংগসুন্দর করার
বয়সে আমার ইচ্ছা থাকলেও সেটা হয়নি শরৎচন্দ্রকে যাঁরা আমার
।য়ে বেশী ভালোবাসতেন তাঁদের আশঙ্কা নিবারণের জন্যে; শরৎচন্দ্রের
নুরোধেই সে লেখা বন্ধ কোরতে আমি বাধ্য হোয়েছিলাম।

ছেলেমেয়েরা পুতুল সাজায় তার নির্মাণের দোষ-ত্রুটি ঢাকার জন্য।
।কালে প্রতিমার সাজ হোত এক রকম; কালের পরিবর্তনের সংগে
।গে তার বদল হোয়ে যাচ্ছে। তার কারণ নির্ণয় করা হয় তো কঠিন
।ও হোতে পারে—কেন না, মানুষের পছন্দ চিরকালই বদলাতে দেখা
য়। তাই অনেক চিন্তার পর ঠিক করি যে, ভূমিকা দেওয়ার বিশেষ
য়োজন নেই।

তবুও কেন দিচ্ছি?—তার কৈফিয়ৎ পাঠকদের দেব না। যাঁর যা মনে
—।। মনে করার পূর্ণ দাবী তাঁদের রইল।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর খান কয়েক বই যা বার হোয়েছিল, সেগুলো প্রকাশক
লেখকদের গরজেই। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন মানা তাঁরা শোনেন নি।

আমার বিশ্বাস যে, সেই ভবঘুরে মানুষটির পূর্ণ জীবনী লেখার উপকরণ
যা আমরা আজও সম্পূর্ণ সংগ্রহ করি নি, কি কোরতে পারি নি। সম্প্রতি
ইত্যে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে না-কি এমন একটি লেখা বার হোয়েছে—যা প্রক

মোটেই উচিত হয় নি। যাঁদের নিয়ে এই ব্যাপার তাঁদের কেউই আজ নেই। এই যে লোক-নিন্দার প্রবণতা—বঙ্কিম এই কথা চিন্তা কোরেই জী চরিত সম্বন্ধে প্রথম বছরের বংগদর্শনে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন, দীন মিত্রের মৃত্যুর পর।

শরৎচন্দ্রকে আমি সাহিত্যের আমার গুরু বোলে মনে করি। তাঁর জীবি ত অবস্থায় শরৎচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে তাঁর জীবনী লিখতে আরম্ভ করি। তাঁর সাংগ-পাংগরা ভয় পেলে তিনি মানাও করেন লিখতে। তাঁর মৃত্যুর পর যে সব লেখা বার হয়, সেগুলোর বিরুদ্ধে কিছু লেখার পর সুবিধা না হওয়ায় বন্ধ হোয়ে যায়।

আমার মনে হয়, আজও তাঁর জীবনী লেখার ঠিক সময় আসে নি। সেদিন আসবে তখনই, যখন তাঁর বইগুলির প্রকৃত আলোচনা শেষ হবে।

আমি যেটুকু লিখেছি—তা অসম্পূর্ণ। "শরৎ-সাহিত্যের মণি-দীপিকা" শেষ করে তারপর বেঁচে থাকলে তাঁর জীবনী লেখার হয় তো আমার অধিকার জন্মাতে পারে।

আমার পরম আত্মীয় এবং বন্ধু এই বইখানিকে পূর্ণাংগ করার চেষ্টা কোরেছেন: কিন্তু তাঁর নাম দিতে আমার সাহস হয় না।

পাঠক মার্জনা কোরবেন এই অক্ষম মানুষটিকে দয়া কোরে।

লেখক

শরৎ পরিচয়

বঙ্গাব্দ ১২৮৩, ৩১শে ভাদ্র, হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে দেবানন্দপুরের খ্যাতি সংশ্লিষ্ট বলে এই গ্রামখানি বাঙালীর কাছে একান্ত অপরিচিত নয়। বর্তমানে, ইস্টার্ণ রেলওয়ের ব্যাণ্ডেল স্টেশনে নেমে—লাইন পেরিয়ে ক্রোশখানেক, ক্রোশদেড়েক গেলে দেবানন্দপুর পাওয়া যায়।) শরৎচন্দ্র মধ্যে মধ্যে গ্রামখানি দেখবার জন্য যেতেন। যুবক-সম্প্রদায়কে গ্রামের উন্নতির জন্য উৎসাহিতও করতেন। গ্রামের লাইব্রেরীর জন্যে বহু বাংলা বই তিনি দান করেছিলেন।

পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের অল্প বয়সে, হালিসহর নিবাসী রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কেদারনাথের দ্বিতীয়া কন্যা ভুবনমোহিনীর সঙ্গে বিবাহ হয়। মতিলালের বিধবা মাতা বিবাহের পর তাঁর পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে তাঁকে শ্বশুর-গৃহে পাঠিয়ে দেন।

মতিলালের পিতা অত্যন্ত স্বাধীন-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। শুনতে পাওয়া যায় যে, তিনি প্রবল-প্রতাপ জমিদারের বিরুদ্ধাচরণ করে গৃহত্যাগী হতে বাধ্য হন; এবং অবশেষে একদিন স্নানের ঘাটে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ মৃত-অবস্থায় পাওয়া যায়। বিধবা অতিশয় কষ্টেসৃষ্টে দিনাতিপাত করতেন। মতিলালকে মানুষ করে তোলার অবস্থা মোটেই তাঁদের ছিল না। দেবানন্দপুর মতিলালের পৈতৃকালয়। তাঁদের আদি দেশ কাঁচরাপাড়ার কাছে মামুদপুর।

আন্দাজ, ইংরেজি ১৮৬৫-৬৬ সালে মতিলাল ভাগলপুরে আসেন এবং পড়াশুনার জন্যে স্কুলে ভর্তি হন। ইংরেজি ১৮৭০-৭২ সালে ভাগপুর থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে মতিলাল পাটনা কলেজে পড়তে যান। রামধনের কনিষ্ঠপুত্র অঘোরনাথ মতিলালের সতীর্থ ছিলেন। এঁরা দুজনেই একসঙ্গে পাটনায় মেসে থেকে কলেজে পড়তেন।

মতিলালের প্রথম সন্তান কন্যা; ইনি 'নারীর মূল্যের' অ
শরতের চেয়ে বছর চারেকের বড়। হাবড়া জেলার পানিত
সামতাবেড়-এর মুখোপাধ্যায় পরিবারে এঁর বিবাহ হয়। তাঁর
গ্রামের জমিদার এবং সম্পন্ন ছিলেন। শরতের প্রথম বসতবাড়ি এই
তৈরি হয়। রূপনারায়ণের ধারে আজও তা বিরাজ করছে।

শরতের শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোর এবং যৌবনের
ভাগলপুরেই কাটে। মধ্যে মধ্যে মতিলাল সপরিবারে দিনকতবে
যেতেন। অতএব, শরতের পিত্রালয়ের চেয়ে মাতুলালয়ের স
অধিকতর ছিল।

রামধন ইংরেজি ১৮১৭-১৮ সালে ভাগলপুরে আসেন।
আসার প্রধানতম কারণ ছিল তাঁদের ঘোর দারিদ্র্য। এম
প্রতিবেশী সাধক রামপ্রসাদ সেন একদিন প্রসাদ পেতে চাইলে
পাতার তরকারি রেঁধে খাইয়েছিলেন ভগবতী দেবী, রামধনের ম

ভগবতী খুব শক্ত মনের মেয়ে ছিলেন। তিনি কোন দুঃখেই
না। এমন কি, নিজেদের দৈন্যের কথা অপরকে জানতে পর্য
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করে নিজের উপবাস লুকিয়ে রাখতেন।
ছিলেন গো-বেচারি, অতিশয় নিরীহ প্রকৃতির। এক রাতে ঘ
চোর। ভগবতী দুর্গাচরণকে চুপি চুপি জাগালেন; তাতে ফ
বিছানায় শুয়ে ঠক্-ঠক্ করে কেঁপেই সারা হলেন। ভগবতী
দিয়ে কাপড় পরে, মাথায় একটা গামছা বেঁধে চোরেদের
দাঁড়িয়ে চুরির মাল ফিরিয়ে ঘরে তুলেছিলেন।

সম্ভবতঃ তাঁরই পরামর্শ এবং প্রেরণায় রামধন পায়ে
সন্ধানে পাটনা যাত্রা করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল কাঁচা।

তখন নদীপথে নৌকা দিয়ে বাংলার বহুপণ্য ঐ অঞ্চলে
খোলার অনেক আগের কথা-এ। রামধন মধ্যে মধ্যে নে
ভর করতেন। এমনি করে মাস তিনেক পরে তিনি পাটনায়

বিদ্যে-সাধ্যির মধ্যে তিনি ইংরেজি বুঝতেন, পড়তে পারতেন, আর, তাঁর হাতের লেখাটি ছিল মুক্তোর মত। এ-সবই মিশনারি সায়েবদের কৃপায়!

তখনকার দিনে বিহারের আলাদা সত্তা ছিল না; বাংলার সুদূর প্রসারিত অবয়বের মধ্যেই ছিল এই ভূভাগ। তখন, বাঙালীর খাতির ছিল, ইজ্জৎ ছিল এবং দেশে শিক্ষা-দীক্ষা প্রচার করার জন্য বাঙালীর সমাদর ছিল অপরিমেয়। বিহারী ভাইরা তখন মাছ-মাংসের মতই ইংরেজি শিক্ষাকে বর্জন করে বনে-জংগলে হিন্দু ধর্মের সশিখ-মাহাত্ম্য এবং মহিমার অনুসন্ধান করে ফিরতেন। অক্ষমেরা ভৃত্য এবং পাচকের কাজ করে বাঙালীর জীবনযাত্রা সুগম করার সুযোগ দিত। রামধন বোধ করি, দু-একটা ইংরেজি বুলি ঝাড়াতে দেশের লোকের সমূহ বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দাঁড়ান এবং অবশেষে খোদ "মেজিস্টর" সায়েবের কাছে নীত হন।

সেখানে তিনি একেবারে সেরেস্তাদারি পদে অভিষিক্ত হয়ে, শুনেছি, প্রভুর নাসিকায় তৈলদান করে নিদ্রার সুবিধা করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু পাটনায় রামধনের বেশি দিন থাকা হয়নি। পাটনার কর্তা তাঁর ভাগলপুরের বন্ধুবরকে সৌভাগ্যের সুখবর দেওয়াতে—বন্ধু-কৃত্যের দাবিতে ভাগলপুরে চলে আস্‌তে হল তাঁকে অবিলম্বে!

সেকালের বাঙালীরা ভাগলপুরের একটা আদরের নাম দিয়েছিলেন: "জরাসন্ধের কারাগার।" তার মানে, একবার যে আসে সে আর ফিরে যেতে পারে না। এটা কিন্তু বর্ণে বর্ণে সত্যি হতেই দেখা গেছে। তার কারণও ছিল যথেষ্ট।

ভাগলপুর এক সময়ে বাংলার লাটের স্বাস্থ্যনিবাস ছিল। এখানকার সিংহদের "ঝৌউয়া কুঠি"ই ছিল লাট সাহেবের প্রাসাদ! এইখানে বর্ধমানের মহারাজেরও প্রকাণ্ড হর্ম্য আজও বিরাজ করছে। সেটি এখন পি-ডব্‌লিউ-ডির আফিস। গঙ্গার তীরে অবস্থিত, জল বায়ু উৎকৃষ্ট, আধা পাহাড়ে এই শহরটির আরও কয়েকটি বড়-বড় গুণ আর আকর্ষণ ছিল।

ভাগলপুরের নাম আজও বিখ্যাত এবং সেই সময়ে পাকা রুইমাছের সের বিকত মাত্র এক পয়সায়! সরিষার তেল টাকায় ছ-সের, আটসের; দুধ

টাকায় পঁচিশ সের, আধমন ; এবং সব্‌কে ছাড়িয়ে ওজনটা ১০১ থেকে ১০৫। অতএব, ভাগলপুর সেদিনে বাঙালীর প্রায় কল্পনার স্বর্গ ছিল। বলাবাহুল্য বাঙালী একটু ভোজন-বিলাসী জাত। তরি-তরকারী দুধ-মাছে ভাগবসাবারও কেউ ছিল না। স্থানীয় লোকের সাধারণ খাদ্য ছাতু—ভোজে ভাতে "দহি-চুড়ার" বাহার। অতএব ভোজন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ কিছু ছিল না।

জঙ্গল কাটিয়ে বসতবাড়ি করতে হত বলে জমির দামও ছিল অসম্ভব সস্তা। কুড়ি টাকায় বিঘে বড় মাপের জমি পাওয়া যেত।

রামধন সরকারের তরফের উচ্চ কর্মচারি ছিলেন, ইচ্ছে করলে, সে সময় জমিদারি করা তাঁর পক্ষে কিছুই শক্ত ছিল না; কিন্তু 'উপরিতে' তাঁর মতি ছিল না, আর স্বদেশ-প্রেমের একটু আতিশয্য ছিল বোধ হয়। দেশে ফিরে যাবার প্রবল ইচ্ছে তাঁর শেষদিন পর্যন্ত ছিল। পেন্‌সন নিয়ে হালিসহরে ফিরে তিনি ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মারা যান।

ইংরেজি ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত গাঙ্গুলিরা হালিসহরে ফেরার চেষ্টা করেছিলেন; পরে দেখা গেল যে, ফিরলে বংশে বাতি দেবার আর কেউ থাক্‌বে না। হালিশহর ক্রমে ম্যালেরিয়া আর ওলাউঠার নর্মভূমি হয়ে দাঁড়াল।

রামধনেরা ছিলেন দুই ভাই। ছোট রামচন্দ্র। তাঁর একটিমাত্র ছেলে ছিল অক্ষয়নাথ। ম্যালেরিয়ার উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে তিনি ক'লকাতায় চলে এসে চাকৃরি করেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিপিন। বিপিনবিহারী দেশ-প্রেমিকতার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিপিন গাঙ্গুলির জীবনের বহু বৎসর রাজ-আতিথ্যে জেলে কেটেছে। মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি মারা গেছেন। তাঁর নাম এখনও বাংলায় সুপরিচিত।

রামধনের পাঁচ ছেলে। কেদারনাথ, দীননাথ, মহেন্দ্রনাথ, অমরনাথ এবং অঘোরনাথ।

কেদারনাথের দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। মধ্যমা ভুবনমোহিনী, শরতের মা। জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস গত হয়েছেন এবং কনিষ্ঠ বিপ্রদাস সরকারি কাজ থেকে অবসর নিয়ে পাটনায় ছিলেন। বর্তমানে তিনিও গত হয়েছেন।

ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের সেরেস্তাদারী এই বংশের শেষ, বিপ্রদাসই বছর কয়েক করে সেক্রেটারিয়েটে কাজ পেয়ে পাটনা-রাঁচি যান।

ইংরেজি ১৮৯২ সাল পর্যন্ত পরিবারটি একান্নেই ছিল। ঐ বৎসরে কেদারনাথের মৃত্যু হয় গুরুগৃহে ভাটপাড়ায়। এই পরিবারের বিশেষত্ব ছিল— পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে টান্-বুনুনি। তাঁরা ছিলেন আদর্শবাদী এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি একান্ত অনুরক্ত আর আস্থাবান। সেই পরিচয়ের কতকটা আভাস শরৎচন্দ্রের "বিপ্রদাসের" মধ্যে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের বহু চরিত্রের বাস্তব উপকরণ এই পরিবার থেকে সংগৃহীত বলেই মনে হয়। এই সংগ্রহের কাজ পরিবার ছাড়িয়ে চাকর-বাকর পর্যন্তও ছড়িয়ে গেছে। শরতের "দেবদাসে" ধর্মদাস এই পরিবারে মুশাই চাকর। মুশাই-এর মত এমন বিশ্বাসী প্রভুভক্ত চাকর পাওয়া চিরকালই কঠিন। সে শৈশবে গয়া থেকে এসে এই পরিবারে ভর্তি হয় এবং প্রায় ষাট বৎসর পর্যন্ত চাকরি করে। মুশাইকে অমর করবার জন্যে শরৎ তাঁর "দেবদাসে" ধর্মদাসকে এঁকেছেন।

রামধন স্বল্পভাষী, শান্ত এবং অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সকল বিষয়ে তাঁর খুঁটিনাটি, চুলচেরা হিসাব এবং বিচার ছিল। কিন্তু শাসনের লেঠা, ঘট কি কোন উত্তাপ ছিল না। সে-ভার ছিল তাঁর গৃহিণী গোবিন্দমণির উপর।

গোবিন্দমণির জীবনীশক্তির প্রাচুর্য নিজের সংসার ছাপিয়ে বাইরেও প্রবাহিত হত। তিনি পাড়ার প্রায় সকল বাড়িতে ঠিক নিজের বাড়ির মতই কর্তৃত্ব করতেন। তখন বাঙালীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। তিনি প্রতিদিন সময়মত একবার সব বাড়িতে ঘুরেফিরে দেখেশুনে আস্‌তেন—কে কেমন আছে, কার কি অভাব। বিপদে পড়লে লোকে এসে তাঁর শরণাপন্ন হত। কেদারনাথ জননীদেবীর আজ্ঞাকারী ছিলেন। সেদিনের সেরেস্তাদার মানে, প্রভূত শক্তি-সম্পন্ন প্রায় দ্বিতীয় ডিস্ট্রিক্ট অফিসার। কেদারনাথ কোনদিন বড় একটা কারুর বাড়ি যেতেন না। সকালে বিকেলে তাঁর সঙ্গে লোক দেখা করতে আস্‌ত। মনে পড়ে, কার্যব্যপদেশে স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও ভাগলপুরে এসে কেদারনাথের সঙ্গে দেখা করে যেতেন।

শরৎ পরিচয়

এই বিরাট পরিবারের মধ্যে রামধন থাকতেন একটু গা-ঢাকা নিভৃত অন্তরালে এবং গোবিন্দমণি তাঁর দয়া, মায়া, তেজ এবং হিতৈষণা নিয়ে সর্বত্র, সব সময়ে জ্বল-জ্বল করতেন।

বাগানের আম-চুরি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কর্তা এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রতি গাছে এক একটি টিকিট মেরে দিয়ে তাতে প্রত্যহ আনুমানিক আমের সংখ্যা লিখে দিয়ে আস্‌তেন। মালি এই হিসাবের কড়িকে স্পর্শ করবার সাহস পেত না। কর্তার এই গল্পটি তাঁর নির্বাক ধীর বুদ্ধির পরিচয়স্বরূপ বাঙালীদের মধ্যে সে সময় খুবই প্রচলিত ছিল।

তিনি কোথাও অবিচার সইতে পারতেন না। অবিচার হলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থাটি ছিল আড়ম্বরহীন এবং নীরব। সংসারের শান্তি ভঙ্গ করে কিছু করা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। ইস্কুলে যাবার সময় ছেলেরা কে কি খেতে পেলে সেটি কখন এসে কোন্ ফাঁকে দেখে গেছেন। বহু-ব্যঞ্জন-পরিবৃত ভাতের থালা থেকে তিনি কেবল ডাল, ভাত আর মাছ ভাজা খেয়ে উঠে পড়লে গোবিন্দমণি হৈ হৈ করতেন। কর্তা কিন্তু নির্বাক ব্যবহারে গৃহিণীর ত্রুটি নির্দেশ করতেন। পরের দিন গোবিন্দমণি শেষ রাত থেকে রান্নার ব্যবস্থা করে সংসারকে নিরপেক্ষতার পথে আন্‌তে বাধ্য হতেন।

এই ধারাটি কেদারনাথের সময়েও চলেছিল। তিনি কোনদিন গোবিন্দমণির আদেশ অমান্য করেন নি; কিন্তু কর্তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতেও একদিনের জন্যে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটত না। এ হিসাবে, গাঙ্গুলি পরিবারের একান্নবর্তিতার দৃষ্টান্ত অন্য পরিবারেরও সে সময় অনুকরণীয় ছিল। এর ফলটি ভারি সুন্দর দাঁড়িয়েছিল—সংসারে সকলের অধিকার ছিল সমান। জ্যৈঠ্যতুত-খুড়তুত বলে কারুর মনেই পার্থক্যের কদর্য রূপ ফুটে ওঠার অবসর ছিল না। সবাই যেন একই মা-বাপের ছেলে-মেয়ে।

শরৎ এই পরিবেষ্টনের মধ্যে, এই আদর্শে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। এই তথ্যটুকু জানা থাক্‌লে হয়ত তাঁর—হিন্দু ধর্ম এবং একান্নবর্তীর আদর্শের দিকে সহৃদয় প্রবণতার সন্ধান মেলা সহজ হতে পারে।

শরৎ পরিচয়

রামধনকে তাঁর চাক্ষুষ করার সুযোগ হয়নি। কিন্তু তাঁর অভাবেও কেদারনাথের আমলে তাঁর আদর্শের ধারাটি অব্যাহত ভাবেই চলেছিল।

গোবিন্দমণিকে শরৎ দেখেছিলেন। মৃত্যুর বছর দেড়েক আগে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দীননাথ মারা যান। সেই শোক আর তিনি সইতে পারলেন না।

গঙ্গার তীরে শুভ রামনবমী তিথিতে একটি প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপের তলায় গোবিন্দমণিকে অন্তর্জলী করে—পরিবারের সবাই তাঁর স্মিতমুখে গঙ্গোদক দিচ্ছে—সে দৃশ্য দেখ্‌তে দেশের লোক কাতার দিয়ে চতুর্দিকে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন, 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম—ও রামঃ'—মন্ত্রে আমাদের শিশু বুকের মধ্যে যে আন্দোলন উঠেছিল, তার কাঁপুনির রেশ বুকের মধ্যে আজও থেমে যায়নি তা স্পষ্টই অনুভব করতে পারা যায়।

গোবিন্দমণির পর অমরনাথের পালা এল পরলোক-যাত্রার।

অমরনাথের চিত্তের পরিচয়ের সুধাটির আস্বাদন আমাদের ভাগ্যে অতিশয় স্বল্প পরিসরের হয়েছিল। পাঁচ ভাই-এর মধ্যে অমরনাথের গুরু-গম্ভীর ভাবটা একেবারেই ছিল না। তাঁর জন্তু-জানোয়ার-পোষা, এবং বিশেষ করে পায়রা-পোষার কথা মনে পড়ে। একটা তাড়া পেয়ে পায়রারা এক সঙ্গে উড়লে বাড়ির উঠান ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যেত। তাদের জনা-জুতির নাম আলাদা আলাদা ছিল এবং প্রতি সকালে অমরনাথ তাদের নাম ধরে ডেকে মটর ছোলা কড়াই খেতে দিতেন এবং যারা সাবালক হয়ে উঠত তাদের পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দেওয়া হত। এই যে পশুপক্ষী নিয়ে খেলা করা—উপরিওয়ালা কর্তারা যে এটাকে পছন্দ করতেন না, তাও আমরা মনে মনে বুঝতে পারতাম। তাঁদের চলাফেরা, দৃষ্টিবিক্ষেপে মনে হত যে, উটিকে ওঁরা লঘু চিত্তের পরিচয় বলেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছেন।

বাড়ির ছেলেমেয়েরা কিন্তু নিরন্তর গাম্ভীর্যের পরিবেষ্টনের দম-আটকা হাওয়া থেকে বেরিয়ে অমরনাথের কাছে এসে বুকভরা নিঃশ্বাস ফেলে সঞ্জীবিত হয়ে উঠত। আমাদের মনে পড়ে তাঁর হাঁটু জড়িয়ে বুক দিয়ে অন্তরের মধ্যে গাঢ় সঞ্চিত কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করে দিয়ে বুকখানা হাল্‌কা করে নিতাম।

বিকেলে অমরনাথের আফিস থেকে ফিরে আসার প্রতীক্ষায় আমাদের ম ব্যাকুল হয়ে ছট্‌ফট্‌ করত। সত্যই একটা অসহ অধীর উদ্‌গ্রীবতার নিরন্ত আবেগ বুকের মধ্যে ঠেলা দিয়ে অস্থির করে দিত।

তিনি ফিরে এসে কিছু না কিছু ছেলেমেয়েদের বিতরণ করবেনই করবেন পিপারমেণ্টের মুখ-ঠাণ্ডা-করে-দেওয়া লজেঞ্জ আমাদের চিত্ততলকে তাঁ ভালবাসার স্পর্শ-সুখে উদ্বেল করে দিত।

উপরিওয়ালাদের মধ্যে অমরনাথের আর একটি দোষের জন্য কিছুতেই ক্ষমা ছিল না। তিনি একটু সৌখিন ছিলেন। তাঁর আর্শি ছিল, চিরুনি ছিল, আর ছিল অস্পৃশ্য শূয়োর কুঁচির বুরুষ! অমরনাথ আফিস যাবার সময় টেরি কেটে বেরুলে আমাদের ভারি সুন্দর ঠেকত। চমৎকার আঁরদিগ্‌লো মুখের উপর দ্বিধা-বিভক্ত চুল কুঁক্‌ড়ে এসে কপালের উপর পড়ে আমাদের একটা মধুর সোহাগের আহ্বান জানাতো। কিন্তু সেই ঠাট দেখে কর্তাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হ'ত। তাঁরা রাগে গিস্‌ গিস্‌ করতেন।

মনে পড়ে এই নিয়ে অনেকদিন ধরে বিরুদ্ধ সমালোচনার ফল অতিশয় মারাত্মক কঠিন শাস্তির আকারে অবতীর্ণ হল তাঁর কপালে। অবশেষে একদিন প্রকাণ্ড শিখাটিকে কালো ভেল্‌ভেটের টুপি দিয়ে ঢেকে অমরনাথকে মুণ্ডিত মস্তকে বিরস বদনে কাছারি যেতে হয়েছিল। আজকাল হলে, ঐ বয়সের মানুষ নিশ্চয় বাড়ি ছেড়ে এই অপমানকে এড়িয়ে আত্মরক্ষা করত। কিন্তু অমরনাথ অম্লান বদনে মনুষ্যত্বের এই অযথা এবং নিষ্ঠুর অমর্যাদাকে সহ্য করে ভ্রাতৃ-প্রেমকেই বড় বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আজও সে কথা মনে করলে বুকের মধ্যে কর্‌ কর্‌ করতে থাকে।

দুই

অমরনাথের চরিত্রে আরও একটি দিক ছিল। আনন্দকে তিনি ত্যাগের ভিতর দিয়ে ভোগ করতে জানতেন। এই বিশ্ব-সংসার তখনই বীভৎস আকার ধরে, যখন আমাদের লোভ এবং স্বার্থপরতা রাক্ষসের মূর্তি নিয়ে চারিদিকে হাত বাড়িয়ে সব-কিছু আত্ম-সম্ভোগের জন্যে টানতে থাকে। নিজের প্রিয়বস্তুকে অনায়াসে অন্যের ভোগের জন্য দিয়ে দিয়ে আমাদের চিত্ত যখন পুলকে বিলসিত হয়, তখন সংসারটাও সুন্দর হয়ে চারিদিকে ফুটে উঠে—তখন আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয়ে অন্তর-বার অপূর্ব শ্রীতে মণ্ডিত করে তোলে। বিশ্ব তখন বিরাজ করে তার সহজ রস-মাধুর্যে, স্বর্গীয় শান্তিময় কল্যাণে!

অমরনাথের এই নিঃস্বার্থ ত্যাগশীলতার ফাঁকে তখনকার সাহিত্যের নির্মল রশ্মির একটি রেখা গাঙ্গুলি বাড়িতে অতিশয় গোপন পথে প্রবেশ লাভ করছিল। সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে" বাংলা-সাহিত্য ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন দেখতে সবেমাত্র সুরু করেছে! বাংলা ভাষার তখন সম্মানও ছিল না, আদরও ছিল না। বিশেষ করে, বাংলার সেই সুদূর প্রদেশ বিহারে।

তখন কাজের মানুষেরা বাংলা ভাষার চর্চাকে শুধু শক্তির অপব্যয় বলে মনে করতেন না, মনে করতেন যে, তাতে যারা আসক্ত হয়, তারা নেশা-ভাঙের উত্তেজনায় যেন পাপবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে—নিরয়ের পথ-গামী হবার জন্যে মূঢ়তারই প্রশ্রয় দেয়!

হালিসহর থেকে কাঁঠালপাড়া বেশি দূর নয়। গাঙ্গুলি-বাড়িতেই কাঁঠাল-পাড়ার মেয়েও বৌ হয়ে এসেছিলেন। যেমন গেঁয়ো যোগীর ভিখ্ মেলে না, তেমনি এ বাড়িতে বঙ্কিমের কোন খাতির কি প্রতিষ্ঠা হওয়া ছিল দুর্ঘট। বিশেষ করে, বঙ্কিমচন্দ্র আবার নব্যপন্থী ছিলেন; এবং গাঙ্গুলিরা হিন্দুধর্মের পতাকাবাহী বলে গর্ব অনুভব করতেন। যাকে দেখতে পারিনে, তার চলনও দেখি বাঁকা। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরূপকে কেমন একটা তেড়া-বেঁকা, বিকৃত আকারে দেখাই ছিল এঁদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক।

একে সাহিত্যই তো একটা অগ্রাহ্য বস্তু, তার উপরে আবার বাংলা সাহিত্য! যার আলোচনায় নিশ্চিত কোন আশু ফল পাওয়া যেতে পারে না। কেন, গোদের উপর বিষফোড়া; কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিম! একে মনসা তায় আবার ধুনোর গন্ধ! অতএব এতগুলো দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে অতি সংগোপনে বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শন" এই নীতির সুকঠিন দুর্গে কেন যে এসে পড়েছিল, তা নির্ণয় করা কঠিন হলেও বলতেই হয়, বিধাতার চক্রান্ত ছাড়া আর কি হতে পারে?

অমরনাথের এক ভ্রাতৃবধূ ছিলেন যিনি সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করেছিলেন এবং স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাত থেকেও নাকি পারিতোষিক পেয়েছিলেন।

"বঙ্গদর্শন"গুলি ভুবনমোহিনী মারফৎ মতিলালের কাছে পৌঁছত এবং সেখান থেকে কুসুমকামিনী ভাসুরের স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ মহানন্দে মাথা পেতে নিতেন সেগুলিকে। ভুবনমোহিনীকে অমরনাথ খুব ভালোবাস্‌তেন তাঁর মধুর সরল স্বভাবের জন্য।

কুসুমকামিনীর ঘরে সন্ধ্যার সাহিত্য-বৈঠকে বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শন" পঠিত হাওয়ার দৃশ্য আজও মনে পড়ে। বলা বাহুল্য যে, শরৎচন্দ্র অন্যতম শ্রোতা ছিলেন।

এমনি করে অন্তঃপুরের নিভৃত গৃহকোণে সাহিত্যের অমৃত ধারায় সঞ্জীবিত শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-প্রীতি দিনে দিনে শশীকলার ন্যায় হয়তো বর্দ্ধিত হয়ে উঠ্‌ছিল। সেদিন কেউই মনে করতেই পারেনি যে, শুভক্ষণে উপ্ত এই ক্ষুদ্র বীজটি থেকে বাংলা সাহিত্যের একটি মহীরুহ জন্মলাভ করতে পারে!

এই অমরনাথ যখন রোগে কাতর হয়ে শয্যা নিলেন তখন ছোটদের মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। বেতসের পাতা খর-স্রোতা নদীর জলে যেমন করে অহরহ থাকে কাঁপতে—তেমনিই কচি-কচি প্রাণগুলির কাঁপুনি আর কিছুতেই যেন থাম্‌তে চায় না!

চারিদিকের অবস্থা এবং ব্যবস্থার আসন্ন ফলাফলের ছবিটি ক্রমেই স্ফুটতর

হয়ে উঠ্তে লাগল। বাড়ির জমাট স্তব্ধতা যেন কচি-বুকগুলোর উপর নির্দয় জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে তাদের দম বন্ধ করে দেয় আর কি। মনে হয়, যেন মৃত্যুদূতের পায়ের শব্দ কোন্ অজানা লোকের অন্তরাল থেকে শোনা গেল বুঝি! তারি শঙ্কিত প্রতীক্ষায় বাড়ির ইট-কাঠটি পর্যন্ত উৎকর্ণ হয়ে আছে! তারই অশুভ-সূচনা দিনে যেন দাঁড়কাকের কর্কশ গলায়, আর রাতে তীক্ষ্ণ-তীব্র কালপেঁচার চীৎকারে ধ্বনিত।

বাইরের বাড়িতে সংহার-মূর্তিধারী বিকট-দর্শন এক সন্ন্যাসী, মাথায় জটাজাল, সর্বাঙ্গে ছাইমাখা, অগ্নি-বর্ষি দুই আরক্ত চোখ—সাম্‌নে জলছে একটা ধুনি, পাশে পোতা বিরাট একটা চিম্‌টে এবং অদূরে সিঁদুর মাখা এক ত্রিশূল—তার উপর ঝুলছে নর-কপাল! এ নাকি পারা ভস্ম করে ওষুধ তৈরী করার অদ্ভুত প্রকরণ! ছেলেরা ভয়ে আর সেদিক মাড়ায় না। বৈঠকখানা বাড়িতে লোকজনের অজস্র আগমন; সকলের মুখই চিন্তায় কালো। ছেলেদের স্থান সেখানেও নেই। অন্দর মহলে মেয়েরা তাল-গোল পাকিয়ে বসে চুপি-চুপি ঠারে-ঠারে যে কথা কয় তা কানে না শুন্‌তে পেলেও তার অর্থ বুঝে নিতে কিছুমাত্র দেরি হত না। কারুর চোখের দিকে চাইতে ভরসা হয় না—যেন বর্ষণ-উন্মুখ ধারা ঝরতে সুরু হল বলে।

মৃত্যুর আগমনের এতবড় সমারোহ প্রতীক্ষা এই প্রথম আমাদের অভিজ্ঞতায়! আমরা কোথায় যাব, কি করব জানিনে। কেউ নেই সান্ত্বনা দেবার, কেউ নেই একটা মিষ্টি ভরসার কথা বলে বুকে টেনে নেবার। দিনের বেলা অবসন্ন মনে আমরা প্রেতের মত বাড়িময় ঘুরে বেড়াই, আর ভয়ংকর রাতে যেন মৃত্যুর প্রকাণ্ড মুখ ব্যাদানের সাম্‌নে পড়ে আড়ষ্ট হয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে কখন ঘুমিয়ে পড়ি!

এক মেঘমুক্ত রাতের শেষে চাঁদের আলোতে চারিদিক যেন আচ্ছন্ন, অবসন্ন! —বাড়ির ঈশান কোণের বিরাট অশ্বথ গাছে গোদা বাঁদরের বিকট থ্যাক্‌রোর

খ্যাক্ শব্দের সঙ্গে কালপেঁচার তূর্যধ্বনির মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে শুন্‌লাম বাড়ির লোকের চাপা কান্নায় বায়ুমণ্ডল উদ্বেলিত। উঠে বসে দেখি, মা নেই, বিছানা শূন্য। তখনি নিঃসন্দেহে মনে হ'ল যেন, মহাকাল তাঁর ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে অমরনাথের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আর নেই রক্ষা, আর নেই নিষ্কৃতি! আমাদের প্রিয়তম চলেন।

অবশেষে শেষ দেখার ডাক পড়ল ভুবনমোহিনীর। তিনি ফিরে এলেন, আঁচল চলেছে ধূলোয় লুটিয়ে লুটিয়ে, চুল গেছে খুলে মুক্ত হয়ে পিঠের উপর— আর চোখে এসেছে অশ্রুর জোয়ার।

ভুবনমোহিনী আছড়ে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

শরতের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করলাম, "কি হ'ল?"

"ন'দাদামশাই স্বর্গে গেলেন।"

"কতদূরে?"

"অ-নে-ক দূর।"

"কবে আস্‌বেন?"

"আর তিনি আস্‌বেন না।"

কান্নার রোল উঠল আকাশ ছেয়ে। বুকের উপর দিয়ে যেন দুঃখের রথের চাকা হাড় পাঁজরাগুলোকে চুরমার করে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। সে ব্যথা মনে হয় আর এ জীবনে সারবে না!

কথায় বলে: বজ্র আঁটন ফস্কা গেরো। সেকালের গাঙ্গুলি পরিবার সম্বন্ধে এই প্রবাদটি বিশেষ করে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বর্ণে বর্ণে খাটে। তাঁর বুদ্ধি কর্তাদের সতর্কতার দুর্গ, পরিখা, সুকঠোর শাসনের বিধি-নিয়মের পাহাড় অতিক্রম করেই চলত।

গাঙ্গুলিদের বাড়িখানি কোন প্ল্যানে তৈরি হয়নি; প্রয়োজন মত শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে গড়ে উঠেছিল। উত্তরে, গঙ্গা থেকে শ'-দুই হাত দূরে, পূব মুখো, প্রকাণ্ড শিমূল কাঠের দরজা; সেটি অতিক্রম করলে যে

প্রাঙ্গণে আসা যেত তার উত্তর-পূব—অর্থাৎ ঈশান কোণে ছিল একটা অতি বৃহৎ এবং প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ। এ গাছে ইঁদুর-বাঁদর, সাপ-পাখী, সর্বদাই আহার বিহার করত। সামনে, দু-ধারে বারান্দায় পশ্চিমা পেয়াদাদের বাসস্থান। কেদারনাথ কালেক্টারের সেরেস্তাদার, অতএব তাঁর আশ্রয়েই এরা থাকা পছন্দ করত। তাদের যেমন সব বিচিত্র নাম তেমনি অদ্ভুত আকৃতি প্রকৃতি। গৌরী সিং, রচ্ছা সিং, কুতুহল সিং এমনি কত কি বিচিত্রবীর্য সিংহের আশ্রয়-বিবরে—তুলসীদাসের রামায়ণের প্রচ্ছায়, ডন্-কুস্তি মুগুর ভাঁজার অন্তরালে, ভাঙ্-ঘোঁটা এবং তার কৃপায় সুস্থ, সবল শরীরগুলির নর্তন-কুর্দন, দুপ্ দাপ এবং খড়মের খটাখট্ শব্দে এদিকটা সর্বদাই মুখর থাক্‌ত। দক্ষিণ-পূবে একটা মস্ত নিমগাছ—তার নীচে সেপাইদের রান্নাঘর। সেইখানে পর্বত প্রমাণ ডাঁই করা আছে গরুর খাবার খড়। সেপাইদের বারান্দার সাম্‌নে, দক্ষিণ এবং পশ্চিম মুখ করে বিস্তৃত চালাঘরে অসংখ্য গরু-বাছুর অনবরত ল্যাজ নাড়ে, সিং দোলায় আর, কান খাড়া করে!

সন্ধ্যা হলে, গৌরী সিং তার সাধের দড়ির খাটিয়া পেতে একটি ছোট প্রদীপের ক্ষীণ আলোর সাহায্যে সুর করে রাত বারোটা পর্যন্ত তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ে বায়ুমণ্ডলকে পবিত্র তথা সরগরমের প্রতাপে পাহারা চালাত। সে বাড়িতে, সেই সময়ের মধ্যে ঢুকতে হলে গৌরী সিংকে অতিক্রম করে কারুর ভিতরে যাবার উপায় ছিল না।

রাস্তার পূবদিকে বেড়া-বাঁধা একটি গেট-দেওয়া বাগান। গেটের উপরে ঝুম্‌কো-লতার নিবিড় পাতার গোছা থেকে ফুলগুলো যেন ভাবাতিশয্যের রভস চাউনিতে চেয়ে আছে পথিকের মুখের দিকে। দুপাশে স্থল-পদ্মের লম্বা ডাঁটায় বিস্তৃত পাতার মধ্যে ফুলগুলো সকালের প্রতীক্ষায় ফুটি ফুটি করেও ফুটতে পারে না কেবল যেন নিয়মভঙ্গের ভয়েই। পাশে সন্ধ্যামণির ঝাড়ে ফুটে উঠেছে লাল, গোলাপি, হল্‌দে, বেগুনি রংয়ের হাজার হাজার ফুল। তার পাশে নবমল্লিকার ঝাড়। তারপর টগর, শেষে দাঁড়িয়ে চাঁপা নিজের গাঢ় ঘন সবুজের মধ্যে হলদে ফুলের তারা ফুটিয়ে। তারপর চললো দশবাই চণ্ডীর সার,—তারা ঠেকেছে গিয়ে কুঁদের ঝাড়ে!—মধ্যে মধ্যে ঝাঁটি! মধ্যিখানে,—

রজনীগন্ধার লাইন আছে ঘিরে চামেলির ঝাঁকড়া ঝাড়টি। আর তার এদিকে ওদিকে গোলাপের মত দুর্লভ জাতীয় ফুলের গাছও দু-চারটে!

বর্ণনা হয়তো একটু বিস্তৃত হ'ল, কিন্তু জানি, এ বিস্তার কেদারনাথের বাস্তু-ভক্তির বিস্তৃতির তুলনায় কিছুই নয়।

গোবিন্দমণি অরুণোদয়ের পূর্বে গঙ্গাস্নান সেরে এই বাগানে ঢুকে সাজি ভরে ফুল নিয়ে সংসারের মঙ্গলকামনায় দেবতাদের পূজায় প্রসন্ন করার মানসে ছুটতেন তাঁর দোতলার উপর ছোট ঠাকুর ঘরটিতে।

দেয়ালদের বারান্দার মধ্যে আর একটা বড় দরজা অতিক্রম করে ভিতরে গেলে, কর্তাদের বৈঠকখানাবাড়িতে পৌছান যেত। দক্ষিণমুখো প্রকাণ্ড আট-চালা বাংলা। সামনে গোল থাম দেওয়া। দেখ্‌লেই বুঝতে পারা যায় যে, চণ্ডী-মণ্ডপ। গাঙ্গুলিদের পূজো কোনদিন রাজসিকভাবে হয়নি। এঁদের ঝুঁকি ছিল সাত্বিকতার দিকে। গুরু আস্‌তেন ভাটপাড়া থেকে। কিন্তু বাইনাচ, কি যাত্রা, কি থিয়েটার হত না। সেদিক দিয়ে কর্তারা ছিলেন ভারি কড়া।

চণ্ডীমণ্ডপের সংলগ্ন ভোগের ঘরের পাশ দিয়ে বাঁ-হাতি গিয়ে গলির দোর পার হয়ে অন্দরমহলে যাওয়া যেত। অন্দরমহলের রান্নাবাড়িটা ছিল মাটির; আরও একটা ছিল মাটির বাড়ি, যা গোড়ার আমলে রামধন এসে তৈরি করিয়েছিলেন; সেটা একটা দোতলা মাঠ-কোঠার প্রকাণ্ড ব্লক, বাড়ির দক্ষিণ-উত্তর জুড়ে পশ্চিমটা আড়াল করেছিল, বিন্ধ্য-পর্বতের মতই। বাকি সব ঘর ছিল পাকা। রান্নাবাড়ির পিছন দিয়ে খিড়কির দোর। মেয়েরা সেই দোর দিয়ে শ্যামবাবুর বাগান পেরিয়ে যেতেন গঙ্গাস্নানে। পাড়ার মেয়েদের স্নানের ঘাটের নাম ছিল খিড়কির ঘাট। পুরুষদের সেখানে যাওয়া মানা।

এই শ্যামবাবুর বাগানটি ছিল একটা অরক্ষিত পোড়ো বাগান—ছেলেদের এবং তাদের সর্দারের অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের লীলাভূমি।

এই বাগানে ছোটকর্তার সফরের তৈজস-পত্রাদি বইবার জন্তে একটি ঘোটকী আর তার বাচ্চা নিত্য বিচরণ করত। তাদের রক্ষক ছিল বড়কর্তার পালকিবাহকদের সর্দার ফাগু কাহারের একচক্ষু-নন্দন ভাতুয়া—সে শরতের সমবয়সী হবে; এবং খেলোয়াড় হিসাবে সেও কোনক্রমেই অবহেলার পাত্র ছিল না। এই লাদ্‌না-ঘোড়াটির পিঠে দাঁড়িয়ে তার গতির সঙ্গে শরীরের ভারটির সমতা অর্থাৎ ব্যালান্স রাখার কসরৎ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিস্ময়ে, ভয়ে, আশায়, আনন্দে আমাদের দিনগুলি কত শীগ্‌গির কেটে যেত তা মনে করলে আজও ভারি ভালো লাগে।

এই খেলাটি বলা বাহুল্য সার্কাসের অনুকরণেই প্রবর্তিত হয়েছিল। পরে রিং এবং বল-লোফা, আর ঘোড়ার পিঠ থেকে ডিগ্‌বাজি খেয়ে নীচে এসে দু-পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ান পর্যন্ত চমৎকার অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের চেয়ে বছর চার-পাঁচ-বড়র দলের মধ্যে তখন একটা সার্কাস কোম্পানি খোলার যে দারুণ শখের ভূত ঘাড়ে চেপে বসেছিল, তারই এই সব খণ্ডশ প্রকাশ।

রাজুদের জহুরি বাঁদরীটা যদিও কামড়ায় একটু-আধটু, কিন্তু তাকে সঙ্গে না নিলে যে সব মজাই মাটি হয়ে যায়! বাড়ির টমি কুকুরটার প্রকাণ্ড গিধ্বোড় চেহারা দেখ্‌লেই তো লোকে ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেত। সেটাকে আগুনের রিং টপ্‌কাতে শেখান হল। এখন বাকি শুধু প্যারালাল বার, হোরাইজণ্টাল-বার আর ট্রাপিজের কসরৎগুলো শিখে নেওয়া!

সেইদিক দিয়ে প্রবল চেষ্টা উত্তুঙ্গ হয়ে উঠল। গোরাচাঁদ রায়দের বাগানের আখড়ায় রিহার্শেল চলতে লাগল।

এই চেষ্টার ফলে সে বছর সরস্বতী পূজোর দিন ঘোষেদের পোড়ো বাড়িতে একটা খেলা দেখাবার ব্যবস্থা হল। শরৎ আর তার মনিমামা—ভেলভেটের হাফ্‌ প্যাণ্ট আর পালক-বসান গেঞ্জী পরে অস্থির হয়ে শ্যামবাবুর বাগান থেকে ঘোষেদের বাড়ি পর্যন্ত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

কেদারনাথ বাড়ি নেই। অঘোরনাথ গেছেন সফরে। বাড়িতে আছেন

মতিলাল। তাঁর মতামত নেওয়ার আবশ্যকও নেই, আর নিলে অমত করার মানুষই তিনি নন। এক ভয়, যদি অঘোরনাথ সফর থেকে আসেন ফিরে। ছেলে মেয়েরা মানাচ্ছে দেব-দেবীর কাছে : ঘন ঘন আবৃত্তি করছে, "ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্যুং হ্যুং রক্ষ, রক্ষ স্বাহা। আজ না এসে কাল সকালে, হে ভগবান্—হে দুর্গা, হে কালী, হে মা জাগদ্ধাত্রী!"

পাকা রাস্তার উপর ঘোড়ার খুরের শব্দ! হায় সর্বনাশ! কোট-প্যাণ্ট পরা, মাথায় টুপি অঘোরনাথ এসে উপস্থিত। ছেলেমেয়ের দল গেল মুষড়ে. গিন্নীদের আর ক্ষোভের সীমা পরিসীমা রইল না।

ভেল্‌ভেটের হাফ্‌-প্যাণ্ট মাথায় উঠল মামা-ভাগ্‌নের। মুখ শুকিয়ে চুন!

অঘোরনাথের খাওয়া-দাওয়া হলে বিন্ধ্যবাসিনীপ্রমুখ মেয়েরা এে দাঁড়ালেন। বিন্ধ্যবাসিনী শরতের দিদিমা—তিনি বল্লেন, "ছোট্‌ঠাকুরপো,— ওরা আজকের দিনে একটু খেলাধূলো করতে চাইছে—তা তুমি হুকুম না দিলে।

বিন্ধ্যবাসিনী যদি একটু চড়াও হয়ে, রোয়াব দেখিয়ে কথা কইতে তো হুকুমটা অতি অনায়াসে বার হয়ে আসত; কিন্তু তাঁর সেই কিন্তু-কি মহা-অপরাধী ভাব দেখলে মনে হয়, না-জানি কি দুষ্কর্মের সুপারিশই তিনি করতে এসেছেন। অঘোরনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কি?"

"ওই মনি-শরৎ সাজ-গোজ করে বারে তুল্‌বে।"

"ও!" অঘোরনাথ যেন সুপ্ত-সর্প ফণা ধরে উঠ্‌লেন! বল্লেন, "জীবন নষ্ট! এটি জিম্‌নাষ্টিকের অপভ্রংশ, তথা সহজ বাংলা রূপে প্রচলিত ছিল কালে, গাঙ্গুলি বাড়িতে।

"কোথায় রাস্‌কেলরা?"

রাস্‌কেল দুটি ডেপুটেশনের পিছনে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে ছোট কর্তা দর্প-তোষণ দেখছিল। ব্যাঘ্র-হুংকার শুনে য-পলায়তি-স-জীবতি অবস্থা একেবারে অন্তর্ধান।

সব উৎসাহ আর আনন্দের প্রদীপের শিখাটা এক ফুঁ'এ নিমেষে নিভে গেল! ছোট কর্তা সারাদিন ঘোড়ার পিঠে এসেছিলেন বলে, সন্ধ্যা হতে হতেই পড়লেন ঘুমিয়ে। তাঁর ঘুমের অব্যর্থ পরিচয় ছিল নাসিকা গর্জন।

তখন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একটা সাজো সাজো রব পড়ে গেল। মামা-ভাগ্নে ভেল্‌ভেটের প্যাণ্ট আর পালক-লাগান গেঞ্জি চড়িয়ে ঘোষেদের পোড়ো বাড়ির দিকে রওনা হয়ে পড়ল। মেয়েরা ছাদের উপর উঠে দেখতে লাগল তাদের খেলা। গোটা চারেক রং-মশাল জ্বালিয়ে যা' অন্যায় জবরদস্তিতে হতে পায়নি—তাই বারংবার করে—অন্যায়কে যেন খণ্ডখণ্ড করে গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ করে দেবার জন্যই এই আয়োজন! মানুষের ইচ্ছেকে, মানুষের সাধকে এমন করে গলাটিপে মেরে ফেলা যায় না—আর তা উচিতও নয়; এইটেই যেন আমরা বার বার করে উপলব্ধি করেছিলাম সেদিন।

কিন্তু শেষের একটি ঘটনায় এও আমাদের বোধের মধ্যে এসে পৌঁছেছিল যে, সাধ-ইচ্ছের লাগাম ঢল করে দিলে বিপদও আসে অতর্কিতে এবং এমন ভয়ানক হয়ে ওঠে যা সাম্‌লান সব সময়ে সম্ভব হয় না।

মামা-ভাগ্নের উৎসাহের শেষ নেই, তখন তারা যেন কল্পতরু। 'আমি দুহাত উঁচু করে বল্লাম, "আমিও দুলবো,"—অমনি আমাকে হোরাইজণ্টাল বারে তুলে দেওয়া হল। আমি লোহার মোটা ছড়ের উপর একটা পা তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'ঘুরি' ?

"ঘোর্।"

বারদুই ঘোরার পর—হাত ফস্‌কে এসে পড়লুম চিৎ হয়ে মাটির উপর।

পিঠের ভরে পড়ে, বলা বহুল্য, আমার দম বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু জ্ঞান রইল টন্‌টনে। দেখলাম আমার চতুর্দিকে কুয়াসাচ্ছন্ন জ্যোৎস্না: ঘোষেদের ভাঙা বাড়ি; কানে পৌঁছল কান্নার শব্দ—দেখি—সবাই কাঁদছে। মনে হ'ল এই আমার শেষ। কানে শুন্‌তে পেলাম দুই বীরের চাপা পরামর্শ: 'চল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।"—

জানিনে, কি ওদের মনে হল! আমাকে দাঁড় করিয়ে—আমার পিঠে দুম-দাম করে কিল চড় মারতেই আট্‌কা দম কোঁকাতে কোঁকাতে কান্নার সঙ্গে বেরিয়ে এল।

তখন চারি দিকে হাসির তুফান বয়ে গেল।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে শরৎ আমাকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বল্লে,

"জ্ঞান ছিল তোর ?"

"ছিল।"

"কি মনে হচ্ছিল ?"

"মনে হচ্ছিল মরে যাচ্ছি।"

"কি করলি তখন ?"

"ওঁ হ্রীং বলার চেষ্টা করছিলাম।"

"যাক্ ! তাই বেঁচে গেলি এ যাত্রায়।"

মৃত্যুর অত কাছাকাছি হয়ে আবার বেঁচে ফিরে আসার মধ্যে যে কতখানি তীব্র আনন্দ আছে, তা' সেদিনই আমি প্রথম জান্‌তে পেরেছিলাম।

তিন

গাঙ্গুলিদের ভাঙ্গি-তো-মচ্‌কাইনে, অর্থাৎ কারুর কাছে নীচু, কি ছোট হব না ভাবটার তলায় বজ্র-কঠিন, পোক্ত, একটা রেক্তা-গাঁথুনীর ভিত্‌ ছিল বলেই মনে হয়; অভ্র-ভেদী নৈতিক আদর্শ। অধর্মার্জিত টাকায় রাতারাতি বড়-লোক হয়ে ওঠার দুর্দম ইচ্ছেকে এঁরা পাপ-ইচ্ছে মনে করে এর প্রলোভন থেকে নিজেদের সব সময়েই দূরে রাখার চেষ্টা করতেন।

সাংসারিকতার চতুর বিষয়-বুদ্ধির নিরিখে এটিকে নিছক বোকামি মনে করে উপহাস করার লোকের অভাব এখনও দুনিয়াতে হয়নি; বলা বাহুল্য, সেদিনও ছিল না। তাছাড়া, যারা টাকাকে বড় মনে করে নিজেদের ধর্মবুদ্ধিকে ছেঁটে কেটে খাটো করে আনে, তারা বিবেকের দংশন-জনিত অস্বস্তির জন্যে তথা-কথিত বোকা লোকগুলোর উপর নিরন্তর চটে-চটে শেষ পর্যন্ত কেমন যেন খামকা শত্রুতার ভাবেই উদ্যত হয়ে উঠে!

হিমালয়ের গগনস্পর্শী চূড়ায় ওঠার বাহাদুরির অসংসাহস, মানুষের মধ্যে ক্রমেই যেন-প্রকট হয়ে উঠচে। অবশ্য হিমালয় চিরদিন চুপ্‌চাপ্‌ মাথা উঁচু করেই আছেন; কাউকে ডেকে অপমান করে, কি আঘাত দিয়ে বলেন না যে,

তোরা অক্ষর, ক্ষুদ্র, কি শূদ্র! তবুও মানুষের দিক থেকে অভিযানের আস্ফালনের তর্জন-গর্জন দিন-দিন বেড়েই চলেছে!

পাড়ার এককোণে এই একটা পরিবার, যারা বলতে গেলে ছিল [illegible] যাদের ছেলেপুলেরা নেশা-ভাঙ্‌ করে বাজার জ‍ঁজিয়ে বেড়াত না; বছরের পর বছর এগ্‌জামিন পাশ করে জীবনের পথে শুধু এগিয়ে যাবারই একাগ্র চেষ্টা করত; যাদের বিয়ে-পৈতে-ভাতে, কি পূজা-পার্ব্বণে, হাতী-ঘোড়ার নাচ-কোঁদ হ'ত না, তাদের কিসের এই দুর্দ্দমনীয় 'সেখি' বা অহংকার।

শক্রকে ভেঙে চুরমার করে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জিদ্, কি রোখ্ থাকাও মানুষের মধ্যে একান্ত স্বাভাবিকই! গাঙ্গুলিদের অসামাজিকতা, তাদের এই রক্ষণশীলতাকে অমার্জনীয় দম্ভ বলে মনে করে নিয়ে দূরে থেকে শক্রতা করার লোকের সংখ্যা সে-দিন ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছিল—অনেকটা ঠিক জ্ঞাতি-শক্রতার মতই!

আবার, ভিতরদিক দিয়ে দেখতে গেলে, পাঁচটি আঙ্‌ুল কিছু সমান হয় না। গাঙ্গুলিদের পাঁচ-ভাইএর একসঙ্গে থাকাও, চিরদিন সম্ভব হ'ল না। কেউ গেলেন মুঙ্গেরে চাকরি নিয়ে, কেউ পূর্ণিয়ায়। অমরনাথের হ'ল অকাল মৃত্যু। অতএব সংসারের সমস্ত ভার গিয়ে পড়ল কেদারনাথের ওপর, আর তাঁর ক্ষিণ-হস্ত হলেন কনিষ্ঠ অঘোরনাথ। দীননাথ মেজ এবং মহেন্দ্রনাথ হলেন সেজ।

অঘোরনাথটি ছিলেন ওরই মধ্যে একটু যুধিষ্ঠির-মার্কা। প্রতিবেশীদের ঙ্গে সীমানা নিয়ে একটা ঝগড়া শেষ পর্যন্ত ধুঁইয়ে গিয়ে পৌছল আদালতে।

গাঙ্গুলিরা জানতো যেখানে ধর্ম সেখেনেই জয়। তারা রইল সত্য আর র্মের খুঁটি আঁকড়ে। ওদিকে, অন্যপক্ষ তদ্‌বির, আর 'পৈরবীর' অবধি রাখলে া। শেষকালে গাঙ্গুলিরা মামলায় জল দিয়ে, ঘরে ফিরে, কলির তাপ দেখে র্বাক-নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

ও পক্ষের কর্তাবাবা ছিলেন অন্ধ। পথের ওপর বিস্তৃত চাবুতরায় রোয়াক) বসে তিনি বিজয়-উল্লাসে গলাবাজি করছেন; "বুঝেচিস্ কিনা ামাচরণ, সত্যিই কিন্তু ও-জমিটা ছিল ঐ গাঙ্গুলি বেটাদেরই! রাস্তায়

এ-পারের এ-ভিটেটা তো ওদের কাছ থেকেই কুড়ি টাকায় আমারই কেনা, জলের দরে! বিঘে তুইতো হবেই! আর ও-পারটায় আমাদের ছিল মূলে হাবাৎ; কিন্তু আইনের দখ্‌লি যাবে কোথায়? ছুঁচ হয়ে—আজ বাঁধ্‌চি গরু, কাল চরছে ছাগল—এমনি করতে করতে—বিশ পঁচিশ বছর দিলুম কাটিয়ে—ওবেটাদের মগজে···আরে! এযে ঘোর কলি!—একি সত্যযুগ রে?—গর্দ্দভের দল!"

চাঁচা-ছোলা গলায় কে পেছন থেকে কথা কইলে, "কত্তা, আমিও আছি যে এখেনে!"

"তুই আবার কেরে? ভীমসেন নাকি?"

"ভূতো গাঙ্গুলি, আমি।"

কর্তা হাঃ হাঃ করে হেসে বল্লেন, "দেখছিস্‌নেরে গাঙ্গুলির পো—চোখের মাথা খেয়ে বসে আছি!"

অঘোরনাথের লেখাপড়ার মধ্যেও ছিল যুধিষ্ঠিরি একগুঁয়েমি। কর্তা রামধন গেছেন তখন হালিসহর। ভূতো গাঙ্গুলি বাংলা না-জানায়, তাঁকে লিখেছেন ইংরাজিতে চিঠি। চিঠির উত্তর এল কেদারনাথের কাছে, কিন্তু। লিখেছেন কর্তা; অঘোরনাথ তো দেখি, সায়েব হয়েছে। ওকে বলে দিও, আমি বাঙালী, বাংলায় ছেলের চিঠি না পেলে এ লজ্জা আমার কোনদিন ঘুচ্‌বে না!

উর্দ্দু ছেড়ে তদ্দণ্ডে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা নিলেন অঘোরনাথ, সে শুধু তাঁর সহধর্মিণী কুসুমকামিনীর ভরসায়। পাশও করলেন সেই জোরেই।

আবার তাঁর লেখাপড়া ছাড়ার গল্পটিও চমৎকার!

পাটনা কলেজে পড়তে গেছেন ফার্ষ্ট-আর্টস্‌। সেখেনে খবর গেল গেল যে, তাঁর এক নবকুমার জন্মেছে। আর যাবি কোথায়? ধূমকেতুর বক্রগতিতে অঘোরনাথ গিয়ে উপস্থিত হলেন জৈস্তিপুরে—মোহান্তের নাবালকের গার্জেন টিউটারি করতে! ছেলের বাপ হয়ে আর কিছুতেই সরস্বতীর দরবারি হওয়া যায় না!

কিন্তু তখন বাঙালী সরকারি চাকুরি খুঁজে হায়রাণ হ'ত না। অতএব অচিরে মতিলালকে গার্জেনির গদিতে বসিয়ে, অঘোরনাথ এলেন কানুনগোগিরি করতে ভাগলপুরে!

গঙ্গাপারে সরকারের খাসমহল টিংটঙ্গায় গেলেন অঘোরনাথ 'দিয়ারা' জমি বন্দোবস্ত করতে। একরাতে সে-তল্লাটের চাষীপ্রজারা এসে ধরে পড়ল এক টাকা করে বিঘে পিছু সেলামি দিয়ে কানুনগো সায়েবকে চল্লিশহাজার বিঘের বন্দোবস্তটা শেষ করে দিতে। আর কেউ হলে কি করত বলা শক্ত। মোবলক্ চল্লিশহাজার টাকা! অঘোরনাথ তাদের বাড়ি যেতে বলে অশ্ব-পৃষ্ঠে রাতারাতি রওনা দিলেন শহরের দিকে।

অতি প্রত্যুষে কমিশনার সায়েব ওয়েসমেকট্ চলেছেন বায়ু সেবনে—গেটের মধ্যে এসে ঢুকলো অঘোরনাথের ঘোড়া তীরবেগে।

ব্যাপার কি? সব শুনে সায়েব বল্লেন, "আজ তুমি বড় ক্লান্ত—যাও গিয়ে ঘুমোও গে। দেখছি আমি কি করতে পারি।"

যথাসময়ে কেদারনাথের তলব হ'ল সায়েবের কুঠিতে। অঘোরনাথ অস্থায়ী পদে পাকা হলেন এবং ঐকাজে তিনিই সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করে সায়েব তাঁকে কাজে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন।

অঘোরনাথের বন্ধু-বান্ধবের দল তাঁকে বহুদিন ধরে টিট্‌কিরি দিত, "তুই একটা নিরেট!—চল্লিশ চল্লিশ হাজার টাকা; আমরা হলে? পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খেতাম আজীবন!"

কিন্তু যুধিষ্ঠির-ব্রাহ্মণের ঐ তো বালাই!

ভাগলপুরের রাজা শিবচন্দ্র ছিলেন স্বনাম-ধন্য পুরুষ। অতি দরিদ্রের সন্তান, খুদ-কুঁড়ো খেয়ে মানুষ! রাতে রাস্তার ল্যাম্প-পোষ্টের আলোয় পড়া মুখস্থ করে ওকালতি এগ্‌জামিনে প্রথম হয়ে সোনার পদক পান। তারপর, খোদা ছাপ্পর ফুঁড়ে দিলেন অর্থ। অল্প দিনের মধ্যে এই দীন-নন্দন হলেন রাজা। রাজা বিলেত যাওয়ার পর ফিরে এলে বাঙালীদের মধ্যে লেগে গেল ঝুটোপুটি, খেংরা কাঠির লড়াই বাঁধল নারদ সৈনিকের মধ্যে।

রক্ষণশীল ধর্মধ্বজী গাঙ্গুলিরা যে কোন্ দলের নেতা হলেন তা বলা বাহুল্য। অঘোরনাথ শিবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুই ছিলেন। কিন্তু—"আমার দেবতা আমারে চাহিলে কে মোর আত্ম পর।" কেদারনাথ শান্ত সংযত মানুষ ছিলেন, বয়সও হয়েছিল পরিণত; কিন্তু সূর্যের চেয়ে বালির তাং বেশি হয়। অঘোরনাথের প্রচণ্ড প্রতাপ, ও দলের অসহ্য হ'ল। অতএব অঘোরনাথ হলেন মালদায় বদলি।

মালদায় গিয়ে অঘোরনাথ আর-এক পরীক্ষায় পড়লেন। এক জমিদার তাঁকে একটা নকসার আঁজি মোটা করে দিলে বহু অর্থ দেবার প্রস্তাব করাতে অঘোরনাথ সেই হত-ইতি-গজতে, কিছুতেই রাজি হলেন না। তাঁর এই লোভহীনতায় জমিদার মুগ্ধ হয়েছিলেন।

মনে হতে পারে ধান ভান্তে শিবের গীত গাইছি। কিন্তু একটি কথা এখানে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দি। শরৎচন্দ্র চরিত্র সৃষ্টি বাস্তব থেকেই করতেন। সেই বাস্তব তাঁর অভিজ্ঞতারই জিনিষ ছিল। এই সব বাস্তবের মাল-মশলা সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়ে শরৎ-সাহিত্য অপূর্ব বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে, এ কথা বল্লে সত্যের অপলাপ হবে না বলেই মনে হয়!

অঘোরনাথ আর শরতের বাবা মতিলাল সতীর্থ এবং সমবয়সী ছিলেন। এই অবস্থায় দু'জনের যে বন্ধুত্ব-সূত্র গড়ে উঠতে পারে তার একান্ত অভাব ছিল। অঘোরনাথ ভিতরে বাইরে খোলা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন; পেটে এক, আর মুখে আর এক, তাঁর ছিল না-তো বটেই, শুধু তাই নয়, সেই ধরণের মানুষকে তিনি দু-চক্ষে দেখ্তে পারতেন না। সত্যভাষণ অঘোরনাথের মুখ থেকে শান্ত-গতিতে নির্ঝরিণীর ধারার মত ধীরে-সুস্থে মন্দাক্রান্তা ছন্দে, বার হবার কোন খেয়ালই রাখত না,—এবং তা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা সাক্ষেপ ছিল না। ফোয়ারার উচ্ছ্বসিত অধৈর্যের সঙ্গে তুলনা করলেও ঠিক হয় না। তুব্ড়ির উদ্দাম-উচ্ছ্বাস-প্রগল্ভতার সঙ্গেই তার যেন কোথায় মিল ছিল। প্রিয়-অপ্রিয়ের কোন বিচারও নেই, অপেক্ষাও নেই; নিমেষের মধ্যে আগুনের মত সত্যকে নিঃশেষে উদ্গীরণ করে দিতে পারলেই তাঁর শান্তি। এই মানুষটির

সঙ্গে সহ্য করা যে কত শক্ত, কতখানি সহ্যশক্তির দরকার তা' 'কারে' না পড়লে কিছুতেই বোঝা যায় না। মহাদেবের অগ্নি-দীপক সহ্য করতে যেমন একমাত্র উমাই পেরেছিলেন, তেমনি কুসুমকামিনীর পৃথিবীর মত সহিষ্ণুতা, সর্বং-সহা শক্তি অঘোরনাথকে সহ্য করে, সর্বান্তঃকরণে জীবনের উপাস্য দেবতা বলেই শিরোধার্য করতে পেরেছিল। মতিলাল এই বাড়বটিকে সহস্র যোজন দূর থেকে প্রণাম করে বন্ধুত্বের আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

বিবাহের পর মতিলাল লেখাপড়া করতে দেবানন্দপুর ছেড়ে ভাগলপুর চলে এলেন। খুব বড় প্রয়োজন না পড়লে তাঁর দেশে যাওয়া হ'ত না। সে যাওয়া ব্যয়-সাধ্য বলে আবার শ্বশুরবাড়ির সাহায্য ভিন্ন ঘটাও ছিল মুস্কিল। বনের অব্যাহত-গতি এই চিড়িয়াটির প্রকৃতপক্ষে দাঁড়াল যেন পিঞ্জর-কারাবাস! ভুবনমোহিনীর রূপ ছিল না! এবং নাকি যৌবনেও পা দিতে দেরি ছিল। তা-ছাড়া, গাঙ্গুলিরা ছিলেন যেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের মঠের সংযম দৃপ্ততার বহ্নিমান এক-একটি স্ফুলিঙ্গ—অঙ্গার কণা! শ্বশুরবাড়ি নিয়ে ভাগ্য-দেবতা মতিলালের সঙ্গে যে একটা কঠোর পরিহাস-বিদ্রূপের খেলাই খেলে ছিলেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি'—এই পতাকা বইবার পক্তিও কিন্তু ছিল মতিলালের।

ছাত্রানাম্ অধ্যয়নম্ তপঃ। একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব তার সঙ্গে! এদিকে আবার, ইংরিজির ঠেলা: প্লেন লিভিং, এণ্ড্ হাই থিংকিং।—অধ্যয়নের শাসন-তন্ত্রে ছাত্রানাম প্রাণ হতো তুলোরাম খেলারাম। কিন্তু এই সাপে-নেউলে—খেলার ওস্তাদ খেলোয়াড়ও ছিলেন মতিলাল। পড়ুয়া ছেলেদের মোটা ভাত কাপড় ছাড়া আর কোন-কিছুর দরকার যে থাকতে পারে, সেই জীবে দয়ার ফাঁকটি পর্যন্ত ছিল না কর্তাদের ইস্পাতে তৈরী মনে!। কিন্তু বজ্র আঁটনের ফস্কা গেরো, খুঁজে বার করেছিলেন মতিলাল!

কেদারনাথের বন্ধু-বাৎসল্যে বৈঠকখানায় সকালে-বিকেলে বহু ভদ্র-লোকের সমাগম হ'ত। তাঁদের মধ্যে সকলেই কিছু ব্রহ্মচারী-ব্রতধারী ছিলেন না। সেখানে পান-তামাকের অবাধ গতি। গড়গড়া সটকার আমিরি বিলাস-বৈভব

না থাকলেও—রূপো বাধান হুঁকো সারে সার, সেকালের রীতি অনুসারে কড়িরকণ্ঠ ধারণ করে, স্ব স্ব সিংহাসনে সমারূঢ় থেকে অতিথি অভ্যাগতদের যথাযথ সম্মান দিয়ে কৃতার্থ হতো। আবার, সোনায় সোহাগা! কর্তার হেকাজতের সহৃদতায়, হিংলি (ইংলিশ?) তামাকের পত্র-চূর্ণ, মাৎগুড়ের প্রেমে যে রভস মিলনের তাল পাকিয়ে উঠ্‌ত, তাতে অম্বুরি মশলার গন্ধে, কলা এবং কাঁঠালের সহযোগিতায় যে তাম্রকূট রসায়ন জন্মলাভ করত তা' নাকি দেবতাদের মনেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করত! বড় বড় মাটির হাঁড়ায় জঠরগত হয়ে যথা নিয়ম দীর্ঘ পাতালবাস করার পর অগ্নিসংযোগ সেই অমূল্য বস্তু যে গন্ধের অবদান সৃষ্টি করত তাতে দেবতাদের কি হয়েছে, জানা নেই: কিন্তু মতিলালের পিতৃপুরুষ অর্জিত মৃত-কল্প ধূমপানের আকাঙ্খা নবজন্ম লাভ করে তাণ্ডব করতে থাকত।

ভাগ্যদেবতা একদিকে কঠিন হলেও অপর দিকে হয়তো একটু কোমল হন! বৈঠকখানার সরাসরি হাত ত্রিশ চল্লিশ দূরে, দক্ষিণদিকে, বিস্তৃত চিকে-ঘেরা বারান্দার পিছনে দুটি কুঠ্‌রির, পূবেরটিতে থাকতেন অমরনাথ, আর পশ্চিমেরটিতে থাকুত বৈঠকখানার সাজ-সরঞ্জাম, আস্ত এবং ভাঙ্গা আসবাব পত্র এবং ইত্যাকার বহুবিধ কেজো এবং অকেজো সামগ্রী। তার মধ্যেই তাম্রকূটের হাঁড়াগুলি পাতাল মুক্তির পর এসে নিঃশেষিত হবার প্রতীক্ষায় বিরাজ করত। মতিলালের বসার জায়গা ছিল এই চিক্-ফেলা বারান্দাটি! অতএব এই বাঞ্ছিত বস্তুর সান্নিধ্যের সৌভাগ্যটি বিধাতার পরম করুণা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

সেই কুঠ্‌রির পশ্চিমে একটি অতি সংকীর্ণ গলির অন্ধ-তমসায়, বাঁশের খুঁটোয় ঝুলত একটি হরিজনোচিত পকেট-হুঁকো! মতিলালের যৌবনের কামনা-বাসনার পরম সান্ত্বনার ধূমাগ্নিজল সম্বলিত এই [illegible] আধারটি!

এই অকিঞ্চিৎকর বস্তুটির উপর কথার এতবড় ঝড় ওড়ানোর দরকার কি? আছে। যে আবহাওয়ার মধ্যে মতিলাল অন্তরীক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত হলেন প্রজাপতির নিগূঢ় চক্রান্তে, যে সব সুকঠোর নিয়মতন্ত্রের অস্ত্রশস্ত্র দশপ্রহরণ-

ধারিণীর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধনুর্বাণের মতই প্রখর এবং ভয়াল ছিল, তাদের অনায়াসে অতিক্রম করেই মতিলাল নিজের মতি স্থির রাখতে পেরেছিলেন।

কর্তাদের শ্যেন চক্ষু এড়িয়ে সেই পকেট-হুঁকোটিকে অক্ষত রাখার জন্যে মতিলালকে অসম্ভব বুদ্ধির খেলা যে মধ্যে মধ্যে খেলতে হ'ত, তা বলা বাহুল্য। স্নানাহারের অনিবার্য অনুপস্থিতিতে তাকে একদিন চালের বাতায় আড় করতে গিয়ে মতিলাল বোল্‌তার কামড়ে নশ্বর নবকলেবর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এমন কথাও দুষ্ট লোকেরা বলে থাকে। তার জন্যে তাঁকে তিনদিন স্কুল কামাই করে বিছানা নিতেও হয়েছিল, এমন কিংবদন্তি বহু-নিন্দিত গাঙ্গুলি পরিবারে প্রচলিত ছিল।

কিন্তু মতিলাল ছিলেন দুর্ধর্ষ বীর! পিতৃ-পুরুষদের এই অমোঘ সংস্কার তিনি জীবনের সহস্র দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে অব্যাহত ভাবে বহন করে এনে বাবাজীবনের হস্তে ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত চিত্তে পরলোক গমন করেন।—ইদানিং ডাক্তারেরা শরৎচন্দ্রের ব্যাধির কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে নিরুপায়-নির্বুদ্ধিতায় বলে বসলেন যে, ঐ তামাকই সকল নষ্টের গোড়ায়। সেই কথা শুনে শরৎচন্দ্রের মুখে যে ক্ষমা-সুন্দর হাসিটি ফুটে উঠে ছিল তাতে পূর্বপুরুষের আশীর্বাদব্যঞ্জক বরাভয়, রসিকমাত্রেই লক্ষ্য করেছিলেন।

বাড়ির মেয়েরা কিন্তু মতিলালের তামাক খাওয়াটাকে অনেকটা ক্ষমা-ঘেন্না-হাসি-তামাসার ভাবেই নিতেন। তাঁরা বাপের বাড়িতে ঐ বস্তুর অবাধ ব্যবহার দেখে অভ্যস্তই ছিলেন; আর মতিলাল বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের ছেলে, অমন একটু-আধটু হয়েই থাকে বলে লঘুভাবে উড়িয়েই দিতেন।

কিন্তু মতিলালের একটি কাজকে এ বাড়ির কেউ কোনদিন ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারেননি!

বড়দিদি ছিলেন কেদারনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা। বিবাহের অতি অল্প কালের মধ্যেই তাঁর বৈধব্য ঘটে। এক বর্ষার দিনের মেঘান্ধকার প্রত্যূষে বড়দিদিকে বিষধরে কামড়ায়। কেদারনাথ নিজের হাতে বাঁধন দেন, কামড়ানো জায়গা থেকে কেটে রক্ত বার করে ডাক্তার সাহেবের প্রতীক্ষায় সময় কাটাতে লাগলেন; তিনি সে-দিন সন্ধ্যার আগে সফর থেকে ফিরবেন না।

মোল্লাচকের মৌলানার মন্ত্রপূত জলে নাকি বহুলোক বেঁচেছে; কিন্তু তাতে বাঁধন খুলে দিতে হয় বলে কেদারনাথ কিছুতেই রাজি হননি। সমস্তদিন ঝাড়-ফুঁক, রোজাদের সমাগমনে বাড়ি সরগরম। বড়দিদি চেয়ারে বসে আছেন; বাঁধনের যন্ত্রণা আর সইতে পারছেন না। কেদারনাথ একবার গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন রাস্তায়, সায়েবের আশায় আবার ছুটে আসছেন বড়দিদির কাছে। মতিলাল সেখানে হামেহাল হাজির।

পথের উপর গাড়ির শব্দ শুনে ছুটলেন কেদারনাথ। আর কি! সায়েব তো এসে গেছেন। ডাক্তার এসে দেখলেন সব বাঁধন কাটা, বড়দিদির মাথাটা কাঁধের ওপর নেতিয়ে প'ড়েছে! ব্যর্থ হ'য়ে ডাক্তার গেলেন ফিরে।

মতিলাল কি মনে করে যে বাঁধনগুলো কেটে দিয়েছিলেন তা বলা শক্ত। তাঁর কৈফিয়ৎ ছিল যে, বড়দিদি হুকুম দিয়েছিলেন, আর তাঁর যন্ত্রণা মানুষের সহ্যশক্তির বাইরে গিয়েছিল।

বুদ্ধিমান মানুষ, অকারণেই একাজ করেছেন বলে মনে হয় না। মতিলালের সপক্ষে এইটুকু মাত্র বলা যায়। কিন্তু তিনি জীবনে কোনদিন এই রহস্যময় অদ্ভুত ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা পান্‌নি গাঙ্গুলিদের কাছ থেকে। মতিলালের চরিত্র আলোচনা করলে মনে হয় মতিলালের অপরাধের চেয়ে তাঁর ওপর অবিচারই হয়তো বেশি হয়ে থাক্‌বে। বিচার করার সময় অপরাধীর ভূমিতে তার সঙ্গে সমান হয়ে না দাঁড়ালে, সে বিচার কিছুতেই সু-বিচার হয় না। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মতিলাল বাড়িতে আর কারুর চেয়ে বড়দিদিকে কম ভালোবাসতেন না।

চার

মতিলালের স্বভাবের কাঠামো, তার উপকরণের ধাতু, মানুষের জীবনকে দেখার ভঙ্গিই ছিল অসাধারণ এবং বিচিত্র। প্রকৃতির সহজ স্রোতের গতিতে ভেসে গিয়ে যেখানেই হয়-না-কেন ওঠা; তাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। তার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য কি আদর্শ নেই; তাতে পৌঁছবার জন্যে মনের মধ্যে

কোনরকমের আবেগ, কি উদ্বেগ কি ঝাঁকু-পাঁকু নেই! মতিলালের চাল, চলন, মজ্জাগত অভ্যাস, তাঁকে শুধু নিয়ে চলেছে আগে সামনের পথে। এদিকে গাঙ্গুলিরা কিন্তু ছিলেন একেবারে ভিন্নপন্থী—তাঁদের ধরা-ছোঁয়া যায় এমন একটি আদর্শ ছিল, তাকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে নিত্যই উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌তো।—তাকে না পেলে তাঁরা মর্মান্তিক বিষণ্ণ হতেন। গাঙ্গুলিদের পারাধি ছিল ছোট খাটোর মধ্যে;—কিন্তু মতিলালের মনুষ্যত্বের অবয়বটা ছিল কেমন যেন একটা বে-সামাল অজগর জাতীয়।

গাঙ্গুলিরা আদর্শে উপনীত হওয়ার জন্য নিয়ম-পালনের উপর প্রাণপণ জোর দিয়ে হয়তো পক্ষ-পাতিত্ব দোষে দুষ্ট হয়ে যেতেন। কিন্তু মতিলাল আশা-আকাঙ্ক্ষা-বিবর্জিত ঔদাস্যভরা মন নিয়ে—দূরে দাঁড়িয়ে ওঁদের এই পণ্ডশ্রম দেখে—হেসে বাঁচ্‌তেন না। মতিলাল হয়তো মানুষকে সবার বড়ো বলে মনে করতেন! গাঙ্গুলিরা ধর্মকে, নিয়মকে বড় বলে—জীবনটা মাঝি-মাল্লার মত অক্লান্ত শ্রম এবং প্রচেষ্টায় অতিবাহিত করতেন। এক পক্ষ মনে করতেন ভোরে উঠে গঙ্গা-স্নান, আহ্নিক, পূজা না করলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়। অপর পক্ষ মনে করতেন অমৃতেরই পুত্র তো মানুষ!—ও সব ছোট-খাটো ব্যবস্থা—আসল মনুষ্যত্বের জন্যে প্রয়োজনীয় তো নয়, বরঞ্চ বাজে, ফজুল—ভূতের বেগারমাত্র! এই দুয়ের মধ্যে মিলের চেয়ে গরমিলই ছিল প্রকট এবং বড়।

নিয়ম পালনের আতিশয্যে মানুষের মনে একটা অবাঞ্ছিত অহংকার এসে সেটিকে এমন কঠিন এবং দুর্বিনীত করে তোলে যে, তার সংস্পর্শে এলে প্রীতির চেয়ে আঘাতের পরিমাণই বেশি হয়। সেখানে সমদৃষ্টির সাম্যের চেয়ে সমালোচনার বৈষম্যের নির্দয় ছুরি যেন ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েই মনে মনে পরম তৃপ্তিলাভ করে। এই রকমের একটা নির্দয় অবিচারের জবরদস্তি—মতিলালের দেহমনকে মর্মান্তিক বিরক্তিতে তিক্ত করে দিয়েছিল হয়তো। তাই নির্গুণ ব্রহ্মের মত ঐ সংসারে অবস্থান করা ভিন্ন মতিলালের গত্যন্তরই ছিল না।

কিন্তু আর একটি কথাও আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে: মতিলাল শুধু একল্যা নয়, একান্ত অসহায়ও ছিলেন এই সংসারে। তাই স্তব্ধ নীরবতাই ছিল তাঁর রক্ষাকবচ। বাড়ির জামাই বলে হয়তো বা কিছু নিস্তারের অব্যাহতি ছিল।

হয়তো মতিলাল দীর্ঘদিন টিকে থাক্‌তে পারতেন না, যদি না ভুবনমোহিনীর মত সঙ্গিনী এবং সহধর্মিনী পেতেন। সরস কোমল হৃদয়ের অসীম মাধুর্য রসে উত্তপ্ত ভালবাসার উর্বর ভূমির উপর তাঁর পতিভক্তির মহাদ্রুমটি ছিল হিঁদুয়ানির আদর্শের নিকড়ে একান্ত দৃঢ়বিধৃত! তার মেদুর ছায়ার তলে এই যাযাবর মানুষটি গেড়েছিলেন তাঁর আসন। মতিলালের ছন্নছাড়া জীবনটিকে ভুবনমোহিনী আমরণ কেমন করে তাঁর প্রেম-ভক্তির অঞ্চলে আবদ্ধ রেখেছিলেন সে কথাও পরে আপনিই এসে পড়বে।

এমন একটি দম্পতির কাহিনী আমরা "শ্রীকান্তের" মধ্যেও পাই। তখন মন স্তম্ভিত হয়ে ভাবে শরৎচন্দ্র কোথায় দেখেছিলেন এমন একজোড়া অদ্ভুত মানুষ! সেই সাপ ধরা মানুষ!—সাহ্‌জির সঙ্গে কোথায় যেন একটা অদ্ভুত মিল!

বাস্তবকে রূপদান করে ইন্দ্রজাল গড়ার শক্তি শরৎচন্দ্রের ছিল। প্রশ্ন করে শুধু উত্তর পেয়েছি তাঁর অর্থপূর্ণ চাহনির মধ্যে! হেসে বলতেন, "কিন্তু বাস্তব তো সাহিত্য নয়। কি হবে জেনে তারা কে ছিল? আমি তাদের ভালোবেসেছি—তাই সাহিত্যে চিরন্তনের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র! বিচার রইল মহাকালের হাতে!"

কর্মে-শিথিল স্বপ্ন-বিলাসী মতিলালের মত মানুষের স্থানই যে সংসারের সকল-কিছুর উর্ধ্বে এই প্রতীতিই ছিল দৃঢ় বদ্ধ-মূল। ভাব-রাজ্যে বিচরণ করতে করতে দৈনন্দিন খেইগুলো এলেমেলো হয়ে যেত। আবার কোথাও বা গিঁট বেঁধে জোট পাকিয়ে যেত। দুঃখ দৈন্য ছিল তাঁর আজীবন সহচর। তাদের হয়ত পছন্দও করতেন না কোন দিন, কিন্তু তাঁদের ভয় করে ভালো ছেলে হয়ে যাবার মত ভীতুও ছিলেন না মতিলাল। এ-সব ভুলে যাবার জন্যে

মন ছুটতো বইএর দিকে, আবার লেখার আঁদাড়-পাঁদাড়েও। দিনের বেশি সময় কেটে যেত বই নিয়ে। লেখকের অক্ষমতায় ব্যথিত হয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌তেন নিজেই বই লেখার সংকল্পে। তখন কালি-কলমের খোঁজ হত; হয়তো কাগজ আছে তো কালি গেছে শুকিয়ে—আবার দুই থাক্‌লেও মনের মধ্যে উঁকি মেরে গেল একটু জুৎমত করে তামাক খেয়ে নিয়ে কাজটি সুরু করে দেওয়ার খেয়াল। কোথায় চাকর, কোথায় গড়গড়া! পকেট বাজিয়ে দেখলেন কিছু রেস্ত আছে কি না; থাকলে তখনি চল্লেন তামাক কিন্‌তে; আবার তামাকের দোকানে বসেই দিনটা বুঝিবা কেটেই গেল!

পয়সা না থাকলে মন বিগড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। রোদে পিঠ দিয়ে—ময়লা চাদর খানিতে আবার গা ঢেকে, সুতো বাঁধা বেঁকা-চোরা চশমাখানা কোনরকম করে চোখে লাগিয়ে বসলেন। অন্যমনস্কতা-নিবন্ধন কাঁচা-পাকা গোঁফের কোঁকড়ান বিরল চুলগুলো বাঁ হাতে আঙুল দিয়ে নির্মমভাবে টান্‌তে টান্‌তে ডুব দিলেন হয়তো "মিষ্টিস্‌ অফ দি কোর্ট অফ লণ্ডনের" বিস্তৃত পাতার অতিক্ষুদ্র অক্ষর-সমুদ্রে!

শীতের ম্লান-আলো-ঘোলাটে অপরাহ্ণে মতিলাল ঝুঁকে আছেন বইএর উপর,—এ ছবি আজও যেন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই। অপরাহ্ণে উনুন ধরাবার সময় ভুবনমোহিনী মনে করে তামাক সেজে হুঁকোটা হাতে তুলে দিয়ে গেলেন। মতিলাল কৃতজ্ঞ-প্রসন্ন চোখে জিজ্ঞেস করলেন, "কি করে জান্‌লে আমার এত ইচ্ছে হয়েছিল?"

ভুবনমোহিনীর ছোট দুটি চোখ আদরে মিটি মিটি হয়ে যেত, বল্‌তেন, "ও আমরা কেমন আপনিই যেন বুঝতে পারি!" মতিলাল অবিলম্বে উৎসাহের ধূমে চতুর্দিক ভরিয়ে দিয়ে বল্‌তেন, "ওগো একটা আলো দেবে?"

"সারাদিনই তো ঐ ছাই মাথা-মুণ্ডু পড়লে; এখন যাওনা একটু বেড়িয়ে এসো।"

ইচ্ছে না থাকলেও অসল মানুষটি বইখানা বন্ধ করে উঠে কোথায় বার হয়ে গেলেন।

মতিলাল সৌখীন ছিলেন। তাঁর মনে কাব্য ছিল, কল্পনা ছিল; কিন্তু

সবার চেয়ে বড় ছিল নিষ্ক্রিয়-নিশ্চিন্ততায় জীবনটাকে অনায়াসে বয়ে যেতে দেওয়ার মরিয়া সাহস আর ঢালাও আমিরি। যে সব খেয়ালি স্বপ্নের কুঁড়িগুলি অভাব আর টানাটানির প্রতিকূলতায় ফুটে উঠতে পায়নি সেদিন, চিরদিনের জন্যে তারা কিন্তু নষ্টও হয়ে যায় নি। একদিনের অতৃপ্তি—অন্যদিনের সুবর্ণ-সুযোগের প্রতীক্ষা-ধ্যান-নিদ্রায় দিন কাটাতো মাত্র!

শরতের ঘর-ভরা অনিত্যের উপকরণ,—তার বাহুল্যের সাজ-সরঞ্জাম; তাকে-তাকে, থাকে-থাকে, বিচিত্র বর্ণের, অদ্ভুত গড়নের কাঁচের বাসন; শিশি-বোতল, ছোট আফিমের কৌটাটির উপর কারুশিল্পের কৌতুক বিলাস; হুঁকো, কল্কে, তামাক-টিকের সৃষ্টি ছাড়া বড়-মানুষি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নলবেষ্টিত গুড়-গুড়ি সট্‌কার গোষ্ঠী সম্প্রদায় দেখ্‌লে মনে হত, মতিলালের অপূর্ণ সাহিত্য প্রেরণাই কেবলমাত্র স্ফূর্ত হয়নি শরৎচন্দ্রের প্রতিভার প্রদীপ্ত আলোক সম্পাতে, পূর্ববর্তীদের খেয়ালের অপূর্ণ এবং ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার বিম্বগুলিও সাত রঙে রঙিন হয়ে দেখা দিয়েছিল খেয়ালের বিচিত্র রাজ্যে বে-পরওয়াভাবে কমলার কৃপা-কণার অচিন্তিত সম্পদের আতিশয্য-বন্যায়!

শরৎচন্দ্র ছিলেন সংযত-বাক। তার অশেষ সৌজন্যের সাক্ষ্য এবং পরিচয় দেবার লোকেরও অভাব হবে না, আশা করি। তাঁর ব্যবহারে চমৎকার সংগতি দেখ্‌তে পাওয়া যেত। কিন্তু একটি কথা মনে করলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়! শরৎচন্দ্র সভা-সমিতিতে কাউকে গ্রাহ্য না করে তামাকের পরিচর্যা করতেন। আর তার চেয়ে আশ্চর্য—এ দেশে একটি লোকও ছিল না, এই বেয়াদবির বিরুদ্ধে আপত্তি জানাবার!

বহুবার লক্ষ্য করেছি যে ফটো তোলবার সময় তাঁর গড়গড়া নিজের চেয়ে বেশি প্রাধান্যই লাভ করত। বলতেন মসকরা করে, "ও যেখানে নেই—তো আমিও নেই সেখানে।"

শরৎচন্দ্রকে সন্ধ্যা, আহ্নিক, তর্পন কি শ্রাদ্ধ করতে দেখা যেতনা। কিন্তু

তাঁর বামুনের পৈতের ওপর অগাধ ভক্তি ছিল। ব্রাহ্মণ-তনয় গলার ঐ সুতো ক'গাছির প্রতি অবহেলা দেখালে তাঁর উষ্মার শেষ থাকত না। শেষ জীবনে কিছুদিন গলায় কণ্ঠি বেঁধে—চিত্তরঞ্জনের উপহার দেওয়া, গোবিন্দ মূর্তির স্বহস্তে সেবা করতেও দেখা গিয়েছিল।

তিনি বৈজ্ঞানিকের যুক্তিমত্তাকেও সমস্ত মন দিয়ে শ্রদ্ধা করতেন; কিন্তু তাঁর ব্যবহারের মধ্যে অযুক্তির একগুঁয়েমিরও অভাব ছিল না। বামুনের পৈতের মত হয়তো বা তাঁদের বংশের একটি অপরিহার্য ধারা হিসেবে তাম্রকূট সেবনকে ধরে নিয়ে—গর্বই অনুভব করতেন। নেশার উপর অপরিসীম দরদ শরৎচন্দ্রের চরিত্রে একটি দুজ্ঞের্য় রহস্যের মতই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এটাকে দুর্বলতা মনে করার মত ধী কি সংস্কৃতি তাঁর ছিল না মনে করলেও তাঁর ওপর সমূহ অবিচার করা হয়। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, এই দুর্বলতাকে সহজ করে নিতে কোন লজ্জাই মলিন ছায়াপাত করতনা তাঁর মনে!

ছেলের দল মনে মনে মতিলালকে ভালো তো বাসতই, উপরন্তু তাঁর প্রতি তাদের দরদও ছিল অপরিসীম। শাসন এবং শাস্তির ক্ষমহীন নিষ্ঠুর ব্যবস্থা কণ্টকিত সেই সংসার কারাগারে মতিলাল ছিলেন যেন একটি গবাক্ষ, যার মধ্য দিয়ে মুক্তির আলোবাতাসে অফুরন্ত বার্তা এসে পৌঁছত তাদের কাছে নিত্যনিয়ত। তাঁর কথা মনে করলে আজও সেই শিশু-হৃদয়ের পুলক-স্পর্শের মধুর উত্তাপটি বুকের মধ্যে তপ্ত অনুভূতি দিয়ে যায়! মতিলালের মতো এতবড় দরদী-বন্ধু আর একটিও দেখতে পাওয়া গেল না এই জীবনে!

গঙ্গার জল বেড়ে থৈ থৈ করছে। মাণিক-সরকার ঘাটের পাড়ের ওপর একাণ্ড বটগাছের বিস্তৃত ডাল থেকে জলে ঝাঁপ খেয়ে পড়ার যে একটি অপরূপ মজার আনন্দ—তা কি বয়স্কদের মধ্যে শুধু মতিলালই জান্‌তেন? আর সবার মুখ নিষেধের গাম্ভীর্যে ভয়ংকর! তাই সকাল থেকেই মতিলালকে খুশী করার জন্যে চল্‌ছে ছেলেদের আজগুবি চেষ্টা, কেননা জানে তারা, তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। মতিলাল গিয়ে দাঁড়ালে কর্তারা হতেন নিশ্চিন্ত এবং ঠাণ্ডা, আর ছেলেদের পোয়া-বারো-তেরো—তারা যেন পেত আকাশের চাঁদ, মুঠোর মধ্যে।

যেদিন এই কাজের ভার মাণিক-মুসাই চাকরের উপর পড়ত সে দিন মনে হত গঙ্গায় জল বিশ্রী ঘোলা, তার স্রোত যেন থম্‌কে গেছে! স্নানটাই একটা অতিরিক্ত ফজুল কাজ বলে মনে হ'ত, সে-দিন। জলে হাঁফাই ঝুড়তে ঝুড়তে সাঁতার শেখাই হ'ল সকল মজার সেরা মজা!—সেটি না থাকলে কিছুতেই কিছু নেই। সব আনন্দের গুড়ে যেন এক খামচা বালি দিয়ে গেছে কে!

ডুব ঝুড়ে কাদা থেকে বাণ মাছ ধরার মধ্যে যে কি অদ্ভুত রস আছে তা যারা না ধরলে কোনদিন, তাদের জীবনই তো বৃথা!—কেমন করে জান্‌বে সে, চিনি কি জিনিষ, যার ভাগ্যে জুটল না চিনি কোন দিন? তারা জানে শুধু, ঘোলা নতুন জলে নাইলে হয় সর্দি, জ্বর আর নিমোনিয়া। মতিলাল হয়তো দুই জান্‌তেন কিন্তু তাঁর বিচার হ'ত একদম নির্ভুল যখন তিনি শিশুদের ভূমিতে নেবে এসে তাদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে হতেন শিশুরাজ! সেই রাজাই তো সত্যিকার রাজা যিনি পারেন প্রজাদের মন মাতিয়ে খুশি হয়ে তাদের সঙ্গে মিশে যেতে!

একদিন সকালে একটা প্রকাণ্ড ভড় নৌকো এসে ভিড়লো ঘাটে,—ওপারের ঝাউ এর বোঝা নিয়ে; তাতে শুক্‌নো, কাঁচা-কচি ঝাউএর পালা। শুক্‌নো গুলো পড়তে পেলে না—জ্বালানি হবে বলে। কাঁচাও গেল; কিন্তু কচিগুলো পড়ে রইল ছিটিয়ে এদিক ওদিক। ওর রসিক ছিল ছেলেদের দল। পাতা ছাড়িয়ে আকাশের মধ্যে ঘুরিয়ে দিলে, আওয়াজ ওঠে,—'সপাং'! তাতে যে স্বর-গ্রামের সাতটা সুরই অঙ্গা অঙ্গি করে আছে তা' তারাই জানে শুধু। সেই আওয়াজে আবার সাত-রঙা অদৃশ্য পক্ষীরাজ সাতটা যে আকাশে ল্যাজ তুলে ছোটে! সে ঘোড়া দেখতে পাওয়ার চোখ, সে আওয়াজ শুন্‌তে পাওয়ার কান—অন্ধ কালা হয়ে যায় তাদের, যারা সংসার-রথের চাকার ঘড়-ঘড়ানি শুনেছে একটি বার! কিন্তু মতিলালের চোখ-কান ঐ বিকট শব্দে কোনদিন ভোঁতা হয়ে যায় নি।

তিনি ছেলেদের সঙ্গে সমান আনন্দে চাবুক চালিয়ে চলেছেন—সপাং, সপাং, সপাং, সপাং! আপিসের কি ইস্কুলের বেলা বয়ে যায়—এ-সব ছোট-

খাট, অকিঞ্চিৎকর কি অবান্তর কথা মনে করার অবসরও নেই, ফুরসৎও নেই কারুর সেখানে!

কিন্তু হায় পার্থিব অপূর্ণতা! অকস্মাৎ ঠাকুরদাস এসে উপস্থিত। শ্রীমান্‌টি কেদারনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র—শাসন বিভাগের যেন মূর্তিমান বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আর কি! তাঁর মধ্যে বংশের নৈতিকতার তপ্ত রক্ত নিমেষে টগ্‌বগিয়ে উঠলো ফুটে।

শিশুরাজকে মিঠে কড়ায় সম্বোধন করে ঠাকুরদাস বল্লেন, "এযে, শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে! ব্যাপার কি?"

মতিলাল ততক্ষণে চাবুকটাকে ভেঙ্গে ফেলে দাঁতনের কাজে লাগিয়েছেন। বল্লেন,—"ওরা খেল্‌ছে গঙ্গার পাড়ে,—জলে না পড়ে যায়, দেখছি।"

"এই কি খেলার সময়?—আয় তোরা দেখি—আয় মণি, আয় শরৎ-দেবিন, দেখি পড়া তৈরি হয়েছে কিনা ....."

নবমী পূজোর কচি পাঁঠা, নাওয়ানর পর যেমন করে কাঁপে—ঠিক তেমনি করে কাঁপতে কাঁপতে চল্লেন মণি-শরৎ-দেবিন। বাকি লেজুড়ের দল চল্লো ভয়ে তটস্থ হয়ে—সঙ্গে সঙ্গে! কি-হয়, কি-হয়! ওদিকে চলেছে মনে মনে ঐংহ্রাং মন্ত্র নিঃশব্দ গতি-প্রমত্ততায়!

মণি-শরতের নিষ্কৃতি দেখে ছেলেদের বুক ফুলে উঠ্‌লো; কিন্তু দেবিনের সরস্বতী, হায় কপাল! সন্ধির হাড়িকাঠে বাধিয়ে দিলেন খোদ জগন্নাথকেই।

দেবিন সন্ধি বিচ্ছেদ করলেন: জগড়+নাথ=জগন্নাথ। বিহারীদের জগড়নাথ হয়তো বা আওয়াজের জোরে ঘসা পয়সাও যেমন করে চলেও যায়—যেতেও পারতেন চলে। কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের জগড়নাথকে ঠাকুরদাস একেবারে বাতিল করে—রায় দিলেন সুকঠোর!

দেবিনের পিঠের উপর চাবুক তো বারকয়েক সপাং সপাং করে নেচে গেলই; কিন্তু ব্যাপার যথা নিয়ম গুরুতরতেই গিয়ে দাঁড়াল। মুসাই চাকর দেবিনকে অন্ধকার কুঠরিতে নিক্ষেপ করে চাবিতালা বন্ধ করে কর্মান্তরে চলে গেল। দেবিন অন্ধকারে মহাঘোরে কাঁদতে কাঁদতে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

কর্তারা কাছারি বেরিয়ে গেলেন। দেবিনের না খাওয়া, কি স্কুল না যাওয়া—তখনকার কাজের হুড়োহুড়ির মধ্যে কেই বা লক্ষ্য করে!

কিন্তু মতিলাল মোটেই ভুলে যাবার মানুষ নন। জান্‌লায় টোকা মেরে জান্‌লা খুলিয়ে দিয়ে গেলেন এক ছড়া কলা, বল্লেন, "খেয়ে নিয়ে খোসা এইখানে রাখ—আমি ফেলে দেব। ওখেনে খোসা দেখলে তোকে মেরে খুন করে দেবে ঐ খাণ্ডাতের দল।"

সেদিন সন্ধ্যের কথাও পরিষ্কার মনে পড়চে! সাম্‌নের বাগানের সদ্য ফোটা লাল, হল্‌দে, বেগুনি রংএর কৃষ্ণকলির বিনা সূতোর মালা গেঁথে দেবিনকে আদর করে পরিয়ে দিয়ে—তার প্রসন্ন মুখের হাসি দেখে তবেই যেন মতিলাল একটু স্বস্তি বোধ করেছিলেন মনে মনে।

কোঁকড়ান বড় বড় চুল কপাল পর্যন্ত ঝোলা; চোখ দুটো উজ্জ্বল আর ডাগর; নাকটা বাঘের নাকের মত থ্যাব্‌ড়া আর মোটা। বিরল, কোঁক্‌ড়ান গোঁফ। ঠোঁঠ দুটো পুরু! বিধাতা তাতে সৌন্দর্য বিধানের কোন চেষ্টাই করেন নি। কিন্তু মতিলালের বুকের মধ্যের দরদের সমুদ্র থেকে প্রতিফলিত প্রসন্নতার আলোর ঝলক যে কি সুন্দর করে তুলতো সেই মুখখানিকে তা ছেলের দলই শুধু দেখেছে! তাই, মতিলালকে দেখতে পেলে ছেলেরা তাঁকে জড়িয়ে তাঁর কোলে পিঠে চড়ে—তাঁকে দিশেহারা করে দিত।

আজকাল মাণিক সরকার রোড উত্তরমুখো গঙ্গার কাছাকাছি এসে পূর্বদিকে গোঁৎ খেয়ে যেন আদামপুরে ইন্দ্রনাথদের বাড়ির দিকেই চলে গেছে! বর্ষাকালে সেদিন যেখেনে ছেলেদের বাণমাছ ধরার অতিশয় নিরিবিলি আড্ডা ছিল—আজ সেখেনে একটি জোড়া খিলেন পুল হয়েছে। ভাগলপুরের মিউনিসিপ্যাল কর্তারা আজ এই পথটি জারি করে দিয়েছেন যে কাদের স্মৃতি রক্ষার জন্যে তা তাঁরা হয়তো জানেন না। এটি ছিল সেদিনের শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের অভিসারের অতিশয় দুর্গম পথ। এপারে ছিল একটি তালের খুঁটি ওপারে তার জোড়াটি! তার উপর রাখা আছে একটা শক্তগোছ বাঁশ!—

দেখ্‌লে মনে হয় একটা জীর্ণ সাঁকোর ভাঙা অবশেষটা। শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথের গভীর অন্ধকার রাতের এইটি ছিল গতা-গতির রাজপথ!

শ্রীকান্তের পাঠকমাত্র শুনেছেন গভীর রাতের মন মাতানো বাঁশীর ধ্বনি! ইন্দ্রনাথ যে-বাগানের গাঢ় অন্ধকারে বসে বাঁশী বাজিয়ে ডাকত শ্রীকান্তকে, তার নাম ছিল সেদিন 'রামবাবুর বাগান'। এই বাগানটি আজও শ্রীহীন অবস্থায় টিঁকে আছে। একটু বিশেষ নজর করে দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয় ওর সৃষ্টিকর্তার সৌখিন পরিকল্পনাটি উপলব্ধি করে। রামবাবুর শ্বশুর শিবচন্দ্র খাঁ মশাই—বাংলা দেশ ছেড়ে গিয়ে—ধূলো-বালি এবং কাঠ খোট্টা রুক্ষতার বুকে সুজলাং সুফলাং মাতরম্‌কে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সংকীর্ণ পরিসর এই বাগানটির মধ্যেই! মাঝখানে বেহারে সুদুর্লভ পুকুর—আর্শির মত ঝক্ ঝক করছে। পাড়ে ছোট বড় তালগাছ আছে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে—কোনটা বা সোজা হয়ে—কোনটা বা হেলে পড়েছে। পশ্চিমে চাতাল; তাতে বসে আরাম করার জন্যে পাকা-গাঁথা বেঞ্চি—হেলান দেওয়ার বিস্তৃত পিঠ সমেত। বড় বড় রানার উপর বসে মাছ ধরা যায়!—আর, সিঁড়িগুলি ছোট ধাপে—শেষ পর্যন্ত নেবে গেছে পাতালপুরীর নি-খোঁজ রাজকন্যারই অনুসন্ধানে! সবুজ জলের মধ্যে দিয়ে আন্‌চোখে দেখতে পাওয়া যায় দুপুরে, তালগাছের মাথার উপর দিয়ে রোদ এসে পড়লে জলের বুকে ঐ পাতালপুরীর আবছা পথটা।

আম, জাম, নারিকেল, লিচু, জামরুল—কি যে নেই সেখেনে তা জানে না কেউ! পীচের বেঁটে গাছের ডাল চলে গেছে কোথা দিয়ে কোথায়,—তাতে ফলে আছে গোলাপীগাল পীচ তরুণী। আবার দূরে—নীলপাতা তমালের ডালে বসে সারাদিন ডাকেছ কূ-উ, কূ-উ করে কোকিল!

এই বাগানটি ছিল শিশুদের কল্পনার নন্দন-কানন আর শিশু-রাজের লীলাভূমি! কর্তারা আপিস বার হয়ে গেলে—চালের বাতা থেকে বার হ'ত হরেক রকমের ছিপ—সরু, মোটা, লম্বা, বেঁটে। মাছ ধরার উদ্যোগপর্ব কেঁচো খোঁড়া থেকে সুরু করে—বোলতার ডিম, ফুল ময়দা ঘি দিয়ে মাখা—আর ট্যাংরা মাছের টোপ;—মতিলালের পাশে এসে রাশি রাশি হয়ে জমে৺

উঠ্ছে। ঝাৎনায় টোকর লাগ্তেই জলের উপর বেঁকা টানের সঙ্গে একটি ছিক্ করে শ্যামা পাখীর শিষের মতই শব্দ!—আর, তার পর পুঁটি মাছের রজত কান্তি ছট্ ফট্—ছট্-ফট্।

পণ্ডিতেরা এ সবকে কাব্যের পংক্তিতে স্থান দেবেন কি না জানিনে। কিন্তু মূর্খের দলের পরম প্রতীতি যে, এই ছিল শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-প্রেরণার আদি উৎসের জন্মভূমি!

পাঁচ

কাজ করার চেয়ে জীবনে স্বপ্নই দেখতেন বেশি মতিলাল। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই স্বপ্ন-বিলাসী হ'লে সংসার চলা দায় হয়ে উঠে। সৌভাগ্য যে, এক্ষেত্রে তা হয়নি। ভুবনমোহিনী নিজের ছোট্ট দু'টি হাত দিয়ে সংসারের গতিকে চমৎকার নিয়ন্ত্রিত করতে জানতেন। তাঁর কর্মকুশলতার নিঃশব্দ ত্যাগের পুণ্য ছায়ায় দৈন্য যেন নিজের দাবী ভুলে যেত; সহজ সন্তোষ যেন রিক্ততার খাদ আপনি ভরিয়ে তুলতো! সাধারণ মেয়েদের মত ভুবনমোহিনীর দাবি-দাওয়া যদি মতিলালের কণ্ঠ চেপে ধরতো—তা হ'লে কল্পনার পক্ষীরাজটি তাঁর, আকাশে ডানা বিস্তার করার কোন অবকাশ, কি অবসর পেত না।

ভুবনমোহিনীর রূপ ছিল না। তাকে লুকোবার তিলমাত্র প্রয়াসও তাঁর ছিল না। সে অভাবের জন্যে মনে ক্ষোভও বাসা বাঁধতে পায়নি কোন দিন। তাঁর রূপ-হীনতাকে "বিনাদোষে বিধাতার অভিশাপ" মনে করে নিজেও অশান্ত হতেন না। আর সংসারকেও অশান্তির আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তোলেন নি। কোনদিন না ছিল তাঁর শখ, না ছিল তাঁর সৌখিনতা; একখানা ভালো কাপড়ের দরকার নেই! গয়না-গাঁটির জন্যে মান-অভিমান, কান্না-কাটি

করেননি কোনদিন! যেন বৈদূর্য মণিটি! অন্তরের রূপে তিনি ছিলেন রূপসী! নিজেকে নিঃশেষ দিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর ধর্ম! সংসারের সেবা ধর্মে এমন করে আত্মোৎসর্গ করে দেওয়া,—একদিন বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে একান্ত সহজই ছিল। সকাল থেকে বিকেল, বিকেল থেকে নিশুতি রাত্তির অবধি—কে খেতে পায়নি তাকে খাওয়ান; কোন ছেলে দাওয়ায় পড়ে কখন গেছে ঘুমিয়ে, তার মার বুঝি আবার রান্নার পালা, হাত খালি নেই—ভুবনমোহিনী তাকে বুকে করে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে শুইয়ে দিয়ে ছুটলেন বাইরে, কেদারনাথ ডেকে পাঠিয়েছেন। এখুনি মাণিক চাকর বলে গেল: সন্ধ্যার গাড়িতে শিউড়ী থেকে এসেছেন বেদান্ত-বাগীশ মশাই। তিনি রাতে হবিষ্যি করবেন না, লুচি খাবেন। আবার ওদিকে অমরনাথের আপিস থেকে ফেরার সময়ও হয়ে আসচে। তিনি তাঁর বাইরের ঘরেই জলখাবার খান। সেখেনে ঠাঁই করা, খাবার নিয়ে যাওয়া। একটু নিশ্বেস ফেলার সময় নেই! সবাই ডাকে, সবাই বলে, "ভুবোন, ও ভুবোন! কোথায় গেলি মা!"

ভুবন কোন ফাঁকে ছোট গিন্নীর ঘরে ঢুকে তাঁর কোলের এঁড়ে ছেলেটি—বায়না ধরেছে মার দুধ না পেয়ে—টেনে নিয়ে—বুকের মধ্যে সারাদিনের টন্‌টনানি—নিজের হারিয়ে যাওয়া মাণিকের সঞ্চিত অমৃতের খানিকটা নিঃশেষ করে দিয়ে—শান্ত করেছেন—চোখের জলে আঁচল ভেজাতে ভেজাতে!

রূপে নয়! ভুবনের গুণেই ছিল সংসারটি মুগ্ধ!

মতিলাল যেন আকাশের ঘুড়িখানি! নিজের খেয়ালে, ওড়ে, লাট খায়, গোঁৎ মেরে মাটি ছুঁতে ছুঁতে আবার গিয়ে ওঠে আকাশের নীলে! সেবা-ধর্মের লাটাই এ ভালোবাসার রঙীন্ সুতোয়—ভুবনমোহিনীর দু'খানি স্নেহ-প্রচুর হাতে ছিল ঐ খেয়ালি মানুষটির—গতি আর অবগতির নিয়ন্ত্রণের গোপন সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি!

সংসার-কারখানার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ভুবনমোহিনী ছিলেন নিরন্তর ভ্রাম্যমান চরকির মতোই—সমস্ত সংসারটিকে আপন গতর দিয়ে গুটিয়ে তোলাই ছিল

তাঁর দৈনন্দিনের কাজ! শরৎ সাহিত্যে এমন এক আধটি মানুষের সঙ্গে কি আমাদের দেখা হয় না?

বিদ্বান লোকদের বলতে শুনেছি যে শরৎ সাহিত্যের নারী চরিত্রগুলি মোটামুটি মহাভারতের সাবিত্রী চরিত্রের আদর্শে রচিত। সাবিত্রীর তেজস্বিতা এবং সেবাপরায়ণতা! হবেও বা তাই! কথায় বলে, যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে।

সন্দেহ হয় মনে মনে। শরৎচন্দ্রের প্রতিভা তো "মেঘের মতন আপনার মাঝে ঘনায়ে আপন ছায়া, একা বসি কোণে জানিত রচিতে ঘন গম্ভীর মায়া!" তাঁর সৃষ্টির উপকরণ প্রত্যক্ষ, বাস্তব থেকেই তো নেওয়া। শরৎ সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে তো চিনি চিনি করি, আবার চিন্‌তেও পারি হয়তো! সত্যিই কি শরৎচন্দ্রকে মানুষ ঢুঁড়তে মহাভারতের মহারণ্যে যেতে হয়েছিল? তিনি বাস্তবকে চিরন্তনের রঙ দিয়ে সাহিত্য এবং সম্পূর্ণ করে তুল্‌তেন। প্রিয় পরিজনদের ভালোবাসার ঋণ এম্‌নি করেই পরিশোধ করার অভ্যাস তাঁর ছিল।

শুনেছি, হিম সমুদ্রে যে বরফের পাহাড় ভাসে তার দেখ্‌তে পাওয়ার অংশের চেয়ে জলে ডোবা অংশটা ঢের বড়। ভুবনমোহিনীর বাইরের চটক্ ছিল না; কিন্তু অন্তরের প্রভাব ছিল সুবিস্তৃত। মৃত্যু রয়েছে শিয়রে দাঁড়িয়ে— অমরনাথ বল্লেন, "একবার ভুবনকে যে দেখ্‌ব!"

কেদারনাথের মৃত্যুর পর ভুবনমোহিনী দেবানন্দপুরে বড় দুঃখেই পড়েছিলেন। বাড়ি-ঘর সব দেনার দায়ে নিলেমে উঠেছে! ভাগলপুরে না এলেই নয়। সেই আসাও হল। ভুবনমোহিনীর অনুরোধকে অপূর্ণ রাখা? অসম্ভব। ভুবনের ছোটকাকা ভাগলপুরে আসার ব্যবস্থা করলেন।

যতদিন ভুবনমোহিনী বেঁচে ছিলেন ততদিন মতিলাল নিরাশ্রয় হননি। তাঁর মৃত্যুর পরই মতিলাল ছেলেপুলের হাত ধরে গাঙ্গুলি বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিনও কিন্তু গাঙ্গুলি বাড়িতে স্থানাভাব হয়নি।

মতিলালের পক্ষে সেখেনে আর যে কিছুতেই থাকা যায় না! ভুবনমোহিনীর অভাব তাঁকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। মতিলালের জীবনে সকল সরসতার আদিভূত কারণ ছিলেন তিনি। তারপর, কতদিন দেখা গেছে [illegible] পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ছেঁড়া চটীর উৎক্ষিপ্ত ধুলোয় কোমর পর্যন্ত ধূসর। মাথায় চুলগুলোয় জটা বাঁধতে সুরু করেছে। পেটে নেই ভাত; হাতে নেই পয়সা! হাত পা নেড়ে বিড় বিড় করে কার সঙ্গে কথা কয়ে কয়লা ঘাটের পথে অশ্বত্থতলায় পাগলের মতই ঘুরে বেড়াচ্চেন।

প্রচণ্ড শীতে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে মতিলাল এলেন একদিন দেখা করতে অঘোরনাথের সঙ্গে—মৃত্যুর দিন কয়েক আগে।

"তুমি এবাড়ি থেকে চলে গেলে কেন হে, মতিলাল?"

"ভাল লাগ্‌লো না, ছোট কাকা!"

"এত শীতে গায়ে কাপড় দাও নি, কেন?"

"নেই যে!"

"শরৎ কোথায়?"

"ঝগড়া করে কোথায় নিরুদ্দেশ!"

"আজকাল কিছু কাজকর্ম আছে?"

"না।"

"কি করে চলে?"

মতিলাল কোন কথার উত্তর দিলেন না, চোখ দুটি ড্যাব্ ড্যাব্ করে উঠ্‌লো। উঠে দাঁড়ালেন, চলে যাবার জন্যে, পাছে চোখের জল ধরা পড়ে যায়। গায়ের কাপড় মতিলালের গায়ে পরিয়ে দিয়ে, অঘোরনাথ তাঁর হাতে একখানা নোট গুঁজে দিলেন। মতিলাল একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "ক'দিন আছেন, ছোট কাকা?"

"কালই যাব।"

মতিলাল পায়ের ধুলো নিয়ে বল্লেন, "আর দেখা হয়তো হবে না ছোট কাকা—বয়স হচ্চে তো আমাদের!"

সত্যিই আর দেখা হয়নি দুজনের।

সরকারি চাক্‌রি থেকে অবসর নিলেন কেদারনাথ; তারপর দীননাথ এবং অমরনাথের মৃত্যু; সংসার এদিকে বাড়তেই লাগল; বিয়ে, পৈতে, ভাত অনুষ্ঠানগুলিকে বংশের নামডাকের অনুরূপ করতে গিয়ে ধীরে ধীরে কেদারনাথ ঋণজালে জড়িত হয়ে পড়তে লাগলেন। তখন কাট ছাঁটের প্রয়োজন হ'ল। ভাগ্যক্রমে মতিলালেরও শোণের ওপর ডিহিরিতে একটি চাক্‌রি হ'ল। সেখেনে তিনি সপরিবারে চলে গেলেন। শরতের তখন মাত্র সাত আট বছর বয়স।

গৃহদাহে ডিহিরির বাল্য স্মৃতিকে শরৎ অমর করে গেছেন।

কিন্তু এ চাক্‌রি দীর্ঘদীন স্থায়ী হয়নি এবং ১৮৮৬ সালে তাঁদের আবার ভাগলপুরে ফিরতে হল। দেবদাসে গ্রামের পাঠশালার যে সব বর্ণনা আছে তা এই সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ।

শরতের বিদ্যা এই সময়ে বোধোদয় থেকে চারুপাঠের পথ ধরেছে মাত্র। কিন্তু বাংলা শেখার এতই বা কি দরকার? তাই দশ বছরের ছেলেকে ছাত্রবৃত্তি ক্লাশে ভর্তি করে দিতে কারুর মনে এতটুকু ইতস্ততঃ এল না! ইতিহাস, ভূগোল, ভূবৃত্তান্ত তবুও পড়ে বোঝা যায়, কিন্তু চক্রবৃদ্ধির চক্র মাথার ওপর ঘোরাবার মানুষটিই হ'ল সবচেয়ে বড় ভয়ের মণি-শরতের কাছে। পরীক্ষা পাশ হওয়ার একমাত্র ভরসা রাণী ভিক্‌টোরিয়ার জুবিলি সে বছর পড়েছিল।

মামা ভাগ্নেকে তালিম দেওয়ার জন্যে নিযুক্ত হলেন অক্ষয় পণ্ডিত মশাই! তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রণাম নিবেদন করে বলতেই হচ্চে যে পণ্ডিতমশাইটি ছিলেন যমরাজের দোসর কল্প। চোখ দুটি বৃত্তাকার, আলু-চেরা। মুখে এক মুখ দাড়ি গোঁফ। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। এবং মেঘ গর্জনের মত কণ্ঠস্বর। জলদ গাম্ভীর্যের বদলে, বাঁশ ফাড়ার কর্কশতা। পণ্ডিমশাই নিজের বিদ্যা বুদ্ধির ওপর খুব বড় রকমের আস্থা রাখ্‌তেন

না। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল নিজের বাহুবলের ওপর। আর শিশু-সূদন বিদ্যায়।

সেকালের ছাত্রবৃত্তিতে নাকি বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধির কদর বেশি ছিল। প্রশ্নগুলি ছাত্রের বিদ্যা যাচাইএর মত করে দেওয়া হত না। পরীক্ষার্থীকে পরাস্ত করাই ছিল যেন তাদের গূঢ় উদ্দেশ্য। যখন কোন ব্যাপার ভোজ-বিদ্যার অন্তর্গত হওয়ার মত হয়, তখন সাধারণ মানুষ আর তা নিয়ে মাথা বকাতে চায় না। বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। পণ্ডিত-মশাইএর হাতযশ ছিল। তিনি ছেলেদের বুদ্ধির ফলায় ধার তোলার ওস্তাদ ছিলেন। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করতেন অবাধ এবং দুর্বিষহ ধনঞ্জয়ের সাহায্যে! তাঁর "রাম চিমটির" ভয়ে ছাত্র সম্প্রদায় কম্পমান হ'ত। পাঁজরার উপরের চামড়া খামচে ধরে তিনি ছাত্র বেচারিকে মাথার উপর তুলে দেখিয়ে দিতেন যে পর-পারের পথ বড় বেশি দূরে নয়। সে দেখার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা বলে যে পর-পারের পথের দুধারের মাঠে সরষে ফুল ফুটে থাকে আর তার উপর কালো ভোমরা ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে!

চিক-ঘেরা বারান্দার কুটুরির মধ্যে মামা-ভাগ্নের অগ্নি পরীক্ষা চল্‌তো। বাইরে সঙ্গীর দল উৎকর্ণ হয়ে থাকতো। মধ্যে মধ্যে সিংহ গর্জনের সঙ্গে করুণ কান্নার আওয়াজও যে শুন্‌তে পাওয়া যেতোনা, তা নয়!

সে যাই হোক—পণ্ডিতমশাইএর হাতযশে দুজনেই উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন।

তার পরও শরৎ বছর দুই ভাগলপুরে পড়েন। তারপর দেবানন্দপুরে গিয়েছিলেন পড়াশোনা করতে। এইখেনে শরৎচন্দ্রের বয়সের একটি ছোট খাট মোটামুটি হিসেব দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে বলে মনে হয়:

		অবস্থানের কাল	
শিশু এবং বাল্য-কাল	দেবানন্দপুর	২।৩	বছর
	ভাগলপুর	৯	ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা
		১১-১২	১৮৮৭

		অবস্থানের কাল	
কৈশোর	দেবানন্দপুর	৩	বছর
এবং	ডিহিরি		
	ভাগলপুর	১০	"
যৌবন	মজঃফরপুর		
	কলকাতা	২	"
		১৫	

শরৎচন্দ্র ২৭ বছর বয়সে রেঙ্গুনে যান

শেষ	রেঙ্গুন	১০	"
	শিবপুর	১০	"
বয়স	সামতাবেড়	৮	"
	কলকাতা	৭	"
		৩৫	

১২+১৫+৩৫=৬২ বৎসর বয়সে মৃত্যু।

দেবানন্দপুর	একুনে	৫।৬	বছর
ভাগলপুর	"	১৮।১৯	"
মজঃফরপুর-কলকাতা	"	২	"
রেঙ্গুন	"	১০	"
শিবপুর	"	১০	"
সামতাবেড়	"	৮	"
কলকাতা	"	৭	"
	মোট	৬২	"

উপরের হিসাব থেকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, জন্মের পর থেকে আর রেঙ্গুন যাওয়ার আগে পর্যন্ত—মোট সাতাশ বছরের মধ্যে শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে থাকেন পাঁচ-ছ বছর। ভাগলপুরে উনিশ কুড়ি বছর। ভাগলপুরেই শরৎচন্দ্রের লেখাপড়া আরম্ভ হয়। বিদ্যাসাগর মশাইএর 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ' থেকে, হাতের দেখে-লেখার একখানি খাতা তাঁর এখনও আছে। অঘোরনাথ নিজে না গাইতে পারলেও তাঁর গানের শখ ছিল এবং তাঁর গানের সংগ্রহের

াতাও আজ পর্যন্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেই খাতাখানির পাতায়
রৎচন্দ্র লেখা মক্‌স করেছেন।

এখন কথা হচ্ছে, পৃথিবীর এত জায়গা থাকৃতে শরৎচন্দ্র ছোট কর্তার সেই
ানের খাতাতেই হাত মক্‌স করলেন কেন? সেই গানের খাতাটির সেকালের
িসেবে কাগজটি উৎকৃষ্ট ছিল; এবং শরৎচন্দ্রের লেখার কাগজ সম্বন্ধে খুব
কটা বড় ধরণের বাবুয়ানি ছিল। এটি শরৎচন্দ্র পেয়েছিলেন মতিলালের
াছ থেকেই। মতিলালের হাতের লেখা ছিল যেমন সুন্দর তেমনি তাঁর
লখার সাজসরঞ্জাম, আস্‌বাবপত্র ছিল চমৎকার। ছোট ছেলেপুলের মন
লাভে কম্পমান হ'ত, সে সব দেখে।

এই লেখাটি অনুমান, শরতের পাঁচ বছর বয়সের। সেই সময় ছোট
িন্নীর ঘরখানি, এবাড়ির শিশু-বিদ্যালয়ের মতই ছিল। তিনি নিজে অবসর
ময়ে পড়াশুনো করতেন এবং দুপুরে বাড়ির ছেলেমেয়েদের তাঁর ঘরে গাঁদি
াগত। মণি-শরতের পড়া শুনোর আদি পর্ব কুসুমকামিনীর কাছেই
ুরু হয়। পড়া শুধু "বর্ণ-পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ বোধোদয়ে" শেষ হয়নি।
তিনি তার পরেও, পলাসীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্রও পড়াতেন এবং বুঝিয়ে
দিতেন। ইস্কুলের পড়াশুনো শেষ হ'লে রাতে কুসুকামিনীর ঘরে প্রদীপের
তলায় যে একটি সাহিত্য সভার বৈঠক বসতো তারই একজন, ভবিষ্যৎ বাংলা
াহিত্যের আকাশে জ্যোতিষ্ক হয়ে উঠ্‌বে তা কেউ আন্দাজ কি অনুমান
করতেও পারেনি সেদিন।

১৮৮৯ সালে শরৎ এই সভার সভ্য ছিলেন এবং ১৮৯৪-৯৫ সালেও এই
রে প্রদীপের তলায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস কুসুমকামিনী ছেলেদের পড়ে
শানাতেন—আর, তাঁর চারিদিকে বি-এ, এম-এ পাশ করা ছেলেরা ঘিরে
সে শুন্‌তো সেই অপূর্ব পাঠ। বাড়ির ছেলেদের মাইকেলের "মেঘনাদ বধ"
কি "বীরাঙ্গনা" "ব্রজাঙ্গনা" এই খেনেই পড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই
সভাতে ছেলেরা দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" শুনে শুনেই শেষ করেছিল।

ভালো বীজ থেকে ভালো চারা তুলতে হ'লে—সরস ভূমি আর অশেষ লালনের দরকার হয়ে থাকে। শরৎচন্দ্রের প্রতিভা—কুসুমকামিনীর স্নেহাদরের ভূমিতে বেড়ে ওঠার হয়তো কিছু সুযোগ এবং সুবিধে পেয়েছিল।

ছয়

পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের আগেকার কথা।

দূরত্বের আবছায়ার মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্রকে মনে করতে গেলে মনে পড়ে সবচেয়ে আগে, তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটি!—তাদের মধ্যে যেন দুটি বিরোধী ভাব ধর্মের অচিন্তিত কোলাকুলির নিবিড়তায় পরস্পরকে মেনে নেওয়া! বাস্তবের স্পষ্ট স্বচ্ছ অভ্রান্ততার সঙ্গে আদর্শের কল্পনা স্বপ্নের ধ্যান-স্তিমিত অন্তর নিগূঢ়তার সে এক অপূর্ব-মিলন!

সেই সে দিনের শিশির বিন্দুটি, কালের অপরিমেয় মহিমায় হয়ে দাঁড়াল অথৈ, অগাধ বিরাট্ সিন্ধু! জীবনের অদ্ভুত রস অবস্থার পুট-পাকে সাহিত্যের অনন্যসাধারণ প্রকাশ-পথ দিয়ে যে প্রতিভার আলো রেখে গেল মানুষের জ্ঞানের সঞ্চয়ে, তা' হেলায় হারিয়ে যেতে দিতে, কোন কালে, কোন মানুষই রাজি হবে না।

সেই অভিব্যক্তির ছিল এক অদ্ভুত বাণী যাকে কিছুতেই না শুনে থাক্তে পারা যায় না। একবার কানে এলে মর্মে পশে' প্রাণ আকুল করে দেয় সে যে কেমন, তা' সেদিন দেখেছিলাম গ্লোব নার্শরি দেখতে গিয়ে!

গ্লোবের কর্তা অমর বাবুর সঙ্গে শরতের চাক্ষুষ জানা-শোনা ছিল না কিন্তু সেই জানা-শোনার প্রয়োজন হয়েছে, কি না হয়েছে, শরতের আর কিছুতেই এক তিল দেরি সয় না, "চল, চল, আজই যাওয়া যাক…"

দেহ দিন দিন জীর্ণ হয়ে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে—তাই জীবনের সব কিছু সেরে নেবার কি তাড়া!

মৃত্যুর মাস খানেকের আগেকার কথা বলছি। দু'জনের মনে মনে

জানাজানি হ'য়ে গেছে : শরৎও জানেন : সময় হয়েছে নিকট। আমার মনের সব আশা নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। শুধু শরৎকে ভুলিয়ে রাখাই সব কাজের বড় কাজ আমার।

এত তাড়াতাড়ি কি শরৎ? আজ তোমার গাড়িখানা মেরামত হচ্ছে, কাল গেলেই হবে।"

মনের মত কথা না হ'লে, শরৎ সেখান থেকে উঠে যেতেন। বাইরে গিয়ে ডাকলেন, "কালী, ও কালী······আমার গাড়ি আজই চাই।"

"আজকে তো হবেনা, বাবু! অনেক কিছু কিনে আন্‌তে হবে যে।"

"তা হোক্‌গে—টাকা নিয়ে যাও। আর একখানা গাড়ি ঠিক করে নিয়ে এসোগে—মামা আর আমি যাবো বেড়াতে।"

কালী গজ্ গজ্ করে ঘরে ঢুকে গেল।

শরৎ ফিরে এসে, বসে বললেন, "সবাই হিতৈষী আমার!—টাকা আমার কি হবে? ভূতে খাবে বৈ তো নয়!"

গাড়ি এলো।

"আঃ কালী! একি একটা হাল্কা গাড়ি নিয়ে এলে? তোমার কি বুদ্ধি! যাবো আমি রোগা মানুষ, বিশ-ত্রিশ মাইল, ঝাঁকানিতেই তো প্রাণ বেরিয়ে যাবে!"

ঘোষের হ্যারিসন রোডের দোকানে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল শুধু খবর নিতে যে অমরবাবু বাগানে গেছেন কি না।

দোকানের লোকেরা জানেনা। দু'-একখানা বই, আর কিছু বীজ খরিদ করে আমরা অমরবাবুর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে ঠিক করে জান্‌তে পারলাম যে অমরবাবু বাগানেই গেছেন এবং সন্ধ্যের আগে ফিরচেন না। গাড়ি সেই উদ্দেশে চল্‌লো।

নিমেষে শরতের মুখের আর মনের সব মেঘ যেন কেটে পরিষ্কার হয়ে গেল! দৃষ্টিতে তাঁর শরতের চাঁদেরই মতো প্রফুল্লতা দেখে মনে মনে খুশী হলাম। আমার কাছে সরে এসে বললেন, "তোমার কাছে অনেকদিন আমার ভেলির করেছি।"

হেসে বললাম, "কবে কি বলেছ, সব কি আমার মনে আছে ?"

"জানো, ভেলির নাম কি ছিল গোড়ায় ?"

"মনে নেই ;—ভারি একটা দরকারি কথা যেন !"

"কালীবরণ ! একে আটআনা দিয়ে বৌ কেনে, এতটুকুটি ! তারপ আমাদের আদরে যত্নে…"

"একেবারে আস্ত ধাড়ীটি হল !"

"আহা তুমি জানো না, ভেলি আমাদের কি ছিল"—শরতের গলা ভা হয়ে উঠলো ; অন্যদিকে ফিরে চুপ করে রইলেন।

বললাম, "হঠাৎ ভেলির প্রসঙ্গ, এই অকালে, অসময়ে যে ?"

"তাই বলছিলাম…"

"কি ?"

"ভেলিকে লালন-পালন করতে গিয়ে—আমার বুদ্ধি-বৃত্তি, চিত্ত-প্রবৃত্তি আ কর্ম-নিবৃত্তিগুলো যে কি রূপান্তর পেয়ে গেল—তা' বলে শেষ করতে পারিনে

হাস্‌লাম, বললাম, "একথা যা' বল্‌লে আমাকে, আর কাউকে বলে নিজে খেলো করো না। লোকে শুন্‌লে বলবে কি ? তোমার যা কিছু সব ঐ ভেলি দৌলতে ? আচ্ছা শরৎ, তোমার 'কাণার' কথা মনে পড়ে ?"

"মনে নেই ?"

"তার জন্যে যে ইংরিজিতে পত্র লিখেছিলে ?"

"লজ্জা দিও না।"

"তুমি কি বলতে চাও যে, ভেলি তোমার সব, কাণা কেউ নয়…"

"না, না, তা' বলছিনে। ভেলি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের জীবনে এমন ক জড়িয়ে গিয়েছে…"

"সে আমি তো জানি ; তাই তো সাহিত্য সম্রাটের 'যুবরাজ' না দিয়েছিলাম ওর।"

"বড় অন্যায় বলনি, ও আমাদের রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল, ও আগে পরে অনেক কেউ এলো গেল। কিন্তু ও যেন মাথের মাণিকটি !"

"তারপর ?"

"বলছিলাম তাই যে মানুষের সব চেয়ে বড় শিক্ষা-দীক্ষা জীবজন্তু থেকেই হয়। এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই……সেদিন তুমি ছাতের উপর কুঞ্জবন তৈরির কথা বলেছিলে, তখন মনে হচ্ছিল যে একটা বাজে কথা বলছ। কিন্তু আজ চলেছি গ্রোবে—যদি বেঁচে থাকি নিশ্চয়ই একটা কুঞ্জবন করব তেতলায়।"

মুখ ফিরিয়ে চুপ করে চোখের জল সম্বরণ করতে লাগলাম। হায় আসছে বছর! হায় কুঞ্জবন!

গেটে পৌঁছে শোনা গেল কর্তা বাগানের কাজকর্ম দেখে বেড়াচ্ছেন. অতএব তাকে ধরতে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ গিয়ে কোথাও দেখা হয়ে যেতে পারে।

ওদের আপিসের টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজ লিখে রেখে যে, শরৎ এসেছেন বাগান দেখতে—আমরা বেরিয়ে পড়লাম। শীতের বেলা, রোদ হলদে হ'তে সুরু করে দিয়েছে।

মাইলটাক হেঁটে শরৎকে বললাম, "তুমি কোথাও ব'সো, আমি তড়াতাড়ি গিয়ে দেখি কোথায় তাঁকে পাওয়া যায়।"

"নাঃ, কি হবে তার দেখা পেয়ে? ততক্ষণ এস দেখি—গোলাপের বাগানে…"

গোলাপের সবে দু-একটি ফুল ফুটতে সুরু হয়েছে। আশ্বিন কার্তিকেও ঝড় বৃষ্টি হওয়ার জন্যে সব ফুলই পিছিয়ে গেছে।

শরৎ বললেন, "মনে পড়ে সে বছর আমাদের সামতার বাড়িতে কি রকম গোলাপ হয়েছিল?"

"পড়ে!"

"দেখো, ছেলেবেলা থেকে ফুল আমাদের যে আনন্দ দিয়েছে, সবাইকে ত দেয়না দেখেছি!"

"কি রকম?"

"যারা নিজেদের কবি বলে পরিচয় দিতে চায়, তেমন অনেক লোককে দেখেছি, বাস্তব ফুল তাদের মনে কোন রকমের একটা অনুভূতির সাড়া পর্যন্ত তোলে না। তারা কল্পনার কবি, বাস্তবের নয়। আমার সামতার বাগানে

নিয়ে গিয়ে আমি দুঃখই পেতাম; পেতাম তাদের সত্যিকার সৌন্দর্যের উপ এতখানি উদাসীনতা দেখে! তাদের দেখার সে চোখ নেই: আনন্দ উপভো করার মন নেই।"

"কেন এমন হয়?"

"খুব সোজা কথা, ওদের ওই বৃত্তিগুলোর উন্মেষ হওয়ার কোন সুবিধে ি সুযোগ হয়নি।"

"আমাদের কি করে হ'ল, যদি ধরা যায় হয়েছে?"

"ছোট বয়স থেকে আমরা যে চর্চা করেছি! তোমার মনে নেই আমাদে বাগান-খেলা? আমাদের ফড়িং পোষা, পোকা পোষা, গাং-শালিখ পোষা বেজি, সাপ, কোকিল?"

"মনে আছে বৈকি!"

"আমি এর আনন্দটা যেন ভুলে বসেছিলাম: কিন্তু এবারে হঠাৎ কেম করে জেগে উঠ্‌লো সে সব। যদি ভালো হয়ে উঠিতো দেখবে এর একট ইস্কুল করবো—আসল শিক্ষা তো এইখেনে। সত্যিকার মানুষের মনুষ্যত্বে উৎসটাকে বাদ দিয়ে আমাদের দেশের শিক্ষা!"

একজন খাটো গোছের মানুষ—খদ্দর-পরা,—এসে শরৎকে প্রণাম কে বললেন, "আজ আমাদের বাগান ধন্য হ'ল।"

"তুমি কে?"

"আমি অমর···"

"তোমাকেই তো খুঁজছিলাম···"

"কি হুকুম?"

"সে অনেক আছে,—আমার সিজন্ ফ্লাওয়ারের চারা চাই—ভারি শ হয়েছে এ বছর—"

"চলুন,—কত দিতে হবে বলে দিন—"

"আগে এখানকার কথা বলি,—আমাকে তোমার বাগানের সব চেয়ে ভা যা বেষ্ট, দু'টা গোলাপ গাছ দেবে তো?"

"নিশ্চয়।"

"কবে দেবে ?"

"২৩শে ২৪শে ডিসেম্বর, আপনি আস্‌বেন পায়ের ধূলো দিতে—সেদিন নিশ্চয়ই পাবেন।"

"আর একটা গাছ দিও আমাকে, অমর—"

"কি বলুন ?"

"বাতাবি লেবুর গাছ।"

"আপনি বুঝি বাতাবি লেবু খেতে খুব ভালোবাসেন ?"

"রামোঃ, মানুষে খায় !"

"তবে ?"

"ওর ফুল যখন ফোটে—গন্ধে পাড়া মাৎ হয়, অমর—তুমি একটা আমাকে দাও, বুঝেচ কিনা ?—আমি দেশে নিয়ে গিয়ে পুঁতবো।"

"একটা নয় দাদা, দুটো চারটে—যত চাইবেন দেব। আমার অনেক গাছ তৈরি আছে।"

সমস্ত বাগান দেখে—ফিরে আসতে রাত হয়ে গেল। শরৎ গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, অমর বাধা দিয়ে বললেন, "একটু চা কি হবে না ?"

"চা আমি ছেড়ে দিয়েছি অমর—আচ্ছা চল, মামাকে দাও—"

"আপনাকে সব মৌসুমি ফুলের চারা দিচ্চি—সেগুলো তো লেবেল মেরে দিতে মিনিট দশ পনর দেরি হবে··· ···একটু বসবেন চলুন।"

"বেশ চল।"

লতা ঘেরা কুঞ্জের মধ্যে গিয়ে বসে শরৎ বললেন, "আজ সেই ছেলেবেলার আনন্দ পেলাম—কি চমৎকার যত্ন করতে জানে অমর—পায়রার ঘরগুলো কতো যত্নায় কতো বুদ্ধি দিয়ে তৈরি, সত্যি !"

অমর বললেন, "কিন্তু আর একদিন আপনাকে পায়ের ধূলো দিতে হবে।"

"আসবোই তো · ···তেইশে চব্বিশে, এসে গোলাপ গাছ নিয়ে যাবো।"

"সেদিন সকালে আমাকে একটা ফোন্ করে দেবেন।"

"বেশ।"

"আজকে দাদা, আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিন..."

"কি বলতো ?"

"আপনার পথের দাবীর সব্যসাচীটি কে ?"

"কে বললেই তুমি চিন্‌তে পারবে ?"

"আপনার আশীর্বাদে বোধ হয় পারবো।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর শরৎ বললেন, "প্রশ্নটি অতি কঠিন; বিশেষ বইখানি এখন যে অবস্থায় আছে—তাতে ওর সম্পর্কে কোন আলোচনা বো হয় দেশের কর্তারা পছন্দ করবেন না।"

"আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন আমি এ কথা আর কাউকে বলবো না।"

"আচ্ছা সেদিন দেখা যাবে"—বলে শরৎ উঠে পড়লেন। "এবার আমাদে ছেড়ে দাও অমর"—বলে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে বললেন, "কালী, শীগ্‌গি চল, ক্ষিদে পেয়ে গেছে হে···"

গাড়িতে অনেকক্ষণ দুজনের মনই যেন যে-সব ঘটল তাই নিয়ে রোমন্থন ক বড় সুখে কাটালো—অবশেষে শরৎ জিজ্ঞেস করলেন, "ঘুমুলে ?"

"না।"

"কি ভাবচো বলতো।"

"ভাবচি যে, সব্যসাচী কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয়। কবির সাহিত্যের সৃষ্টি।

"ঠিক তা নয়।"

"তবে ?"

"তুমি কি বলতে চাও যে ঘরে বাইরের নিখিলেশ আর সব্যসাচী এক ধরণের দুটো দৃষ্টি ?"

"না।"

"কিসে তফাৎ ?"

"নিখিলেশের মধ্যে কল্পনা আছে বারো আনা, আর সব্যসাচীর মধে হয়তো ছ' আনা।"

"বোধ হয় আরো কম।"

"কিন্তু সব্যসাচীর বাস্তবে কোন ব্যক্তিবিশেষ নেই। বহু ব্যক্তির বহু গুণের অদ্ভুত সমাবেশই কবির সৃষ্টির কৃতিত্ব! আমি সময় সময় সব্যসাচীর মধ্যে তোমাকেও পাই।"

"তা হ'লে জানবে, সেটা আমার অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"ওটা সেকালের মত।

"ওটাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মত। দেখো, শকুন্তলার মধ্যে কালিদাসকে খুঁজে বার করতে পারা যায় না।"

"তার মানে আছে।"

"কি?"

"উপন্যাস আর নাটকের টেক্‌নিক্ আলাদা।"

"যাগ্‌গে কূট তর্ক; আজ কিন্তু দিনটা ভারি চমৎকার কাটলো।"

"আরো চমৎকার কাটবে।"

"কিসে?"

"মাটি ঠিক করাই তো আছে—চারাগুলি আজই বসিয়ে দিতে হবে।" .

অনেক রাত পর্যন্ত পৌষমাসের ঠাণ্ডায় বাইরে বসে গোটা চারেক চাকর সঙ্গে করে চারা গাছ বসান হ'ল! কিন্তু এত লাগিয়েও অর্ধেকের বেশি চারা বেঁচে গেল। অতএব সকালে গোপালকে সামন্তার বাড়ি রওনা করে দিতেই হবে।

"গোপাল, পারবি তো ঠিক করে সব গাছ লাগাতে? দেখিস যেন একটিও নষ্ট না হয়, আমার বড় শখের, বড় আদরের জিনিস!"

শরতের বাল্য জীবন আরম্ভ করার আগে, শেষের দিনের এই একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করে দিলাম।

মনে হতে পারে, সময়ের এত বড় ওলট-পালট করার প্রয়োজন কি ছিল?

অতীত ইতিহাস বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হ'লে যেন প্রাণের আলোয় প্রদীপ্ত হয়ে উঠে!

শরৎচন্দ্রের অভিনিবেশ, পরীক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা, স্মরণ-শক্তি এবং দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে যাওয়ার ধৈর্য ছিল অনন্যসাধারণ। এই সব গুণ, সমগ্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তাঁকে জীবনে সাফল্যের পথে নিয়ে গিয়েছিল। এ কথা তিনি নিজে খুব ভাল করেই জান্‌তেন এবং তাই স্কুলকলেজের শিক্ষার ওপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধই ছিলেন।

এক দিনের কথা মনে পড়ে, তাঁর চরিত্রহীনের কথা হচ্ছিল। একজন শিক্ষিত যুবক বললেন, "কিরণময়ীকে পাগল করা আপনার ভুল হয়েছে।"

শরৎ অতিশয় শান্ত ভাবে উত্তর করলেন, "একখানা পাঁচশো পাতার বই লিখতে কত সময় আর ধৈর্যের দরকার হয়, ভেবে দেখো। তার মধ্যে আমি কিরণময়ীর সম্পর্কে সকল দিক আলোচনা করে লিখিনি, এ কথা মনে করলে গ্রন্থকারের ওপর কি অবিচার করা হয় না? ভেবে দেখো।"

সাত

শরৎচন্দ্রকে ইংরেজি ১৮৮৪-৮৯ এর মধ্যে যেমন পেয়েছি এবং দেখেছি তারই আভাস নীচে দেওয়া হ'ল।

তাঁর চেহারার দিক দিয়ে চোখ দুটি ছাড়া আর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। চামড়ার রং কালোর দিকেই; ফর্সা, কি শ্যামবর্ণ নয়। দেহটিও মোটা-সোটা গ্যাঁটা-গোটা নয়; বরং রোগা, পাকাটে। পা-দুখানা সরু হরিণের মতো, দৌড়তে মজবুত। হাত-পায়ের সাহায্যে গাছ চড়তে কাঠবিড়ালির মতোই ক্ষিপ্র।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জৌলুষ চারিদিক দিয়ে যেন উপচে পড়ছে! কিন্তু সে বুদ্ধি দুষ্টুমির পথেই চলে। তাকে এঁটে ওঠা শক্ত; এবং সে ব্যবস্থা যে-ই কেন করুক না, শরৎ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করে চুকেছেন—সে কথাও সঙ্গীদের বেশ ভালো করেই জানা ছিল।

সদর থেকে অন্দর মহলে যাবার গলির মুখে একটা দোর ছিল এবং তাতে যেতে হলে একটা পাকা সিঁড়িতে পা দিয়ে উঠতে হ'ত। সেকালে চটি কি স্যাণ্ডালের বদলে খড়মের চলনই বেশি ছিল! পাকা সিঁড়ির ওপর খড়মের শব্দ পাওয়া মাত্র শরতের অক্ষৌহিণী, বেড়ালের অতি সন্তর্পণ-বিক্ষিপ্ত চরণের নিঃশব্দ আগমনে ইঁদুরের মতো, কে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেতো!

শরতের রাষ্ট্র-বুদ্ধি এই "গলির দোর"টাকে সসৈন্যে অবস্থিতির অতিশয় উপযুক্ত স্থান বলে নির্দেশ করেছিল।

এই গলির দোরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি পেয়ারা গাছ—গোয়ালের চালের ওপর হেলে পড়ে তার শাখা প্রশাখায়—অনন্ত ফল-সম্ভারের ভারে ছেলেদের নিত্যই সুমধুর প্রীতি আহ্বান জানাতো।

শরতের দাদামশাই-এর চৌকশ বুদ্ধির ফলে আর মাণিক, মুশাই চাকরদের সহকারিতায়, পেয়ারাগুলি ছিন্ন-বাসে-মণ্ডিত হয়ে কর্তার দপ্তরে গোণা হয়ে থাকতো। রামধনের এই ব্যবস্থা মুনসি মালীকে নিরস্ত করলেও কেদারনাথের দৌহিত্রকে পরাভূত করতে পারে নি। পেয়ারাগুলি ছেলেদের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। গোয়ালের গোবর-চোণার সারে বোধ হয়, পেয়ারাও ফলতো গাছটায় বিপর্যয় পরিমাণে!

গোড়ায় ভাঙা-খাপড়ার স্তূপে কাঁটা নোটে, শিয়াল কাঁটা, ঘেঁটুর অগণ্য গাছের মধ্যে ছোট ছোট সাপের খোলসও দেখা যেত। এটিও বোধ করি শরতের আকর্ষণের অন্যতম কারণ।

শরতের সাপের ওপর আজীবন ভালোবাসা দেখেছি। সামতার বাড়িতে শীতের দুপুরে সামনের বাগানের ঘাসের উপর বড় বড় সাপ রোদ পোয়াতো। শরৎ পাহারা দিচ্চেন, ছেলেমেয়েদের মানা করছেন, "ওরে তোরা ওদিকে যাস্‌নে! আহা! ওরা একটু রোদ পোয়াচ্চে, তোরা গেলে যে পালিয়ে যাবে।"

সেই গোয়ালের পশ্চিম পাশে একটা ভাঁড়ার ঘর, তাতে যজ্ঞির সময়কার জিনিসপত্র বন্ধ থাকতো। বেড়াল, বেজি, ইঁদুর আর সাপের আড্ডা। মুশাইএর কোমর থেকে মাঝে মাঝে চাবি চুরি করে—এই ঘরটির "মুলেহাজা"

—অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ হ'তো। সেদিন ছেলেমেয়েদের বিস্ময় আর আনন্দের অবধি থাক্‌তো না!

তার পাশে তুঁতের গাছ। তুঁত শিশু সম্প্রদায়ের জিভে স্বর্গের সুধার আস্বাদ, আমেজ আর আনন্দের তুফান তুলতো! শরৎ আর তার মণি-মামা গোলা ঘরের অত্যন্ত ঢালু চালে বসে তুঁত সংগ্রহ করার আগ্রহে পা-হড়কে দু-চার খানা খাপড়া যে ঝরিয়ে ফেলতো না এমন নয়। আর সেই খাপড়া, উন্মুখ ছেলেদের মুখে মাথায় পড়ে তাদের মুখ রক্তাক্ত করে দিতো: কিন্তু তারও অতিশয় সহজ ব্যবস্থা ছিল। ঘাস চিবিয়ে ক্ষত-স্থানে দেওয়া এবং ক্ষত গভীর এবং গুরুতর হ'লে—তাতে শূন্যগর্ভ পেয়ারা-বাধা নেক্‌ড়া পুড়িয়ে গুঁজে দেওয়া। এ বিষয়ে ভাতুয়াই ছিল পরম বিশেষজ্ঞ! ফাগুয়ার বেটা ভাতুয়াকে আমরা দেখেছি এর আগেই।

এ কালে মেয়েদের, ছেলেদের মতো করে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার রেওয়াজ এসে গেছে এদেশে; কিন্তু যে দিনের কথা বলছি, সেদিন মেয়েদের সর্বক্ষণ শান্ত-শিষ্ট হয়ে শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশ্যে জীবন-প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখতে হ'ত!

কিন্তু শরতের খেলায় মেয়েদেরও একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল।

মেয়েদের উপর ফড়িং, পাখি, বেড়াল, বেজি, লাল-নীল মাছ পোষার ভার ছিল। তাদের সকালে ফুল তোলা আর শরৎকালে শিউলি ফুল কুড়িয়ে কাপড় রং করায় ছেলেদের সঙ্গে যোগ ছিল।

ফড়িং পোষায় ছুণীই বোধহয় সব চেয়ে বড় তারিফ পেতো শরতের কাছ থেকে। ছুণী ছোট গিন্নীর বড় মেয়ে। শান্ত-শিষ্ট মেয়েটি, লেখাপড়ায় বেশ মন। তার কাজের পরিপাটি দেখে সবাই খুশি হয়ে যেত। একটি ফুট-দু-আড়াই লম্বা, শীশু কাঠের বাক্‌সে—রাজা ফড়িং, গঙ্গা ফড়িং, গাধা ফড়িং, কেরাণী ফড়িংএ তাদের অসীম ধৈর্য এবং সসীম আয়ুর পরীক্ষা দিয়ে ঘাস জল খেয়ে, কোন রকমে জীবন ধারণ করে ছেলেমেয়েদের অপার আনন্দ দিতো।

সব ফড়িং কিছু একরকম গাছের পাতা খায় না। রাজা ফড়িংএর আকন্দ পাতা চাই। এমনি করে প্রত্যেকটি রকমের জন্য ঘাস পাতা জোগাড় করতে করতে ছেলেমেয়েদের পায়ের বাধন ছিঁড়ে যেতো আর কি!

যারা অপেক্ষাকৃত বয়সে ছোট তাদের ফাইফর্মাস খাটাই ছিল কাজ! বুড়ো কোকিলটা রক্ত চোখে পেঁচার মত মুখ হাঁড়ি করে দিনের পর দিন কাটায়; কত শীত-বসন্ত আসে যায়—মুখ হাঁ করে একটা কিক্ কুক্ শব্দ পর্যন্ত করে না! কিন্তু ছাতু দেখলে নিচের ঠোঁট মাটিতে ঠেকিয়ে উপরেরটা আকাশে বিস্তৃত করে দিয়ে যেন কেষ্ট ঠাকুরের মা যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখানর মত ভঙ্গী করে ডানা কাঁপিয়ে অধীর হয়ে উঠে! "পথের দাবীর" সর্বজ্ঞ সব্যসাচীর মতো শরৎচন্দ্র কোকিলের স্বর-স্তম্ভন দূর করার মুষ্টিযোগ বললেন, "আমের কচি পাতা!" আর আছে রক্ষে! ছুটলো নেংটির দল। চক্ষের পলকে এসে পড়লো কালোচে বেগ্‌নি রংএর কচি পাতা, গোছা গোছা!

শিশু কল্পনায়, কানে এসে পৌছয় যেন রাতেই কোকিলের কুহু কুহু! কিন্তু শয়তান পাখি কি সমস্ত দিনে তার দিকে ফিরে একটা ঠোকরও মারলে!

তখন আবার সেই সব্যসাচী-ভঙ্গীতে হুকুম হ'ল—কচি আম পাতার রস মরিচের গুঁড়ো দিয়ে ওর গলায় ঢেলে দিতে হবে!

সাঙ্গোপাঙ্গের চোখগুলো আশ্চর্যে ডাগর হয়ে উঠে! অত্যন্ত সহজ ভাবে দলের গোদা বলেন, "দেখিস্‌নি সেদিন চন্দ্রবাবুর বাড়িতে?"

"কি-ই? কি-ই, কি-ই, শরৎ?"

"মুস্তরি বাই-এর গলা খুললো—আদার রসে মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে।"

তবুও বিস্ময়ের নিরাকরণ হয় না। শরৎ বলেন, "আম পাতার রস কোকিলদের আদার রস কি না!"

বুড়োকে চেপে-চুপে ধরে সেই ধন্বন্তরি-রসায়ন খাইয়ে দিয়ে ছেলে-মেয়েদের দল বিপুল আশায় রাত্রি যাপন করে—শেষরাতে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো বসন্তের অগ্রদূত সাড়া দেয় বা বুঝি!

সকালে খাঁচার চারিদিকে ভিড়! বুড়ো কোকিল ঠ্যাং উল্‌টে পরপারের দিকে যাত্রা করেছে।—বেচারী!

সে দিনের জন্যে সর্দারজিও ঊর্ধ্ব-পুচ্ছ!

ছোট কর্তা নেপাল-তারাইএর দিকে গিয়েছিলেন সফরে। ফিরে এলেন এক বিরাট-বপু কুকুর সঙ্গে করে! কান দুটো তার গলা ছাড়িয়ে ঝুলে আছে, শাদা মুখে চোখের ওপর থেকে কুচকুচে কালো রং—মাঝখানটায় টেরির সরু শাদা লাইন! চোখ দুটো ভাবে-ভোলা ভোলানাথের মত। বড় বড় থাবা, হাড়-মোটা পায়ের গুছি! দেখলেই বোঝা যায় যে মড়া-খেকো, নেড়ি জাতীয় নয়। হিমালয়ের ব্রব্‌ডিগন্যাগ্‌ টাইপ। নাম কর্তাই দিয়ে এনেছিলেন—টমি।

ছেলেমেয়েদের আপসোসের অবধি নেই। উঃ, এমন কুকুরের নাম বাঘা নয়, রাজা নয়—হ'ল কিনা টমি! ছি-ই! ছি-ই!! কি পছন্দ ছোট বাবুর!

রাস্তায় দাঁড়িয়ে টমি ডাক্‌লে ঘেটোদের ল্যাজ মুচড়ে পেটের নীচে চলে যায়! বাচ্চাগুলো হাত পা উঁচু করে ডিগ্‌বাজি খেয়ে নর্দমার মধ্যে হাড়-গোড় মুচড়ে পড়ে!

সেই টমিকে নিয়ে ছেলেমেয়ের বুক ফুলে যেন হ'ল গড়ের মাঠ!

সর্দারজি বললে, "এই কুকুর নিয়ে বরফের ওপর নৌকার মত নি-চাকা গাড়ি নিয়ে ছুটতে কি মজা!"

ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করে, "বরোফ? যা সরবোতে দিয়ে খায়?"

"হ্যাঁরে, হ্যাঁ! ও দেশে ভারি ঠাণ্ডা কি না! ও দেশের মাটির ওপর পেঁজা তুলোর মত বরফ পড়ে পড়ে শক্ত হয়ে কাঁচের মতো তেলা আর চক্‌চকে হয়ে যায়। তখন ও দেশের লোক হরিণ, কুকুর দিয়ে এক রকম চাকা-নেই গাড়ি চড়ে বেড়ায়!"

ছেলেমেয়েরা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে! হায় এ দেশে যদি বরফ পড়তো!

সর্দার হাসে। বলে, "তোদের দুঃখ্‌খু সেই একজন গরীব মানুষের মতো হ'ল যে! রাস্তায় একটা লাগাম কুড়িয়ে পেয়েছিল; তারপর ঘোড়ার জন্যে শোক করতে করতে শেষ পর্যন্ত মারাই গেল।"

বানানো গল্প বুঝে—সবাই হেসে এ-ওর গায়ে পড়ে!

গঙ্গার জল কমে গেলে জলের ওপর অনেকখানি পাড় বের হয়ে পড়তো। সেই পাড়ের গায়ে গর্ত করে গাঙ্‌শালিখেরা বাসা করে। গাঙ্‌শালিখ আবার ময়নার মত চমৎকার পড়তে পারে। ছেলেমেয়েদের যাদুঘর আর চিড়িয়াখানায় একটা গাঙ্‌শালিখের ছানা আশ্চর্য রকম পোষ মেনে গেল। তার লম্বা কাটি-কাটি হলদে পায়ে একটি করে ছোট্ট ঘুঙুর পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে নেচে নেচে সারা বাড়ি খেলে বেড়াতো। এটি ছুনী আর ফুটির ভারি আদরের ধন!

হঠাৎ সর্দারের—যদিও তিনি নিত্য মুক্ত স্বভাববান,—এই পাখিটির ওপর মায়া বসলো।

কেন জানিনা, কি গুণে বলতে পারিনে,—ছেলেমেয়েদের দলের প্রত্যেকেই শরৎকে খুশি করতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যেত।

সর্দারের পড়ার যায়গায় টুল আর ডেক্‌সোর তলায় ঘুরতে ফিরতে কেমন করে যে সেটি হুলোবেড়ালের পেটের মধ্যে চলে গেল তা যতই বোঝা গেল না, ততই রাগের আগুন বেড়ে উঠতে লাগলো ছেলেমেয়েদের দলে! শেষ পর্যন্ত সর্দার বেড়াল-মেধ যজ্ঞের জন্যে ক্ষেপে উঠলেন। তিনি হুকুম দিলেন "দেখ-মার ব্রত" অবলম্বন করতে হবে।

দিন যায়, ক্রমে দেখ-মার বিধানের ওপর ভক্ত-বৃন্দের অনাস্থা জন্মাতে লাগলো। সর্দারের মাথায় চিন্তার চাকা দিনরাত বন্‌-বন্‌ করে ঘুরচে, এমন সময় হঠাৎ, একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। ছোট কর্তার হাতে দোরের একখানা কপাট চাপা পড়ে, শ্রীমান্‌ হুলো, ভবলীলা সাঙ্গ করে, পরলোকের পথে অগ্রসর হয়ে গেল!

অবশ্য ব্যাপারটা নিঃশব্দে চুকে-বুকে যায় নি। কেন না, ছোট গিন্নী এমন একটি সুস্থ সবল প্রাণী-বধে বিষম কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তখন তাকে বাঁচাবার জন্যে বড় কর্তার আদেশে এলো সের পাঁচেক পাঙা-নুন। মার্জারের মৃতদেহ নুন চাপা দিয়ে বহুকাল অপেক্ষা করে দেখা গেল যে অত সহজ প্রকরণে প্রাণ-বায়ু জীব-দেহে প্রত্যাবর্তন করে না।

ছোট গিন্নীকে ছেলেমেয়ের দল অকপটে ভালোবাসতো। তাঁর চোখের

জল রেখে তারা কেঁদে ফেলেছিল নিশ্চয় ; কিন্তু মনের এক কোণে দুরন্তের আনন্দে উল্লসিতও হয়েছিল তারা !

অদ্ভুত বৈচিত্র্য, আর বিরোধি সত্তার সমাবেশে তৈরি মানুষের মনটি !

সর্দারের দর্শন বললে, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

এই সব তত্ত্ব "সংসার-কোষ" থেকে সংগ্রহ করে শরৎ আর তাঁর মণি-মামাটি—তাঁদের ভক্ত-অনুরক্তের দলকে সর্বদাই চকিত বিস্মিত এবং সর্বোপরি মোহিত করে রাখতেন।

বিশ্ব ব্যাপী ছিল এই সংসার-কোষের জ্ঞানের সংগ্রহ। একটা দৃষ্টান্ত দিলে, আশা করি কথাটি পরিষ্কার হবে।

ছেলে বেলায় দেখতে পাওয়া যায়, শিশু-মন এডভেঞ্চারের গল্প শুনতেও ভালোবাসে এবং দুঃসাহসিক কাজ পারলে, করতেও ভালোবাসে এবং করেও বসে ! ছাতের আলসের উপর উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে বিপদের কাছাকাছি করে—নিরাপদে ফিরে আসার একটা বড়াই-বুদ্ধি কোন কোন বয়স্কের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়—শিশুদের তো কথাই নেই ! এই যে দুঃসাহসিকের দুর্গমের অভিযানের প্রলুব্ধতা, পৃথিবীর প্রগতির ইতিহাসে, এর স্থান খুব উঁচুতে, স্বীকার করতেই হবে। বিজ্ঞানের জ্ঞানাকাঙ্ক্ষার আগ্রহের উগ্রতার মুখে বাধা-বন্ধন সব কিছুই—ছোট-খাট তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই জন্যে বিজ্ঞান-প্রেমিক মানুষের পক্ষে দুঃসাহসের কাজ সহজ এবং সোজা ! শরতের মধ্যে, সব জিনিসকে নিজের আলোতে নতুন করে, বোঝাবার একটা অত্যন্ত প্রবল চেষ্টা ছিল,—যার প্রেরণা তাঁকে অনুক্ষণ অধীর, অস্থির, চঞ্চল করে রাখতো !

দুজনকেই কাছে পাওয়ার সুযোগ আমাদের ঘটেছিল ; শরৎ আর তাঁর মণি মামাকে। শরতের সমস্ত সক্রিয়তা ছিল বিজ্ঞান-প্রমুখ, আর, তাঁর মণি মামার—দর্শনমুখী সমন্বয়ের মধ্যে ! তাঁর মনের গতি ছিল ধীর, স্থির গম্ভীর বিশ্বাস-মন্থর ধ্যান তন্ময়তায় শান্ত-সমাহিত। একজনের মধ্যে ছিল জ্ঞানের সুতীব্র ক্ষুধা—আর অন্যজনের যেন সব পেয়ে যাওয়ার পরম পরিতৃপ্তি !

সংসার-কোষের ব্যবহার দুজনের নিজের নিজের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির নির্দেশ অনুসারেই হ'ত।

শরৎ বার করলেন সংসার-কোষ খুঁজে যে, বেলের শেকড় ফণাধরা গোখরো সাপের মুখে দিলে সে মাথা নীচু করে হীনবল হয়ে যায়!

এই তথ্যকে পরীক্ষা করে সত্যের পংক্তিতে আনা যায় কিনা তারই চেষ্টায় শরৎ একটা হাঁড়ি আর সরা জোগাড় করে বাদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরতে লাগলেন। অবশেষে গোখরো সাপের শলুই মিললো। বেলের শেকড় এলো। তারপর পরীক্ষা!

সাপ সতেজে মাথা তুলে ফণা ধরলে। শরৎ তার মুখে বেলের শেকড় দিতেই সে ছোবল মারলে শেকড়ের ওপর—একবার নয়, বার বার তিনবার!—শেষ পর্যন্ত রাগে পাগল হয়ে সাপটা কাকে বা কামড়ায়—এমন সময় ওপর থেকে মণিমামার মোটা লাঠির চোটে সে শুধু হীনবল হ'ল না, একেবারে পঞ্চত্ব পেলে।

সংসার-কোষ থেকে ঐ ইং হ্যং হ্রিং হ্রিং রক্ষ রক্ষ স্বাহা মন্ত্রটি মণি-মামার উদ্ধার। এটি পরম বিশ্বাসের দ্বারা বিধৃত এবং সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে, এই বিশ্বাসে এই ছেলেমেয়ের দল—নিত্য জপ করে মনে করতো সে সত্যিই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেল।

দুটি চরিত্রের তফাৎ দেখানই আমার উদ্দেশ্য। আশা করি, শরৎকে ভালোই বোঝা যাবে তাঁর মণি মামার ব্যাক গ্রাউণ্ডেই!

এই খেলাগুলির মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের দেহ মন এবং চরিত্রের নিঃশব্দে, শিশু বুদ্ধির অগোচরেই—যে উন্নতি বিধানের অনবদ্য সুন্দর ব্যবস্থা নিহিত থাকত—তার কথা ভাবলে অতিমাত্র আশ্চর্য না হওয়া ছাড়া, অন্যপথ দেখিনে। শরৎ সবটা আগা-গোড়া ভেবে চিন্তে করতেন বলেও বিশ্বাস হয় না। সুব্যবস্থা হয়েছিল তা পরিষ্কার দেখা যায়; কিন্তু কে করলে, কেন এমনটি হ'ল তা' নির্ণয় করতে পারিনি।

গাঙ্গুলিবাড়ির পশ্চিম সীমানায় একটা বিরাট মাঠ-কোঠা ছিল। নীচে তার দুটো বড় বড় ঘর। উত্তরেরটায় থাকতেন রামধনের সেজো ছেলে মহেন্দ্রনাথ এবং দক্ষিণের ঘরটিতে থাকতেন মতিলাল আর ভুবনমোহিনী। দক্ষিণে একটি বড় গোছের জানলা ছিল এবং সেই জানলায় বসে ঠাকুরদাদের বাগানের গোলাপের শোভা দেখে ছেলেমেয়েরা মোহিত হয়ে থাকতো।

পশ্চিমের মাটির দেওয়ালের কাছে একটি বড় গোছের কাগজি লেবুর গাছে দুর্গা টুনটুনির বাসায় ময়ুর-কণ্ঠী রংএর পাখিটির আনাগোনা দেখতে দেখতে কত সময় যে কেটে যেত তার ঠিক-ঠিকানা নেই!

এই দুটি ঘরের উপরটা জুড়ে ছিল একটি প্রকাণ্ড ঘর, কিন্তু সে ঘরে তালা চাবি দেওয়া থাকতো। পূজো কি কাজকর্মের সময় ভাঁড়ার হ'ত। সে ঘরটিকে ছেলেমেয়েদের ভূতের আড্ডা বলেই জানা ছিল। এ রকম বিশ্বাসের একটা সমূহ কারণও ছিল। অমরনাথের প্রথম পক্ষের স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে মারা যান এই ঘরেই।

উপরে যাবার সিঁড়িগুলো সেকালের বড় বড় ইঁট আর মাটি দিয়ে গাঁথা। উপরের সিঁড়িটা মাটি থেকে আট-দশ ফুট উঁচুতে হবে। ছেলেরা এখেনেই লাফানো প্র্যাক্‌টিশ করত। মাটিতে পড়ার আগে হাতে পায়ে স্প্রিং দিতে হয় তা' শরৎ শুধু নিজে লাফিয়ে দেখাতেন না; একটা বাচ্ছা বেড়াল ফেলে দিয়েও তার ডিমনস্‌ট্রেশন হ'ত।

এতে দেহ চর্চা হ'ত আর হ'ত সাহসের চর্চা: প্রয়োজনের সময়, তাই এই বাড়ির ছেলেরা অনায়াসে একতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে পারতো।

সকালে বিকেলে বাইরের বাড়িতে পড়াশুনায় হাজিরি না দিলে কেদার-নাথের কঠিন শাসন উদ্যত হয়ে উঠবেই উঠবে। অতএব খেলাগুলি বাকি সময়ের মধ্যে সেরে নিতে হ'ত। যতদূর মনে পড়ে শনিবারের হাফ্‌-ইস্কুলের পর ছেলেমেয়েদের ফূর্তির আর শেষ থাকতো না।

সেদিন বসতো অমরনাথের নিমতলার বারান্দায় বড় বড়দের দোকান। তেঁতুলের বিচি, কাঁঠের বিচি, শুক্‌নো তুঁত, ডুমুর কত কি বিচিত্র ফল পাতার ডাঁই লেগে যেতো। আতা, নোনা, দাঁতরাঙার ফল! এদিকে টাঁকশালে টাকা তৈরী হচ্চে। ভাঙা খোলাম কুচিকে গোল করে ঘষে, টাকা, আধুলি, সিকি তৈরি হচ্চে। বড় হয়ে অনেক ফ্যান্‌সি ফেয়ার—যার বাংলা আনন্দ বাজার দেখেছি। টাকা কড়ি জিনিস-পত্রের তুলনায় শিশু-বাজার হয়তো অনেক পিছনেই: কিন্তু দোকানিদের উৎসাহ এবং আনন্দে সে বাজার কোন বাজারের পিছনে ছিল না নিশ্চয়।

আট

গাঙ্গুলিবাড়ির কঠোর নিয়মতান্ত্রিক শাসনের মধ্যে শরৎচন্দ্রের নিরন্তর বিদ্রোহের চেষ্টা, সেদিনকার দিনে যে-দৃষ্টিতে মানুষ দেখেছিল, আজ আর তেমন করে কেউ দেখ্‌বেও না আর দেখার দরকারও নেই। অতীতের দূরের ব্যবধান থেকে আজ শান্ত-সমাহিত হয়ে ভেবে দেখ্‌তে গেলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, গাঙ্গুলিদের সাধুচেষ্টা ছিল শরৎকে একটি পোষমানা মানুষ তৈরী করে তোলা; কিন্তু শরতের মধ্যে তার নিজের বড় হবার মাল-মসলা, উপকরণগুলো কিছুতেই ছোট হয়ে যেতে দিতে চায় নি তাকে। এবং সেই না-চাওয়ার পিছনে একটা নির্ভীক নির্বিকার বে-পরওয়া অন্তশক্তি ছিল যে কোন শাসনেই মুষড়ে পড়ত না।

গাছ-পালা-নেই ধুধু-মাঠের মধ্যে হঠাৎ একটা কৎ-বেল, কি তেঁতুল, কি কুল গাছ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে হয়, কার চেষ্টায়, কার যত্নে—গাছটা সেখেনে হ'ল?

আমাদের মনে ভুল হয় সবটাই বুঝি মানুষে করছে; সবই বুঝি মানুষের চেষ্টায় হয়। সমাজকে দেশকে জাতকে মানুষকে গড়ে তুল্‌তে হ'লে এমনি একটা দৃঢ়-মনন, এমনি একটা পুরুষকারের উপর অটুট নির্ভরতা না থাক্‌লেও চলে না সত্যি; কিন্তু মনের নিভৃত বেদীতে আর একটি বৃহত্তর শক্তিকে স্বীকার করে নিতেই হয়—যার কাছে মানুষ তৃণের চেয়েও অকিঞ্চিৎকর! যার শক্তির সঙ্গে মানুষের শক্তির কোন তুলনাই চলে না।

শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহ সেদিন হয়তো নিছক বদমাইসি ব'লে কর্তাদের প্রতীয়মান হয়েছিল; কিন্তু আজ আর তেমনটি মনে করে নেবার কোন উপায়, কি অবসর নেই! আজকে সেই কাঁটা-কুল গাছটি—যাকে বারম্বার ক্ষুণ্ণ করে শেষ করে দেবার চেষ্টা হয়েছিল, সেটি নিজের মধ্যে নিহিত অমর জীবনীশক্তির বলে একটা পূর্ণাবয়ব গাছে পরিণত হয়ে পথিকের প্রয়োজনে লেগে গেছে।

শরৎচন্দ্রের নিজের লেখা বইগুলির মধ্যে তাঁর জীবনের ছোটখাট, টুকিটাকি কাহিনীগুলি অত্যন্ত চমৎকার ভাবে এসে লেখাগুলিকে মনোরম করে তুলেছে; কিন্তু সেগুলি সাহিত্যের রঙে-রসে বাস্তব থেকে এত দূরে সরে গেছে যে, তার সত্যিটুকু চিনে নেওয়া শক্ত। সেগুলিকে তাদের বাস্তবের স্বরূপে দেখতে পেলে জ্ঞানের দিক দিয়ে, তথ্যের দিক দিয়ে, আনন্দের দিক দিয়ে হয়তো কাজে লাগতে পারে মনে করে একটু বড় করেই বলার ইচ্ছে করছি। আশা করি তাতে কারুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না।

একসময়ে মানুষ মনে করতো যে, ছেলে-পুলেদের খেলা-ধুলোর ব্যাপারটা একদম বাজে; শুধু সময়, আর শক্তি নষ্ট করা—তা থেকে ছেলেমেয়েরা কু-শিক্ষা লাভ করে, অলস হয়ে যায়, অমনোযোগী হয়। এ কথা যে একেবারে মিথ্যে তা কে বলবে? আমাদের দোষ, আমরা কোন জিনিসকেই তার উচিত মূল্য এবং মাত্রায় বিচার করে নিতে পারি নে।—মন-ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত যেদিকে ঝুঁকবে সেদিকে একেবারেই ঝুঁকে যাবে। আবার তার চেয়ে বড় মুস্কিল যে মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে গেলে—একেবারে অচল হয়। মনের কিন্তু ঐ এঁকাবেঁকা হয়ে চলাই নাকি অগ্রগতির ধর্ম! মনের আর একটা খুব বড় খেয়াল আছে, সেটা হচ্ছে: একটা জিনিসের আগাগোড়া দেখে নেওয়া, বুঝে নেওয়া।

ফল তো গাছ থেকে মাটিতে পড়েই থাকে চিরকাল। উনুনের উপর কেৎলিতে জল বসিয়ে দিলে ভেতর থেকে তাপের জোরে কাঁপবেই তো ঢাকনি! এ আর কি এমন একটা নতুন কথা হ'ল?

কিন্তু যাঁরা এই জিনিসের শেষ পর্যন্ত গিয়েছেন তাঁরাই তো পৃথিবীতে চির-স্মরণীয় হয়ে রইলেন। মাধবাচার্য, নিউটন, ওয়াটের কথা কে না জানে?

তাই বলছিলাম মনের এই খেয়ালটিকে অবহেলা করা চলে না। আমাদের গুরুমশাই-গিরির রূঢ়-হস্তাবলেপনে এমনি কত বড় গুণ হয়তো চির দিনের জন্ত নষ্ট হয়ে যায়। যেখেনে হয়না—সেখেনে বুঝতে হবে মানুষের পরম সৌভাগ্য!

পাওনাদার) যেমন খেলা শেষ পাঁয়াচ পর্যন্ত যাবার খেয়াল ছিল। যা ধরবে তাকে শেষ করে ছাড়বেই।

গাঙ্গুলিবাড়ির ছেলেদের পাছে কুসঙ্গ হয় ভয়ে বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মিশে খেলা-ধুলো করার অনুমতি ছিল না। তাই উঠানের মধ্যে গাবু অর্থাৎ গর্ত খুঁড়ে মার্বেল খেলার ব্যবস্থা ছিল। খেলার সময় খেলতে মানা ছিলনা অবশ্য কিন্তু অসময়ের খেলায় মজা খোঁজারও মনের অভাব এদের মধ্যে একটু নির্দয় ভাবেই ছিল। তা ছাড়া আর এক কথা। এ খেলার ছিল দুটো ধারা। একটাকে বলে জিং-গুলি আর একটা ধাই-গুলি—পাঠক বেহারের ভাষাকে মার্জনা করবেন। জিং-গুলির ধারাই যেই—একমাত্র মার্বেলটা গাবুতে ফেলে যার গুলিকে মারা গেল তাকে একটা গুলি জরিমানা দিতে হবে। এ খেলা এক-সঙ্গে অনেকে মিলে খেলতে পারা যায়। আর ধাই-গুলি হচ্ছে গাবুতে ফেলে—অর্থাৎ গেলালে এক, মারলে দুই; এমনি করে বিলম্বিত গতিতে দশ হলে তার জিৎ—যে হারলো তাকে ধাইতে হবে। অর্থাৎ নিজের গুলি গাবুতে ফেলতে পারা চাই; কিন্তু পাঁচ সাত জন জিতলে গুলি গাবু থেকে বহু দূরে বিতাড়িত হ'তে বাধ্য! এ খেলার মধ্যে খাটুনি আছে, কিন্তু মজা কম।

এই শেষের প্রকরণটি ছেলেরা দু-চক্ষে না দেখতে পারলেও কর্তাদের ভারি পছন্দসই ছিল এবং প্রথম প্রথা অনুসারে অর্থাৎ জিং-গুলি কিছুতেই খেলার উপায় ছিল না, কেন না তার নাম ছিল "জুয়া" খেলা।

শরৎ জিং-গুলি খেলতে ভালবাসতো, তাই সে বাড়ি ছেড়ে কোথায় যে উধাও হ'য়ে যেত! তার নিজের একটি ছিল ধপধপে সাদা বড় মার্বেল, নাম "টল" আর একটা ছিল ছোট্ট—তার নাম "আম্টা," সেটা কড়ে আঙুলে আট্কে ধরে খেলার নিয়ম ছিল শরতের।

খালি পা, গায়ে বাহাদুর দর্জির অদ্ভুত ছাটের কোর্তা, চুলগুলো লম্বা লম্বা, শরৎ খিড়কি দিকের দাঁতরাঙা গাছ বেয়ে কখন বাড়ি ঢুকে নিজের লেবলকে সেদিনের জেতা গুলিগুলো দান করে দিত। দু-পকেট-ভরা—কম হ'লে কুড়ি-পঁচিশটা তো বটেই!

মুসলমান আমলে যে সব বাঙালী গিয়েছিলেন ভাগলপুরে/ তাঁদের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁরা নিজেদের বুদ্ধিমত্তায়, কর্মকুশলতায় এবং বিশেষ করে পাটোয়ারি বুদ্ধির জোরে জমিদারি করে অবস্থা গুছিয়ে নিয়েছিলেন বটে; কিন্তু বাঙালী জাতের বিশেষত্বগুলি হারিয়ে ফেলে সম্পূর্ণ দেশবাসীর পর্যায়-ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

বাঙালীর বঙ্গ-ভঙ্গের দুর্দিনে যখন ঐ জাতের ওপর প্রভুরা অপ্রসন্ন হ'লেন, তখন এই দলের জমিদারেরা কর্তাদের কাছে নিজেদের বাঙালী-বদনামটা লুকিয়ে রাখবার জন্যে বংশের পরিচয়, এমন কি পিতৃ-পিতামহের নাম ভাঁড়াতেও কসুর করেন নি।

কিন্তু ইংরেজ আমোলে যে সব বাঙালী গিয়েছিলেন তাঁরা আবার নিজেদের বাঙালী বলে গর্ব অনুভব করতেন, বোধকরি একটু বেশি রকমই। মানুষ-স্বভাবের পেণ্ডুলামের ঐ তো দোষ!

বেহারের লোকেরা খাওয়া-দাওয়ার সম্পর্কে একটু সাদাসিধে। ওদের মেয়েরা সারা দিনরাত রান্না ঘরে বসে উনকুটি চৌষট্টি রকমের 'পদ' রেঁধে পুরুষকে খাইয়ে জীবনকে সার্থক করে না। ওদের সকালের খাওয়া চালাও ছাতু আর লঙ্কা। এক এক জনে তাল তাল উড়িয়ে দেয়। সুস্থ সবল দেহ, পরিশ্রম করতে পারে চমৎকার। খাওয়াও তাঁদের মতো।

বিকেলের খাওয়া ভাত, ডাল আর ভাজি। ওরা শুক্তো, কি ডালনা, কি কালিয়ার তোয়াক্কা রাখে না, টকের মধ্যে দই-বড়া, কিম্বা লাউ-এর রায়তা মানে দই-এ লাউ সিদ্ধ। এই সহজের মধ্যে দিয়ে বেহারের সাধারণের রসনা তৃপ্তির ব্যাপারটা চলে থাকে। সাধারণ নিমন্ত্রণের ভাষা: 'শাক-খাত্তু'। অবশ্য পুরীর ভোজ যে ওদেশে হয় না তা বলতে চাই নে। কিন্তু তার প্রকরণটা একটু আলাদা ধরণের। ও দেশে ও ধরণের ভোজ মিষ্টি থেকে শুরু হয়ে শাকে এসে শেষ হয়!

যাক অন্যায় কথা। এই অধুনাতন পর্যায়ের বাঙালীরা ইচ্ছে করেছিলেন যে খাওয়ায়-দাওয়ায়, আচারে-বিচারে, ঠিক বাংলা দেশের বাঙালীর মতো

মোক্ষদায় হেড্ পণ্ডিত ছিলেন ভূষণ পণ্ডিত মশাই, তাঁর পুত্রবধূটি সারদা। এই ইস্কুলে মোটা-মোটা দুটি শাদা "ঘোড়া-টানা" একখানি সবুজ রঙের জাপানি গাড়ি ছিল। সেটাই ছিল সব ইস্কুলের সেরা প্রাধান্য!

জাপানি গাড়িতে মেয়েরা সেকালেও যখন চশমা পরে গালে হাত দিয়ে বসে নিশ্চেষ্ট ভাবে ইস্কুলে আসতো তখন রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যেত। শুনতেও পাওয়া যেত পথিক-প্রবরদের কথা-বার্তা। গোল্লায় গেল বাঙালী-জাতটা! উত্তরে শুনতে পাওয়া যেত: ওদের জাত নেই। মাছ খায়, মাংস খায়, মেয়েদের রাস্তায় বার করে......ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই অর্থডক্স্ বেহারের টুপি এখন প্রায় লোপ পেয়ে এসেছে। মাথার টৈতন্যটি নিরাকারত্ব প্রাপ্ত হ'ল বলে। মাছ মাংস আর মোটেই অখাদ্য নেই। এবং ইস্কুলের গাড়িতে চশমা পরা বেহারী মেয়ে দেখে আজকাল পথিকেরা নিঃশব্দে যাতায়াত করেই থাকে; তাদের চোখ সেকালের মতো বিস্ময়ে ডাগর হয়ে উঠে না।

দুর্গাচরণের স্কুলে একটি ক্লক ঘড়ি ছিল। তার ভার ছিল নবীনতম শিক্ষক অক্ষয়কুমারের ওপর। সোমবারে দম দেওয়াটি সূর্যচন্দ্রের আকাশ পথে ভ্রমণের চেয়েও যেন সঠিক এবং নিয়মিত। সেই ঘড়িতে দেড়টা বাজলে অম্বিকাচরণ টেবিলের উপর থেকে টুনটুনি ঘণ্টা তুলে 'টিনি টিনি' বাজিয়ে দিলেই ছেলেরা হো-হো শব্দ করতে করতে টিফিন্ টিফিন্ করে চেঁচিয়ে বেরিয়ে যেত ক্লাশ থেকে। ওদিকে যোগুয়া চাকর ছেলেদের কাছ থেকে পয়সা সংগ্রহ করে জিলিপি কিনে রেখেছে। সেখেনে দুষ্টু ছেলে যারা পয়সা দেয়নি তারাই গিয়ে আগে ভাগে, জিলিপি খেয়ে ফেলে করুণ কান্নাকাটি ব্যাপার প্রায় নিত্যই ঘটিয়ে বসতো।

অক্ষয় পণ্ডিত সেই বিচারে ব্যাপৃত থাকতেন, আর তিনজনে পরম অবসরটি কড়া রকম তাম্রকূট সেবনে বিনোদন করতেন। এমন বহুকাল থেকেই ঘটে আসছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা অঘটন ঘটতে লাগলো। শিক্ষকেরা বাড়ি পৌঁছে দেখতেন যে তখনও চারটে বাজার অনেক দেরি।

অবশেষে সেক্রেটারি অম্বিকাচরণের কৈফিয়ৎ তলব করে বসলেন।

অম্বিকাচরণ গালে হাত দিয়ে আকুল হয়ে ভাবতে ভাবতে বললেন, "অক্ষয়, দেখ, তুমি যদি কিছু উপায় করতে পার !"

অক্ষয়কুমার পিছনের জানলা দিয়ে চুপি চুপি একদিন দেখলেন যে যোগীনের কাঁধে বসে মহেন ঘড়িটাকে এগিয়ে দিচ্ছে। তিনি গর্জন করে উঠতেই নিমেষে বই নিয়ে ছেলেরা কে কোথায় পালিয়ে গেল। শুধু ক্লাসের মধ্যে শরৎ এমন ভালোমানুষের অভিনয় করে বসে রইল যে সেইদিনই অম্বিকাচরণ তাকে গুড কন্‌ডাক্‌ট প্রাইজ দেবার সংকল্প করে ফেললেন।

বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত বদমাইসির নাটের গুরু ছিলো মিচকে পড়া শয়তানটাই !

শরৎ বললে, "আমি এক মনে অঙ্ক কষছিলাম পণ্ডিত মশাই, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি কিচ্ছু জানিনে !"

সেই মুখের ভঙ্গি দেখে কে অবিশ্বাস করবে, সে কথা ?

নয়

লেখাপড়ার ব্যাপারে বাড়ির ছেলেদের উপর বেশ কড়া নজরই ছিল কর্তাদের। সকালে একটা করে রসে-মোটা জিলিপি খেয়ে বই স্লেট নিয়ে বাইরে ছুটতে হ'ত কর্তাদের সাম্‌নে বসে পড়া তৈরী করার জন্যে। রোয়াকের ওপর মাদুর পেতে যে-যার পড়া, দুলে-দুলে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে, পড়ছে। তাদের দেখা-শোনা করার জন্যে বিশেষ কেউ থাক্‌তেন না। যদি কোথাও আটকে গেল তো—পাশের যে অপেক্ষাকৃত বড়, তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে কাজ-চালানর নিয়ম ছিল। বিশেষ পরীক্ষা ছাড়া গৃহ-শিক্ষক থাক্‌তো না।

মাঝে মাঝে, পাশের অপেক্ষাকৃত বয়স্কটি যে বিভ্রাট ঘটাতো না তা নয়।

ফার্স্ট বুকের বড়-বানানে প্যারিচরণ সরকার ছেলেদের জন্যে একটি দুস্তর মরুভূমি সৃষ্টি করেছিলেন। সে কথা মনে করলে আজও আমার

অবশ্য বড় ছেলেদের ব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র।

ছুটির দিনের দুপুরের পড়াশুনো লেখার ভার পড়তো যাঁর ওপর তাঁর নিখুঁত ছবি শরৎচন্দ্র দিয়ে গেছেন তাঁর "শ্রীকান্তে"; এখানে তাঁর পুনরাবৃত্তির দরকার দেখিনে

রাত্রের ব্যবস্থা কিন্তু একটু বিশেষ ধরণের।

চণ্ডীমণ্ডপের মস্ত ফরাস বিছানায় ধপ্‌ধপে সাদা ফর্সা চাদর পাতা থাকতো। অতএব ছোট্ট ছেলেপুলেদের নোংরা পা, আর দোয়াত নিয়ে খুবই একটা দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। তখন খবরের কাগজও সহজে পাওয়া যেত না। ছিল এক "বঙ্গবাসী"; সে সপ্তাহ-খানেক ধরে পড়তে পড়তে জীর্ণ হয়ে কুটি কুটি হয়ে যেত। অতএব পাপোষে খুব ভালো করে পা ঘসে নিয়ে—এসে প্রদীপের চতুর্দিকে ঘিরে বসে পড়া সুরু হ'ত। পিলসুজের উপর টল্‌টল্‌ করছে এক প্রদীপ তেল। গোটা দুই সলতে লাগিয়ে উজ্জ্বল করে সবাই একযোগ হয়ে তার স্বরে পড়া সুরু হয়ে গেল। বারান্দায় কেদারের খাটে শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন কেদারনাথ। তাঁর জেরা ছিল প্রসিদ্ধ। শুক্রবার ছাড়া পুরানো পড়া পড়লে বলবেন, "কেন, তোমাদের নতুন পড়া দেয়নি?"

"না।"

"কেন?"

"পণ্ডিত মশাই ইস্কুলে আসেন নি; জ্বর হ'য়েছে।"

মূশাইএর ডাক পড়লো। চৌকো লণ্ঠনের বাতি জ্বলে উঠ্‌লো। চললেন কেদারনাথ খবর নিয়ে আস্‌তে একবার, আজ্‌ও পণ্ডিত মশাই আছেন কেমন। কেদারনাথ বাঙালী সমাজের সমাজপতি ছিলেন। ইস্কুলের সেক্রেটারি। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারেও আদর্শ-পুরুষ!

দাদা মশাই কোথাও বেরিয়ে গেলে শরৎ ইংরেজি কপ্‌চে বলতো:

ক্যাট ইজ্‌ আউট,—

সেট্ট মাইস্‌ প্লে····

তখন সত্যিই সুরু হয়ে যেত :

ডাল লিট্‌ল বেবি ডাল আপ হাই
নেভার মাইন্‌ড্‌, বেবি, মাদার ইজ নাই ॥
ক্রো এণ্ড কেপার কেপার এণ্ড ক্রো,—
দেয়ার লিট্‌ল বেবি দেয়ার ইউ গো
আপ্‌ টু দি সিংলিং, ডাউন্‌ টু দি গ্রাউণ্ড
ব্যাকওয়ার্ডস্‌ এণ্ড ফরওয়ার্ডস
রাউণ্ড এণ্ড রাউণ্ড ॥
ডান্স লিট্‌ল বেবি, এণ্ড মাদার উইল সিং ;
মেরিলি, মেরিলি, ডিং ডিং ডিং ॥

মেরিলি মেরিলির হিন্দি অনুবাদটুকু চমৎকার : খুশীসে, খুশীসে—তাক্‌-ধিনা-ধিন্‌ ॥

এই ছুঁচোর কীর্ত্তনের একদিনের ঘটনাটা বলি :

বর্ষার শেষ দিক। রাত সাড়ে-আটটা-ন'টা হবে। কেদারনাথ বারান্দায় নেয়ারের খাটে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ছেলেদের মাথার উপর চাম্‌চিকে এসে উড়তে লেগেছে পোকামাকড় খাওয়ার জন্যে। তেমন উড়লে কেমন যেন একটা অস্বস্তি হয় ; বিশেষত মণি-শরতের মতো ছেলেদের হাত নিশ্‌-পিশ্‌ করতেই থাকে !

সেদিনের সনাতন অভ্যাস লম্বা হয়ে শুয়ে হাতের ওপর গাল রেখে পড়ার পূর্ণ-ভঙ্গীর মধ্যেও সম্পূর্ণ নিদ্রিত হয়ে থাকা !

মাথার উপর চামচিকারা উড়তেই—মামা-ভাগ্নেতে [illegible] এই উদ্দেশ্যে তৈরি ছুটি দারুণ অস্ত্র—অর্থাৎ চেপ্‌টা সুন্দর-করে-ছেলে বাকারি ঘোরাতে লাগ্‌লো। চাম্‌চিকে জান্‌লা দিয়ে পালিয়ে গেল আর একজনের অস্ত্র প্রদীপে লেগে নিমেষে একটা বিদিকিচ্ছিরী কাণ্ড ঘটিয়ে দিলে। দু'জনের নিঃশব্দে পলায়ন এবং অচিরে কেদারনাথের নিদ্রাভঙ্গ।

"মুশাই, মুশাই !…"

"জী…"

"বাত্তি কেঁউ বুং গিয়া ?"

দেশলাই জ্বেলে মুশাই দেখে, না আছে মণি না আছে শরৎ……শুধু দেবিন—গভীর ঘুমে ডুবে আছে…

মুশাই বললে, "মণি-শরৎ তো খানে গিয়া—দেবিন বাত্তি গিরায় দিয়া…"

কেদারনাথ উঠে এসে দেখেন যে সেই ধব্‌ধবে ফরাসের উপর রেড়ির তেলের ঢেউ খেলছে—আর প্রদীপ দেবিনের পায়ের কাছে ছিট্‌কে পড়ে আছে!

এ দোষের আর ক্ষমা নেই, মার্জনা নেই!

অবিলম্বে চৌকো লণ্ঠন জ্বালা হ'ল। দেবিনের কান ধ'রে কেদারনাথ তুলে দিয়ে বললেন, "লে যাও আস্তাবল মে!"—অচিরে দেবিন আস্তাবলে ব'সে চোখের জল বুক ভাসাতে লাগ্‌লো। ঘোড়ার চিঁহিঁহিঁ—আর পা ঠোকা—কিন্তু সব চেয়ে বড় নয় কি অপরাধের শাস্তিটাই জীবনে!

মণি শরৎ বুদ্ধি করে খেতে বসে গিয়েছিল। তাই সেদিনের জন্যে তাদের রেহাই হয়ে গেল।

এই সময়ে শরতের সঙ্গে রাজুর পরিচয়। শরতের "শ্রীকান্তের" ইন্দ্রনাথ এই রাজু, ওরফে রাজেন্দ্রনাথ।

রাজুর সঙ্গে শরতের গোড়ায়-গোড়ায় বন্ধুত্ব হয়নি। শত্রুতা, প্রতিযোগিতা; গালাগালি, হাতাহাতি এবং মারামারির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছিল নিবিড় বন্ধুত্বে—যা' বাংলা সাহিত্যে অমর থেকে গেল।

রাজুর বাবা রামরতন মজুমদার একজন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। তিনি ভাগলপুরে আসেন ডিস্‌ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার হয়ে। তাঁদের বাড়ি পাবনা জেলায়। রামরতনবাবু ছিলেন বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। স্যর উপেন্দ্র মজুমদারের এঁরা আত্মীয়।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের অ-বনিবনাও হওয়ায় রামরতন ডিস্‌ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের মোটা-মুসহারার লোভ ত্যাগ করে কাজে ইস্তফা দেন।

গঙ্গার তীরে পরিত্যক্ত নীলকুঠি কিনে রামরতন শীত চেয়ে সাতখানি বাড়ি তৈরি করেন। ভাগলপুরের এই অংশের নাম আদমপুর।

এ সময়ে আদমপুর আর বাঙ্গালীটোলাকে যে রাস্তাটি বর্তমানে যোগ করেছে সেটি ছিল না। তার বদলে জলা, পুকুর আর বাব্‌লা বন ছিল। গঙ্গার জল বেড়ে গিয়ে পড়ত রামবাবুর পুকুরে—যার বর্ণনা এর আগে শরতের বাবা মতিলালের প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। হয়তো কোন সময়ে একখানি তালকাঠের পুল ছিল; কিন্তু পরে তার খুঁটোগুলি ছিল এবং কোন রকমে ডুবে পার হওয়ার মতো একখানি বাঁশ বাঁধা থাকতো।

এই বাব্‌লা বনের দুর্গম জল-স্থল-ডোবা-ঢিবির ভূখণ্ডে সেদিনের বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো দুঃসাহসিক ছেলের দল অভিভাবকদের কঠোর শাসনের গণ্ডী পেরিয়ে এসে মনের আনন্দে জীবনের পাঠ গ্রহণ করত। এইখেনে রাজু মহিষের দুধ চুরি করে খেয়ে শরীর বানিয়ে তুলতো। এইখেনে ধূমপান বিদ্যে কুমড়োর ডাঁটার হাতেখড়ি থেকে আরম্ভ করে গঞ্জিকা-চয়নের পরিণতি এবং চরম সিদ্ধি লাভ করতো। এইটিই ছিল শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথ, পুন্ন-নীলাম্বরের আদি বিচরণ ভূমি এবং তাদের কিশোর জীবনের লীলা ক্ষেত্র! আজও সেই পাকুড় গাছটি বিরাট বিস্তৃত মাথা আকাশে উঁচু করে সেই সেদিনের স্বপ্ন দেখে কি না কে বলবে!

রামরতনের দখলের আগে নীলকুঠির হাতায় কেদারনাথের সব্‌জিবাগ ছিল; সেখেনে শশা হ'ত, মূলো হ'ত; লাউ-কুমড়ো ইত্যাদি বারো মাসের শাক্-সব্‌জি আনাজ, তরি-তরকারি—যা' সেদিনে সেখানের হাট-বাজারে অতিশয় দুর্লভ ছিল—তা সবই মুন্সী মালীর দৌলতে পাওয়া যেত। যখন নীলকুঠি দখল করলেন রামরতন, গাঙ্গুলিরা হ'লেন নিঃসক্ত দর্শক। এই নির্বাক দর্শকদের অন্তরে স্তিমিত ক্রোধ-বহ্নি দুটি পরিবারের মধ্যে বহুদিন পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছিল।

তাছাড়া আরও কারণ ছিল এঁদের মধ্যে গরমিলের। আদর্শের দিক দিয়ে রামরতন হিন্দুই ছিলেন; কিন্তু নিষ্ঠা, আচার-ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে উচ্চ

শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাধারার পেয়ালায় হয়তো তা ধাতিয়াতে আপত্তি ছিল না। হয়তো বা অন্দরে মুসলমান বেয়ারার দেওয়া কাঁচের গ্লাসে জল না খেয়ে উপায় থাকত না। ইত্যাকার আচার-বৈষম্যের ফলে সেকালে পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতার ব্যবধানের আকাশে কথা-কথা-কাটির বেশ-অধিক হয়ে বিবাদের বজায়ির দেখা পাওয়া একেবারেই বিচিত্র ছিল না!

ভাগলপুরের বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ জাতীয় কলহ-বৈষম্যের মধ্যে যে শরৎচন্দ্র মানুষ হয়েছিলেন তা' তাঁর বইগুলি একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পড়লেই বুঝতে পারা যায়।

রামরতন যে অসাধারণ মানুষ ছিলেন তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁর চলা-ফেরা, কথা কওয়ার মধ্যে দার্শনিক ক্যান্ট জাতীয় ভাবও যেন বিরাজমান ছিল। সর্বদাই মোজা পরে থাকতেন। দাড়ি রাখতেন। আর বোধকরি ব্রহ্মচিন্তাও করতেন! তাই, এ পাড়ায় তাঁকে নাস্তিকের পর্যায় ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এর চেয়েও তাঁর আর একটা মারাত্মক অপরাধ ছিল যার জন্তে তিনি হয়তো কোথাও ক্ষমা পান্‌নি সেদিন। তিনি নাকি তাঁর ছোট ভাইএর বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইতেন! এই ব্যাপার আজ অতি সহজ হয়ে গেছে, এবং পরে হয়তো, ছোট ভাইএর স্ত্রীর সঙ্গে কথা না কওয়াটাই অভদ্রতা বলে মনে করা হবে। কিন্তু যে মানুষ কালের অগ্রবর্তী হয়ে চলেন তিনি তো সমাজ বিধানের সঙ্গে সংগ্রাম না করে এক পা-ও অগ্রসর হ'তে পারেন না। সমাজে কল্‌সির কানার অভাব কোন দিন হয় না; আর স্বাধীন চিন্তারও অবধি নেই!

রামরতন ক্লাবে যেতেন, সায়েব-সুবোর পার্টিতে গিয়ে চা-পানির ও রসাস্বাদন করতেন হয়তো এবং দিন কতকের জন্তে একখানা কাগজও নাকি বার করেছিলেন;—তাই মানুষটিকে সন্দেহের চক্ষে দেখটাকে সকলপাড়েই বিষয়-বুদ্ধির পরম পরিচয় বলেই মনে করতেন।

রামরতনের সাত ছেলের মধ্যে আগের তিনটি কৃতবিদ্য হয়েছিলেন। রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—সাহিত্য এবং সংগীতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে গেছেন।

রাজেন্দ্রনাথ কিন্তু সমাজের ধরা-বাঁধা পথে কোন দিন চলেন নি। বাংলা বনের বেতাটি তাঁর আজানুলম্বিত ভুজবলে নিজের একচ্ছত্র শাসন জারি করতে সর্বদাই ব্যস্ত। ইস্কুলের বইএ মন বসে না। নিত্য ঠিক সময় সেখানে যেতেও মনে থাকে না। তার চেয়ে বড় কাজ, গঙ্গার ঘাটে কে কোথায় কি অপরাধ করলে—তার গলায় গামছা দিয়ে ন্যায়ের স্বরূপ দেখিয়ে দেওয়া।

শরতের সঙ্গে রাজুর সব চেয়ে বড় রেশা-রেশি ছিল ঘুড়ি নিয়ে। গাঙ্গুলিবাড়ির কঠিন নিয়মে খেলা একেবারে সম্ভবপর না হ'লেও শরতের যায় আসে কি? তার রঙীন লাটাই, সুতো আর ঘুড়ি যে কোথা থেকে আসতো তা দেবতারাই নির্ধারণ করতে পারেননি তো মানব-শিশু কি করে পারে?

কিন্তু তাই বলে মানব শিশুদের রেহাই ছিল না। ঘোষেদের পোড়ো বাড়িতে শনিবারের দুপুরের পর, ইটের উনুনে সুতোয় মান্‌ঝা দেবার মাল-মশলা ভরা হাঁড়ির নিচের আগুনে ফুঁ পাড়তে পাড়তে তাদের চোখ ফুলে করমচার মতো হ'ত লাল। ধোঁয়ায় গালের উপর বয়ে যেত যেন গঙ্গা-যমুনার ধারা!

একটা বড় হামান-দিস্তিতে অনবরত তৈরি হচ্ছে বোতল-চূর। ঘৃত কুমারীর পাতা এবং গর্তের মধ্যে অতি সংগোপনে লুকিয়ে রাখা আছে দুচারটি রামপাখীর ডিম!

একটা যজ্ঞি বাড়ির হাঁক-ডাক ছুটো-ছুটির ছবির পিছনে আছে শরতের দৃঢ় জিদ্, দৃঢ় মনন—রাজুকে হারাতে হবে-ই।

রাজুর ছিল পয়সার জোর। "থাপ্পা" লাটাই—এক ধাপে দশহাত সুতো ঘুরিয়ে নিমেষে গুটিয়ে! তার দাম, আড়াই টাকা! অতএব শরতের ও পথ নয়। টানা খর্রা মান্‌ঝায় নয়, ঢিলে নরম মিঠে হাতে, লাটেরা ঘুড়িতে হারাতে হবে —তার মান্‌ঝা চাই মোয়ালেম, বোতল-চূর হবে ফুল-ময়দার চেয়েও মিহি!

শনিবার বিকেলে লুকিয়ে ছাদের উপর উড়ছে শরতের গোলাপী ডোরিদার ঘুড়ি! লাট খাচ্ছে অসম্ভব। যেদিকে ইচ্ছে, ডাইনে, বাঁয়ে।

গোঁৎ খেতেও যেমন, উপরে উঠ্‌তেও তেমনি : অর্থাৎ যা-চাও তাই! এদিকে টাইকা মান্‌ঝা; নীলের সুতো! মানে, মনে মনে আহ্বান চলছে—আয় দেখিরে, রাজু!

আকাশে অসম্ভব সর্‌ সর্‌ শব্দ করতে করতে একখানা শাদা ঘুড়ি আসছে গোলাপীর দিকে তেড়ে! ও আর রাজু ছাড়া কে?

নারদ! নারদ! লেগে যা, লেগে যা, ঝুটোপুটি!

শাদা ঘুড়ির মাথা ডিঙিয়ে পড়লো গিয়ে গোলাপী শাদার ঘাড়ে—ধীরে ধীরে পাক্‌ খেতে খেতে চল্‌ছে গোলাপী নিজের জয়ের স্বপ্নে বিভোর—আর শাদাখানা দ্বিধা দ্বন্দ্বে করছে সর্‌ সর্‌,—কি হয়! কি হয়! জয় কি পরাজয়!

বঃ কাটা!—শাদাখানা চিতাঙ্‌ হয়ে চলছে নীল সমুদ্রে মরা হাঙরের মত এদিক্‌-ওদিক……ছুটছে লগি হাতে ছেলের দল লুটতে ঘুড়িখানা!

পরের দিন সকালে শোনা গেল রাজু সুতো-লাটাই টান মেরে গঙ্গার জলে দিয়েছে ফেলে।

দশ

এমন দুটো মানুষ যদি কাছাকাছি হয় যে কেউ কারুর কাছে কিছুতেই নতি স্বীকার করবে না, তখনি চারিদিকের হাওয়া লড়াইএর সংবাদ বহন করে ঘনীভূত হ'তে থাকে।

লড়াই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুই বীরের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, অবস্থা এবং পদ্ধতি-প্রকরণের ভিন্নতায় ফল একটি অতি বিচিত্র কাব্যের মতোই রস মাধুর্যের মধুচক্র হয়ে দাঁড়ায়। রাজেন্দ্র-শরৎচন্দ্রের কলহ-বন্ধুত্বের ঘন-সংমিশ্রণে সুধা-বিষে মেশা স্মৃতির আধারভাণ্ডটি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে শরৎচন্দ্র তাঁর "শ্রীকান্ত" উপহার স্বরূপ নিবেদন করে গেছেন বাংলার সাহিত্য-রসিক মহাজনগণকে।

মানুষের কৌতূহলী মন জান্‌তে চায় ব্যাপারটির আগাগোড়া সমস্তটা।

কুস্তির লড়াইএর আগেকার বর্ণনায় দেখেছি যে, বুদ্ধি যার বল তার। শরৎচন্দ্রের ধীর-স্থির শান্ত-সমাহিত বুদ্ধির কাছে ছিল ইন্দ্রনাথের প্রীতির নতি। আর, রাজেন্দ্রের অমিত সাহস, তেজ—অপূর্ব প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সব কাজে সফলতামুখী প্রতিভার কাছে ছিল শিশু শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রণাম।

বোধকরি, শরৎচন্দ্রের মনে কিশোর বয়সেই সব্যসাচীর পরিকল্পনাটি রাজেন্দ্রনাথকে নিয়েই দানা বাঁধতে সুরু করে। যাদের তাঁকে দেখার সৌভাগ্য ঘটেছে তারাই শুধু জানে যে, রাজেন্দ্র মানুষটি আগাগোড়া অসাধারণের উপকরণে গড়া! সব্যসাচীর অদ্ভুত তৎপরতা শরৎচন্দ্রের "পথের দাবীতে" কোথাও আষাঢ়ে গল্পের বাস্তবহীনতা-দোষ রসহানি ঘটায়নি। তার কারণ সব্যসাচীর আদর্শের আসলটি ছিল শরৎচন্দ্রের মনে নিত্য বিরাজমান ঐ মনের মানুষটির প্রাণময় সক্রিয় জীবন্ত প্রতিকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্টসম্বন্ধের সম্বন্ধ।

শরৎকে অভিভাবকের শাসন-দুর্গের কঠিন ব্যূহের মধ্যে বাস করতে হ'ত, সেখেন থেকে মহিষের পিঠে শুয়ে অন্ধকার রাতে সাপের মণি দেখার অভিযান সম্ভবপর হ'ত না। সেখেনে এক কেঁড়ে মহিষের দুধের পর এক ছিলিম গঞ্জিকা সেবনের পরীক্ষণ, কল্পনার-ই অতীত ছিল! কিন্তু দেহ তৈরি করে তোলার কেবল ঐতো একমাত্র পথ নয়!

শরতের প্রতিভাসম্ভূত কার্যকরী বুদ্ধি সেই সিদ্ধির কল্পনায় অন্য এক পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিল।

মনে পড়ে ঘোষেদের পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়িতে, এক রবিবারের দুপুরে, মন্ত্রণাসভা বসে গেল কি করা যায়? শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। কুস্তির আখড়ায় বার চাই, ডাম্বেল চাই, ট্রাপিস চাই, রিং চাই, দড়ি চাই, কিন্তু সে-সব আসে কোত্থেকে?

আসবে, আসবে, ইচ্ছে-ই হ'ল আসল জিনিস। প্রথম চাই মাটি খোঁড়ার জন্যে খোন্তা আর গাছ কাটার জন্যে দা। ইচ্ছে তো ছিল আঠারো আনায়—অতএব হাতিয়ার পৌঁছতে কিছুমাত্র দেরি হ'ল না!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, আকাশে কাস্তের মত একটি চাঁদের ফালি! তা ডুবে যেতে আর দেরি কতক্ষণ? সাজো সাজো—সর্দারেরা হাঁক দিচ্ছে—এখুনি বেরুতে হবে উপকরণ সংগ্রহের অভিযানে। কিন্তু সে তো সোজা পথে গেলে হবে না—বড়দের সহস্রশির—লক্ষ লক্ষ চোখ, সে সব এড়িয়ে—উত্তীর্ণ হতে হবে তাল-বন্নার অন্ধকার নিবিড় বাঁশ-জঙ্গলে!

ঘোষেদের বাড়ির দক্ষিণে শ্যামবাবুর বাগান দিয়ে, পাঁচুরমা'র খিড়কির দোর খুলতে হবে পাঁচিল টপ্‌কে! তারপর দারোগাদের সরু গলি পেরিয়ে কারফর্মাদের কানচের পাশ দিয়ে গিয়ে উঠতে হবে বড় রাস্তা পেরিয়ে একেবারে চন্দরবাবুর বাগান বাড়িতে। সেখেনে কে কার কড়ি ধারে। মালি বেটা পড়ে আছে তাড়ি খেয়ে বেহুঁস।

গিয়ে উঠাও গোল। ও বাড়ির ছেলেরাও আছে—ভুতো ছোট। তারা হাঁক দিলে, "এই মালি, এই মালি!"—জবাব নেই, কাকস্য পরিবেদনা!

শুরু হয়ে গেল খটা-খট্ বাঁশ কাটা!

ঘোষেদের অন্দরের উঠানে জোড়া জোড়া প্যারালাল্ বার বসলো। ডাম্বেল কেনার পয়সা নেই, গঙ্গা থেকে গোল গোল পাথর কুড়িয়ে আনা হ'ল; তোলা-ফেলার জন্যে নাকি, তাতেও জোর হয়; তারপর একটা শো দেখিয়ে কিছু টাকা তুলে হোরাইজোন্‌টাল বারের ট্রাপিসের জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগ্‌লো।

ওদিকে গোরাচাঁদ রায়ের বাড়িতে বিকট উৎসাহে চল্‌চে জিম্‌নাষ্টিক ক্লাব—তাতে রাজ্ দিচ্চে ডেড্-পয়েণ্ট, গ্রেট সার্কল্! এ দলের নেই ফোতের শেষ! কারফর্মাদের বাড়িতে একটা বার খাড়া হ'ল, সেখেনে বাঙালীটোলা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হ'ল। এরা চায় অন্য সব ক্লাবকে ছোট করে দিতে।

প্রতিযোগিতার রেশা-রেশি মনের মধ্যে দিয়ে খরস্রোতা নদীর মতোই দুকূল কেটে বয়ে চলেছে। যাদের অর্থ নেই সামর্থ্য নেই, তাদের একমাত্র সান্ত্বনা যে, কুস্তির চেয়ে কিছুই বড় নেই,—উরুতে তাল ঠুকে, সর্বাঙ্গে গঙ্গামাটির গুঁড়ো মেখে বাঙালীটোলার উদাসীর দল বলতো, "দেখে নেব ওদের একদিন কুস্তিতে—এমন প্যাঁচ কস্‌বো—দেখ্‌বে মজা ওরা!"

ঘোষেদের পোড়ো বাড়িতে মণি-শরতের নেতৃত্বে দেহচর্চার ব্যাপারটি এমনি করেই অগ্রসর হয়েছিল সেদিন।

শরৎচন্দ্রের দেহখানি দেখলেই বুঝতে পারা যেত যে, তাতে একসময়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল, বাঞ্ছিত মত করে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে। দেহখানি কোনদিন মেদাধিক্যে বিড়ম্বিত ছিল না। শরৎচন্দ্র অত্যন্ত স্বল্পাহারী ছিলেন। "শ্রীকান্তে" এই নিয়ে রাজলক্ষ্মীর ক্ষোভ, অভিযোগ এবং অভিমান বোধ করি একান্তই সত্য!

রাজলক্ষ্মীকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য ঘটেনি—তবে যে সব অংশে ঐ অপূর্ব চরিত্রের সৃষ্টির উপকরণ তাঁদের ঐ রকম আক্ষেপ করতে বরাবর-ই শোনা গেছে।

শরৎচন্দ্রের আহার এবং নিদ্রার সংযম ছিল চমৎকার। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, বেশি খেলে আর বেশি ঘুমলে মানুষের বুদ্ধি কমে যায়, আর প্রকৃতি তাদের জানোয়ারের মত হয়। দুপুরে ঘুমোনো শরৎ দু চক্ষে দেখতে পারতেন না। যদি কেউ বলতো,—দুপুরে আপনি ঘুমুচ্ছিলেন বলে আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। শরৎ মনে মনে রাগে জ্বলে যেতেন। খাওয়ার পর খানিকটা সময় কিছুতেই সুস্থির হয়ে বসতে পারতেন না!—সেই সময়ে তাঁর যত সব খুঁটিনাটি কাজ শুরু হয়ে যেত। ফাউন্‌টেন্ পেন মেরামত, ছিপের হুইল পরিষ্কার এবং তাতে বার্ণিশ, বন্দুকের নল পরিষ্কার ইত্যাদি কাজে তাঁর মন ঐ সময়ে নিত্য ধাবিত হ'ত।

অবশ্য, শেষ বয়সে তাঁর—বছর দু-তিন—শরীরটা ভেঙে পড়েছিল। তার আসল কারণটি সম্বন্ধে কোনদিন তাঁর বিস্মরণ ঘটেনি। অনেকদিন নিভৃতে তিনি দুঃখ করে বলতেন, "রক্ত-মাংসের শরীরই তো বটে; ইস্পাৎ দিয়ে তৈরি হয়নি তো! যারা সব আমার সঙ্গে নেশা-ভাঙ্ করতে শুরু করেছিল—মরে-হেজে, না হয় পাগল হয়ে গেছে···বাস্তবিক, অবাক্ হয়ে যাই, মনে-করে—কেমন করে বেঁচে আছি এতদিন। আর না বাঁচাই ভালো।"

"না হে, এখনও সাহিত্যের অনেক কিছু করে যেতে হবে তোমাকে যে!"

"আর করছি! দেখ, আত্মার মনের রস-বোধ কমতে সুরু করেছে; আর, বেঁচে থাকার ইচ্ছে চলে গেছে—বৃথা শরীরের ভার বহন করে লাভ কি?"

ঠিক যে সময় শরৎচন্দ্র দেহ মন প্রাণে যেন কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় বড় হয়ে ওঠার সম্ভাবনাময় অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছিলেন—তখন একদিন মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াবার অবসরও সৌভাগ্যবশে ঘটে গিয়েছিল তাঁর জীবনে।

সেদিন সকাল থেকে বৃষ্টি হ'তে শুরু হয়েছিল।

দক্ষিণ বিহারের বর্ষাকাল যে কত সুন্দর তা বলে শেষ করতে পারা যায় না; বিশেষ করে বোধ হয়, ভাগলপুরের। উঁচু-নীচু রাস্তায় জল দাঁড়ায় না, কাদা জমে না। মাঠ সবুজ হয়ে যায় ঘাসে ঘাসে। পথের দুধারে রাধাচুড়ো ফুটে লালে-লাল! জল বেড়ে গঙ্গার বিস্তার হয় দিগন্তব্যাপী—এক-এক দিন সকালে কাঞ্চনজংঘা দেখা যায় উত্তর-পূবে; আবার সমস্তদিন হয়তো গৌরীশংকর তাঁর মেঘের আচ্ছাদন উদ্‌ঘাটিত করে রইলেন—আর বিকেলে খিড়খিড়িয়া পাহাড়ের পেছনে সূর্যাস্তের সময় রংএর বাহার যে কি মনোরম—তা, না দেখ্‌লে কল্পনায় ধারণা করা যাবে না।

বর্ষায় গঙ্গার স্রোতের শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যায় বহুদূর থেকে। উত্তরের কালো শ্লেটের মত মেঘে বিদ্যুতের লতানো হিজি-বিজি, তারপর অম্বর-মেদিনী কাঁপিয়ে নীল অরণ্যের শিহরণ! রাতের মেঘে বিদ্যুল্লতার তাড়াতাড়ি চোখ-চাওয়া আর চোখ বোজার শেষ নেই! পথ চল্‌তে চোখে ধাঁধা লাগে লাগে! কূলে কূলে ভরে যাওয়া গঙ্গার পাড়ের উপর মাণিক সরকারের শিবের মন্দির—দীননাথ মিশির, প্রদীপ দুলিয়ে ঘন্টা নেড়ে শাঁখ বাজিয়ে আরতি সেরে ছেলেমেয়েদের প্রসাদ বিতরণ করেন—সেই একটি ছোট্ট বাতাসার লোভে নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছি—দূরে দূরে ঢাকাই পালোয়ার চলেছে পাল তুলে, মাল নিয়ে। ছইএর মধ্যে মিটমিটে আলো—আর দাঁড়িয়ে গাইছে বিচিত্রস্বরে—কার করুণ কাহিনী!—কে যেন আস্‌বে বলে চলে গেছে—কে যেন তারই আশাপথ চেয়ে চোখের জলে বুক ভাসায়;—

সে গান শুনে মন হয়ে আসে থমথমে···· হঠাৎ অন্ধকারে বেজে উঠে দূরে আমবাগানে রাজুর বাঁশী !

সেদিন সকালটা এসেছিল ঘন ঘোর হয়ে, কিন্তু বিকেলে গেল মেঘ কেটে। বাগানের বেড়ার ধারে—হলদে, লাল, বেগুনি কৃষ্ণকলি ফুটে যেন চেয়ে রইল—আকাশের তারাদের সঙ্গে রাতে কথা কইবার অপেক্ষায়—এমন সময় কাল-খবর: শরৎকে সাপে কামড়েছে ! ঝড়ে যেমন করে কাশ-গাছগুলো ঝুঁকে পড়ে মাটির উপর, তেমনি করে নুয়ে পড়ল ছোটদের মনগুলো।

বাইরের বাড়িতে জনারণ্য ! কেদারনাথ হরিণের শিংএর বাঁটের চক্‌চকে ছুরিখানি দিয়ে ক্ষতস্থানের রক্ত বার করে স্তিমিত আলোতে দেখ্‌ছেন বিষে সেটা কালো কি না। পায়ের গুছি থেকে উরুত পর্যন্ত যে-যেখেনে পেরেছে বাঁধন দিয়ে দিয়েছে।

লোকে জিজ্ঞেস করছে শরৎকে, "সাপ দেখেছিলি ?"

"হুঁ !"

"কোথায় ছিল ?"

"থাপ্‌রার তলায়······না জেনে পা দিয়েছিলুম······বেরিয়ে ছুব্‌লে দিলে চক্কোর তুলে—তারপর বেঁকে বিষ ঢেলে দিলে।"

"তারপর কি করলি ?"

"মণিমামা পৈতে দিয়ে বেঁধে দিলে···"

কেদারনাথ শরতের হাতে একটু নুনের মত কি দিয়ে বল্লেন, "দেখ্‌তো খেয়ে কি ?"

শরৎ মুখ বিকৃত করে বল্‌লে, "চিনি।"

"আবার দেখ্‌তো"—এবার বিকৃতি নেই···বললে, "নুন।"

পিছনে ভুবনমোহিনী কেঁদে উঠলেন, "ওগো বাবা গো···কি হবে গো··· এ যে কালে কাম্‌ড়েছে বাবা ! নুনকে বলে চিনি·· চিনিকে বলে নুন···ওগো মাগো—দোহাই মা মনসা তোমার···আমার এই খুদ কুঁড়োটিকে ফিরিয়ে দাও মা···তোমার ষোড়শোপচারে পূজো দেব মা···"

সে কান্না শুন্‌লে বুড়োর বুকের রক্তও জল হয়ে যায়

ঘরে মতিবাবু দাঁড়িয়ে হতভম্ব, মুখখানি তাঁর কাঁদুমাদু—কি করবেন জানেন না; বোধ করি ভুবনমোহিনীর কান্নায় যোগ দিতে পারলেই সবচেয়ে হয় সুবিধে, কিন্তু লোকেই বা কি বলবে! আর, গুরুজনেরা রয়েছেন চারিদিকে ঘিরে!

এমন সময় সেই ঘন-ঘটার মধ্যে একটি কালো-বিদ্যুৎ গেল চমকে—আজানুলম্বিত হাত দুখানি নেড়ে রাজু মতিলালকে জিজ্ঞেস করলে—মায়াগঞ্জে আছে খুব ভালো রোজা—নিয়ে আস্‌বো তাকে ডেকে?"

"যাও তো। লক্ষ্মীটি আমার,···কিসে যাবে?"

"আমার ডিঙি আছে—যাবার সময় স্রোত পাব, আসার সময় পাল।"

রাজু ঝড়ের মতোই এসেছিল, ঝড়ের মতোই বার হয়ে গেল।

শেষ রাতে ঘুম ভেঙে জিজ্ঞেস করি, "মা, কেমন আছে শরৎ?"

"ভালরে, সেরে গেছে।"

"আঃ!" পাশ ফিরে সেই যে ঘুমিয়েছি—বেলা আটটা!

মায়াগঞ্জ—মাণিক সরকার ঘাট থেকে দেড়-ক্রোশ দু'-ক্রোশের পথ।

গঙ্গা পশ্চিম থেকে পুবে বয়ে চলেছে, রাজুর যেতে আস্‌তে খুব বেশি সময় লাগেনি নিশ্চয়। বড় জোর ঘণ্টা খানেক।

পরের সমস্ত দিনটাই শরৎ ঘুমিয়ে কাটালে। তারপর দিন—তার কথা শুনে মনে হল বৃদ্ধ কর্তা ফিরেছেন তীর্থ করে বাড়ি! পুরশ্চরণটা সেরে ফেলে গঙ্গাবাসে-ই বাকি দিন ক'টা কাটিয়ে দিতে চান, মহাপ্রস্থানের একান্ত প্রতীক্ষায়। মুখে নিদারুণ বৈরাগ্যের ছাপ—কথায় অসহ্য অকাল পক্বতা!

রবিবারের সকালটা ছুটি থাক্‌তো। সেদিন শরৎ যে কোথায় উধাও হ'ত কিছুতেই ঠিক করা যেত না।

সেদিন বোধহয় মেজাজ সরিফ ছিল, শরৎ বল্‌লে "দেখবি আমার তপোবন?"

ঘোষেদের পোড়োবাড়ির উত্তর দিকে ঠিক গঙ্গার পাড়ের উপরেই, এক খানি ঘরের পিছনে—নিম আর দাঁতরাঙা গাছে একটুখানি জায়গাকে

অন্ধকারে নিবিড় করে রেখেছিল। নিমের গোলঞ্চ, মদনের কাঁটালতার গায়ে গায়ে শাদা তারার মত ফুলে, জায়গাটি এমন করে বেড়ে ছিল যে, তার মধ্যে মানুষ ঢুকতে পারে, এ সন্দেহও করা যেত না। এর সামনে এসে দাঁড়িয়ে শরৎ বল্‌লে "নাঃ, যদি তুমি ফাঁস করে দাও? যদি কাউকে বলে দাও?"

"না, বলবো না শরৎ।"

কিন্তু অত সহজে পার পাওয়া গেল না। পূর্বদিকে ফিরে সূর্যকে সাক্ষী করে বলতে হ'ল কাউকে বলবো না। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই; উত্তর দিকে ফিরে গঙ্গা আর হিমালয়কে সাক্ষী করে বল্লাম, "কাউকে বলবো না।"

তখন অতি সন্তর্পণে লতার পর্দা সরিয়ে যেন এক কল্প-লোকে এসে পৌঁছলাম দু'জনে। সবুজ পাতার মধ্যে দিয়ে সকালের স্নিগ্ধ সূর্যকিরণ সমস্ত জায়গাটিকে একটি অপূর্ব স্নিগ্ধতায় পূর্ণ করে তুলেছিল। চোখ জুড়িয়ে যায়ঃ মনকে নিমেষে শান্ত করে কোন এক স্বপ্নপুরীতে উত্তীর্ণ করে দিলে!

প্রকাণ্ড একখানা পাথরের উপর উঠে বসে শরৎ স্নেহ ভরে ডাক দিলে "আয়!" পাশে বসে নীচে চেয়ে দেখলাম খরস্রোতা গঙ্গা বয়ে চলেছে। দূরে,—গঙ্গার ও-পারে নীলাভ গাছপালার ধোঁয়াটে ছবি, পাতার ফাঁকে ফাঁকে চোখে এসে পড়ে। ঠাণ্ডা হাওয়া ঝির ঝির করে বয়ে মন-প্রাণকে পুলকিত করে!

এইখেনে ব'সে, শরৎ বললে, "এখেনে আমি সব বড় বড় কথা ভাবি।"

"তাই বুঝি তুমি অঙ্কতে একশোর মধ্যে একশোই পেয়েছ?"

"দূৎ," বলে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি!

ফেরার সময় বললে, "কোন দিন এখেনে একলা এসো না কিন্তু।"

"কেন?"

"ভয় আছে।"

"ভূত?"

"ভূত-টুত কিছু নেই।"

"তবে?"

"বড় বড় সাপ আছে।"

এগার

গতানুগতিকের চিরাচরিত উপায় এবং পথে বড় হয়ে ওঠার সাধ শরৎচন্দ্রের ছিল এবং থাকাও একান্ত স্বাভাবিক। লেখা পড়ায় ভালো হয়ে চারিদিকের বাহবা পাওয়ার ইচ্ছা, কি আকাঙ্ক্ষা একটি দশ-বারো বছরের ছোট ছেলের পক্ষে না থাকাই ছিল সেকালের বিচারে শুধু বিস্ময়কর নয়, এক গুরুতর অপরাধ, বিশেষ ক'রে এই গাঙ্গুলিবাড়িতে।

তখনকার দিনে ছেলেদের উঠ্‌তে বসতে রাজা শিবচন্দ্রের গল্প শোনা প্রায় একটি নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ ছিল। পরান্নে, এবং পর-গৃহে পালিত শিবচন্দ্র আলোর অভাবে রাস্তার ল্যাম্প-পোষ্টের তলায় পড়া মুখস্ত করতেন। একথা অভিভাবকদের বুলির মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার, সেই শিবচন্দ্র যখন জুড়িগাড়ি চড়ে, ওয়েলার ঘোড়ার দৃপ্ত পদ-ধ্বনিতে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যেতেন, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিস্ফারিত লোচনে সেই নব্য রাজ দর্শনে নিজেদের ধন্য মনে করত এবং নবীনের দল ভাব্‌তো: কবে আমিও ওম্‌নি হব! নিজের অধ্যবসায়, বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে শিবচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন সেদিন ছোট শহরটির প্রত্যেক ছাত্রের অনুকরণের মানুষ!

সূর্যনারায়ণ সিংহের প্রজ্ঞা ধীর ছিল। ওকালতি করে তিনিও ধনকুবের হয়েছিলেন সত্য; কিন্তু সে-সবই বহুদিনের দীর্ঘ-প্রচেষ্টার বিলম্বিত এবং বোধগম্য সমাহার! কিন্তু শিবচন্দ্রের বুদ্ধির গতি ছিল বিদ্যুৎ-উদ্দাম এবং সর্বতোমুখী। তাঁর ধর্ম এবং নীতির উদারতা ছিল আকাশের মত মুক্ত এবং রহস্যময়। তাঁর মননের দৃঢ়তার চুম্বকে ঈপ্‌সিত বস্তু লৌহ-চূর্ণের মতই স্বতঃ-আকৃষ্ট হ'ত! তিনি ছিলেন যাদু-বিদ্যাবিশারদ বাজিকরের মতো অঘটন ঘটাবার পাকা ওস্তাদ! তাই, সেদিনের উদীয়মান যুবকদের পরম প্রিয় পার্থ-সারথি ছিলেন শিবচন্দ্র।

নিঃস্ব অবস্থার রিক্ততা থেকে মানুষ কেবল লেখা-পড়ার জোরে কি-যে করতে পারে তা' নিঃসন্দেহে শিবচন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাই, নিঃস্ব দরিদ্র

ছাত্রেরা সেদিন, সেই উৎসাহের জোরে নিজেদের মধ্যে শত হস্তীর বলের উদ্দীপনা পেয়ে প্রাণবান হয়ে উঠ্‌ত।

যোগেশচন্দ্রের কাঁচা বিদ্যের এঁচোড়টিকে অক্ষয় পণ্ডিত কিলিয়ে ছাত্রবৃত্তিতে উত্তীর্ণ করে দিলেও শরৎচন্দ্র নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে নিজের অক্ষমতার পরিমাণ বুঝতে এক মুহূর্তের জন্যেও কোনদিন ভুল করেন নি। নিজের সম্পর্কে এতবড় সাবধান হুঁসিয়ার অল্পই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। দাম্ভিকতার ঠিক উল্টোটাই ছিল শরৎচন্দ্রের চরিত্রের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। নিজের সম্বন্ধে একটুও বড়ো ধারণা করতে জান্‌লে তাঁর সাহিত্যিক-জীবন বহু আগেই আরম্ভ হতে পারতো।

ইংরেজি ইস্কুলের নিচের ক্লাশে ভর্তি হয়ে শরৎচন্দ্র কায়মনোবাক্যে আগের দিনের ফাঁকির গহ্বরকে পূরণ করে তোলার জন্যে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। অন্য বাইরের দিকের দু'একটি কথা বলা যাক্‌ :

বিন্ধ্যবাসিনীর অর্থাৎ দিদিমার ঘরের পশ্চিমের দালানের উত্তর অংশ শরৎচন্দ্রের স্টাডি কিনা পড়ার ঘর হ'ল। একটি চৌকি, তার উপর একখানি বালাপোষ মাদুর। পশ্চিমের জান্‌লার সাম্‌নে একটি ডেক্‌সো।—চাবি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া যায়। তার মধ্যে বই, খাতা, দোয়াত-কলম, পেনসিল, রবার, আর সবচেয়ে প্রিয় একখানি ক্ষুরধার রজার্সের এককলা ছুরি।

শরতের বইগুলি ছিল ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, কালি-ফেলা নোংরা জিনিস সে দুচক্ষে দেখতে পারতো না। খাতাগুলি নিজের হাতে পরিপাটি করে পাতাকেটে বাঁধানো, দেখ্‌লে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হ'ত, মানুষটি সুন্দরের জন্যে নিজের মেহনতের কিছুমাত্র কার্পণ্য করেনি। মনে হ'ত, মানুষটির তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধ আছে, আর মনে হতো, পরিচ্ছন্নতা যে সৌন্দর্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ তাও সে ভালো করেই উপলব্ধি করেছে।

সেদিনের ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষা ছিল মা দুর্গার মহাষ্টমীর সন্ধি-পূজার মত সুকঠিন। পাটিগণিতে পারদর্শী হ'তে হবে। সাহিত্যে ব্যাকরণ-বিশারদ হওয়া চাইই চাই। আবার সে ব্যাকরণ লোহারামের পাণ্ডিত্যে লৌহকঠিন।

সে একটি সংস্কৃতের গো-বাগী ; মূর্তিও নয় বটেরও নয়। তারপর, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, শরীর পালন, সে কতো-কি! ইংরেজি বাদ দিয়ার জন্ত ব্যাপারটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল কাঠিন্যের চক্রব্যূহ! মাতৃ-ভাষার প্রতি প্রেমের এতবড় নিষ্ঠুর প্রতিশোধের পরিকল্পনা যাঁদের মাথা থেকে উদ্ভাবিত হয়েছিল তাঁরা যে শিশুমেধ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করে বসেছিলেন, সেটি তাঁদের পাণ্ডিত্য-গৌরবে হয়তো মনেই পড়েনি।

যাক্ সে কথা। ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষা পাশ করে সর্ব-বিদ্যাবিশারদ হয়ে শরৎচন্দ্রের যখন ইংরেজি স্কুলের তুচ্ছ রয়েল রিডার নম্বর দুই ছাড়া আর কিছুই পাঠ্য রইল না, তখনই "হরিদাসের গুপ্ত-কথা" জাতীয় অমূল্য সাহিত্য-গ্রন্থগুলি অবশ্য-পাঠ্য হয়ে দাঁড়াল সেদিনের নিতান্ত বেকার অবস্থায়। বলা বাহুল্য যে, ঐ বয়সে মাছির উপর মাকড়সা কি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বর্ণনা আর তেমন মুখরোচক হয় না। আর মতিলালের কল্যাণে বটতলার বইগুলি আনাগোনা করতই এই বাড়িতেই এবং সেগুলি চুরি করে পড়ে নেওয়ার অবসর এবং চতুরতা যে শরৎচন্দ্রের ছিল তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

এই চুরি করে পড়ার ফল ভালো কি মন্দ হয়েছিল তা' সুধীজন-বিচার্য। শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে, হয়তো মন্দ কিছুই হয়নি।

বছরের শেষে ফার্ষ্ট হয়ে শরৎ ডবল প্রমোশন পেলেন! চেলা-চামুণ্ডার দলে হরি-ধ্বনি পড়ে গেল ; বন্ধু-বান্ধবেরা তাকে সমঝে চলতে লাগলো এবং বড়রাও তার সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে উঠলেন।

এই ক্লাশে বিশ্বেশ্বররাম বলে মাষ্টারমশাই ছিলেন। তাঁর নাম করলেই ছেলেদের হাড়ে পর্যন্ত ভয়ের কাঁপুনি লাগ্‌তো।

তখন চলছিল স্পেয়ার দি রড্ এণ্ড স্পয়েল দি চাইল্ডের বেত্র যুগের প্রতাপময় মধ্যাহ্ন! ধূমকেতুর মত দীর্ঘ শিখি-পুচ্ছ সমন্বিত খেজুরের ছড়ি কার পিঠে যে কখন পড়ে তা' কেউ জানে না। আঘাতের চেয়ে অপমানকেই শরৎ সত্যি ভয় পেতেন। তাই, প্রথমদিন থেকেই শরৎ ভিজে-বেড়ালের ছদ্মে ভালো ছেলের ভূমিকায় বিশ্বেশ্বররামের মন হরণ করার সমূহ চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু এটিও বাহ্য। আত্মরক্ষার সম্মানজনক ভদ্রচেষ্টা মাত্র। বিশ্বেশ্বর-রামের বেত্র-বর্ষণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বেঞ্চি তুলে তাঁরই মাথায় নিক্ষেপ করার মতোও চাটুয্যে-নন্দন ক্লাশে ছিল না যে সেদিন, তাও নয়; কিন্তু শরৎ সে পথকে সর্বান্তঃকরণে দূরে রেখে সত্যিকার ভালো ছেলে হয়ে ওঠার একটি আন্তরিক চেষ্টায় উদ্বোধিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তারও সাক্ষ্য-পরিচয়ের অভাব ঘটেনি।

অবসর সময়ে গোপনে সাহিত্য-চর্চা করলেও শরতের মন অধ্যয়ন ব্যাপারে বিন্দুমাত্র শিথিল হ'ত না। রবিবারের দুপুরে তার ম্যাপ আঁকার তোড়জোড়ের জোগাড় দিতে হ'ত ছেলেপুলেদের। হলুদ, শিম-পাতা, সিঁদুর, মাজেণ্টা, ও নীল বড়ি আর বেগুনি রংএর ঢেরি লাগ্‌ত তার ডেকসোর নীচে। সুবিধে হলে অঘোরনাথের নকসা আঁকার সাজ-সরঞ্জামও বেমালুম সরে আস্‌ত সুরক্ষিত "শালখেটের" দেরাজের থেকে, কুসুমকামিনীর অজ্ঞাতেই।

মোটা পুরু কাগজের উপর সোমবারের সকালে যে ম্যাপখানি তৈরী হত তা দেখে ছেলের দল তো বিমুগ্ধ হ'তই এবং বিকেলে বিশ্বেশ্বররামের তেড়াবেঁকা হরপের লাল পেন্সিলে "ভেরি গুড" দাগ দাগা হয়ে তা দেয়ালের গায়ে জায়গা পেয়ে শরতের কৃতিত্ব সে সপ্তাহের বিজয় ঘোষণা করত।

এমনি করে বালক শরৎ সেই সময় ক্লাশের সর্ব-শ্রেষ্ঠের খ্যাতি অটুট রেখেই পড়া-শুনার পথে অগ্রসর হ'য়ে চলেছিলেন।

কিন্তু বিধাতাপুরুষের প্রস্তাব অন্যতর হ'ল!

দেশ থেকে ফিরে আসার দিন বাঙ্গালীটোলার মোড়ের উপর মেয়ে-বোঝাই ঘোড়ার গাড়িখানা উল্‌টে নালার মধ্যে পড়ার পর থেকে বিন্ধ্যবাসিনী আর কিছুতেই আরোগ্য হ'তে পারলেন না। ভাগলপুরের ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে। সে-একটা বড় রকম ব্যয়ের ব্যাপার। তার ওপর, অমরনাথের বড় মেয়ে সুরবালার বিয়ের বয়সও হয়ে পড়েছে। পিতৃহীনার বিবাহে বিলম্ব হওয়াও একটা অতি অবাঞ্ছনীয় কথা। তাই, কেদারনাথ দিনকতকের জন্যে গিয়ে হালিসহরে বাস করাই

স্থির করলেন। সেই ব্যপদেশে কোথাও তো ব্যয় সংক্ষেপে করতেই হয়। অতএব মতিলালকে নিজের পরিবার নিয়ে অন্তত কিছুদিনের জন্য দেবানন্দপুরে বাস করার আদেশ দেওয়া ছাড়া তাঁর পক্ষে অন্যগতি ছিল না। যাওয়ার দিনও স্থির হয়েছিল।

সেদিন কিসের হাফ্ ইস্কুল হয়েছিল। শরৎ বাড়ি ফিরে এসে বললেন, "চল্, পুরোনো বাগানে বেড়িয়ে আসিগে।" তখন ফল-ফুলুরির সময় নয়; কিন্তু ঘন ছায়াচ্ছন্ন বাগানে নিস্তব্ধতার মধ্যে সময় কাটাতে সত্যিই আমাদের খুব ভালো লাগ্তো, বিশেষ করে শরতের সঙ্গে। আসন্ন-বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় তাঁর মনটি ছিল বিষাদ-ভারাক্রান্ত। মনে হ'ল যেন শরতের মনের কথাও কিছু বলার ছিল। দু'জনে পথে বেরিয়ে গেলাম, এক মিনিট সময় না নষ্ট করে।

বাগানে, প্রিয় গাছগুলোর কাছে কাছে বেড়িয়ে বেড়িয়ে শরৎ যেন মনে মনে তাদের নিকট বিদায় নিতে লাগ্লেন। ঠিক তেম্নি ভাবটা—"হয় কি [illegible] দেখা, ফিরি কি না ফিরি!"

অবশেষে একটা গাছের ডালে ঘোড়ার পিঠে বসার মত করে দুজনে মুখোমুখী বসে অনেক গল্প হ'ল। ভাগলপুর তাঁর কত ভালো লাগে; পাথর-ঘাট থেকে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যে কি মজাই না আছে! ইত্যাদি ইত্যাদি।

সবের পর সে বিদায়ের বেদনাটিকে চাপা দেবার জন্যে যে একটা আজগুবির অবতারণা করেছিলেন শরৎ তা'ও আজ মনে পড়ে। নিজেকে না প্রকাশ করার জন্যে তিনি চিরদিনই এমনি করে মায়াজাল বিস্তার করে শ্রোতাকে আসল কথাটি ভুলিয়ে দিতেন।

শরৎ বল্লেন, "গাছে চড়াটা ভারি দরকারি।"

"কেন?"

"মনে কর্ একটা বনের মধ্যে হঠাৎ রাত হয়ে গেল। চারিদিকে বাঘ-ভাল্লুক ডাক্চে—তখন? গাছে চড়তে না জান্লে কি বিপদ! প্রাণ রাখাই যে দায়…"

"কিন্তু যদি পড়ে যাই ?"

"পড়বি ? প'ড়বি কেন ? এই দেখ্…"

শরৎ কোঁচার দিকটা দিয়ে নিজের দেহটি গাছের সঙ্গে বেঁধে বল্লেন, "এমনি করে সারারাত কাটিয়ে দিতে পারি।"

ভরসা ছিল শরৎরা শীঘ্রই ফিরবেন : কিন্তু যত শীঘ্র আশা ছিল—তত শীঘ্র ফেরেন নি।

তাঁদের ভাগলপুর ছেড়ে চলে যাবার আগে সবচেয়ে বিচলিত হ'য়েছিলেন ভুবনমোহিনী। সেদিন তার কারণ বুঝতে পারিনি। মতিলালের স্তব্ধ-গম্ভীর ভাব। আজ বুঝতে পারি, সে স্তব্ধতা, সে গাম্ভীর্য কত বড় বিরাট বৈরাগ্যের পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মতিলালের মধ্যে মানুষটি কোনদিন পরিণতি লাভ করেনি। ছেলেবেলায় মার আঁচলের আড়ালে কেটেছিল দিনগুলি তাঁর দুঃখ-সুখের ভাবাবেগ ! তারপর কৈশোর-যৌবন থেকে শ্বশুর বাড়ির ছায়ার আওতায় এবং ভুবনমোহিনীর সেবাযত্নে কোনদিন তিনি সাবালকত্ব লাভ করতে পারেন নি। মতিলালের মধ্যে কাব্য এবং দার্শনিকের ভাব-তন্ময়তার অপূর্ব সমাবেশের নিখুঁত ছবিটি দেখ্তে পাই শ্রীকান্তের ব্রজ-কল্প নির্গুণত্বে—যাঁর ব্যাজস্তুতি করে গেছেন কবি রায়গুণাকর এক কথায় : 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।'

এখন শরৎচন্দ্রের কথা বলি।

কৈশোর থেকে যৌবনে পা বাড়াবার জীবনের এই মহা সন্ধিক্ষণের সময়টিতে তাঁর দাঁড়াবার পর্যন্ত ভূমিটুকু অপসৃত হয়ে গেল। এ বিধাতা পুরুষের চক্রান্ত ছাড়া আর কি ? সেকালের একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শে গাঙ্গুলি বাড়ির মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব ছিল না কোনদিন। কিন্তু দেবানন্দপুরে সব চেয়ে মুস্কিল হ'ল এই নতুন মানুষগুলির উপবাস এবং অনশনের নিরানন্দ।

মতিলালের চাক্‌রি অনুসন্ধানের কাহিনীটির ছবি দেখ্তে পাওয়া যায় শরৎচন্দ্রের "বড়দিদির" সুরেন্দ্রনাথের চাক্‌রি খোঁজার সশঙ্ক প্রচেষ্টার করুণ

ব্যর্থতায়। চাকরি খোঁজা চলছে দিনের পর দিন। চাকরি না পাওয়ার দুঃখের মধ্যেও বড় স্বস্তি যে, যার কাছে চাকরি পাওয়া যেতে পারতো তার সঙ্গে কপালগুণে দেখা না হওয়াটাই! শরৎচন্দ্র বাস্তব থেকে কি করে সাহিত্যের শাশ্বতে যেতে শিখেছিলেন, তার মূল্য যে কত বড় করে দিতে হয়েছিল সেদিন, তাঁর হদিস্ হয়তো দেবানন্দপুরের এই বছর কয়েকের প্রতিদিনের মর্মন্তুদ কাহিনীর মধ্যে নিহিত আছে।

স্কুলে ভর্তি হ'লেও মাসে মাস স্কুলের মাইনে জোটেনি। শালঙ্কারা ভুবনমোহিনীর অলঙ্কারগুলি একের পর এক করে অর্ধ থেকে সিকি মূল্যে উত্তমর্ণের ঘরে গিয়ে পৌঁছনর পর, মতিলালের পৈতৃক বাস ভিটাও ঋণ দায়ে ধনীর জঠরে স্থান পেয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের বোধবিবেচনা সাধারণ ছেলের চেয়ে তীক্ষ্ণ এবং তীব্র ছিল। তাই সহপাঠীদের বাড়ি এক মুঠো খেয়ে তাদের সঙ্গে স্কুলের পথে গিয়ে দিনমান কাটতো গাছ তলায়, দুষ্ট ছেলেদের সংসর্গে!

সেই সময় নিষ্কর্মা শরৎচন্দ্র রেলগাড়ি যাওয়ার শব্দ পেলে দূর থেকে একটি লাল ছাতি দেখিয়ে গাড়ি চলা বন্ধ করে দিয়ে অপার আনন্দে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে কয়লার চাঙড় থেকে আত্মরক্ষা করে নিজের সঙ্গীদের আনন্দ বর্ধন করতেন।

ইংরেজি ১৮৯২ সালের ১লা জনুয়ারিতে ভট্টপল্লীর গুরুগৃহে কেদারনাথ সন্ন্যাস রোগে দেহ রক্ষা করেন। বছরখানেক পূর্বেই বিন্ধ্যবাসিনী দুরারোগ্য পীড়ায় হালিসহরে অন্তকাল প্রাপ্ত হন। এর পর, দেবানন্দপুরের দারিদ্র্য দুর্দশা সহের সীমা অতিক্রম করে।

স্বনামধন্য সলিসিটর গণেশচন্দ্র চন্দ্র এই সময় একদিন কাশী কি গয়া থেকে ক'লকাতায় ফিরছিলেন। তাঁর প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে একটি বছর বারো চোদ্দ বয়সের ছেলে উঠে পড়ে। পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারেন তিনি যে, ছেলেটি অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে ক'লকাতা চলেছে। স্নেহ-সম্ভাষণের দ্বারা তিনি অবশেষে জানতে পারেন যে,

ছেলেটি তাঁর অনেক বন্ধুর নাতি। অক্ষয়নাথ দেশপ্রেমিক বিপিনবিহারীর পিতৃদেব, তিনি তখন দুর্গাপিথুড়ির গলিতে বাস করতেন। শরৎচন্দ্রকে তিনি অক্ষয়নাথের বাসায় পাঠিয়ে দেন।

এমন বহু গল্পই প্রচলিত আছে, সেগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, শরৎচন্দ্র নিজেই সেগুলির উৎপত্তি স্থল।

দারিদ্র্যের নির্দয় পীড়নে শরৎচন্দ্র নাকি যাত্রারদলেও প্রবেশ করেছিলেন। পায়ে হেঁটে পুরী যাওয়ার গল্পও বহুবার করতে শুনেছি তাঁকে। এগুলির সত্য-মিথ্যা অনুসন্ধানের বিষয়। পুরীতে নাকি তিনি গণিতবিদ্ কে, পি, বসুর গৃহে আশ্রয় পেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের জীবনীকারের এই সকল তথ্যের সত্য-মিথ্যা নিরূপণের একান্ত প্রয়োজন আছে। বিলম্বে কাজটি ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠবে এবং যাঁরা এ সব কথা জানেন বা যাঁদের জানা সম্ভব, ক্রমেই তাঁদের অভাব ঘটা বিচিত্র নয়।

বার

শরৎচন্দ্রের প্রকৃতিগত উদ্দামতা প্রতিনিবৃত্ত হয়ে শিষ্টতার পথ ধরেছিল ভাগলপুরে; কিন্তু দেবানন্দপুরে সে-সব বন্ধন শিথিল হয়ে দুর্জয় অভিমান আর ক্রোধের বজ্রাগ্নিতে সমুত্থিত হয়ে উঠল। ও বয়সে তাই হওয়াই স্বাভাবিক! অভিমানে মানুষ মরিয়া হয়ে উঠে, তখন আর দিক্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না।

মতিলালের অক্ষমতা ভাগলপুরে ছিল মামড়ি ঢাকা ঘায়ের মত। ভুবনমোহিনী মাকুর মত সঞ্চালিত হয়ে দিকে দিকে সেবার যে জমাট পরিতৃপ্তির ঠাস্‌বুনুনি রচনা করতেন তা' অভাবের তাড়নায় শুধু ব্যর্থ হয়ে গেল না; ক্ষোভের গ্লানিতে তিক্ত হয়ে উঠ্‌ল। ভুবনমোহিনীর তাগিদের ভয়ে মতিলাল বেশির ভাগ সময় বাড়ি-ছাড়া হয়ে থাক্‌তেন। মনের দুঃখকে চাপা দেওয়ার যে-সব অ-বিধির বিধি—তাকেই আশ্রয় করা ছাড়া এই অকর্মা মানুষটি আর পথই খুঁজে পেলেন না।

শুধু অবলা, বাড়ির বুড়ো ঠাকুরমাটি! তিনি নিজেকে 'শরৎ'-জননী কল্পনা করে প্রতিবেশীর কাছে মাথার চুল পর্যন্ত বিলিয়ে, অবশেষে চক্ষু মুদ্রিত করলেন।

আজ দেবানন্দপুর, শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি বলে ধন্য! সেই জন্মভূমিই একদিন এই পরিবারের রক্ত এবং অশ্রু ধারায় সিক্ত হয়েছিল। পাথরের ফলকে সেই দুঃখের ছাপ যারা দেখতে পায়, তারা উল্লাসে বিকশিত হয়ে উঠতে কিছুতেই পারে না!

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেবানন্দপুরে গিয়ে এই কথা মর্মে মর্মে অনুভব করতে হয়েছিল একদিন। কেবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস,—আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস! কিন্তু চাপা মানুষটি নিজের অন্তর্বেদনা গোপন করার জন্য লাইব্রেরি-বাড়িতে আর একটি অট্টালিকায় নিয়ে গিয়ে বললেন, "এই আমার সেই ছোড়দার বাড়ি!"

ছোড়দার গর্বে শরৎ পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তার মধ্যেও কোথায় যেন নিবিড় অভিমানের ব্যথা!

ফিরতে ফিরতে বললেন, "মনে করি এক-একবার আমাদের বাড়িখানা—যত টাকাই লাগে, কিনে ফেলি!"

"কেন কেনো না?"

"ভাবি, কি-ই বা হবে! বিস্মৃতির আড়ালে যে কথা চাপা পড়ে গেছে তাকে জাগিয়ে তুলে কি যে লাভ হবে, তাও বুঝে উঠতে পারিনে!"

শরতের উজ্জ্বল দুটি চোখে জল এসে পড়ে আর কি!

কিন্তু দেবানন্দপুরের অপরাধ কোথায়?

অপরাধ খোঁজে ছোট্ট মন। শিশু মাটিতে পড়ে গিয়ে মনে করে মাটিই আঘাত করেছে তাকে। প্রাপ্ত-বয়স হাসে, শিশুর অর্বাচীনতা দেখে!

সেদিনও, দেবানন্দপুরের তরুণ বন্ধুরা এসে বললেন, "লাইব্রেরীতে কিছু বই দিতে হবে যে…"

"দেবো, সে আর বেশি কথা কি?—ঐ খোকাকে বল,—ও দেখে শুনে দেবো।"

"আমরা গ্রাম-সংস্কার করছি,—[illegible] ছেলেদের দল মিলে গাছ কাটি, রাস্তা-ঘাটের উদ্ধার করি…"

"বেশ, বেশ, এই তো চাই।"

দই এর দাম দিয়ে তারা হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে যায়।

শরৎ জোয়ারথাবার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসেন

"হাসো যে ?"

"ওরা তাহলে আমি খুব খুশি হয়েছি…"

"আমিও তো তাই ভাবি !"

"কেন ?" বলে শরৎ উঠে বসেন খাড়া হয়ে।

"তোমার জন্মস্থান—তার ওপর তোমার তো কর্তব্যও বটে… "

"সে ঋণ আমি বহুদিন আগে শোধ করেছি।"

"কবে করলে ? কৈ আমাকে তো বলনি কিছু, কোন দিন !"

"কাউকে তো বলিনি,"—বলে শরৎ হাস্‌লেন।

"অসম্ভব চাপা মানুষ কিন্তু তুমি !"

"সে-কথা কাউকে বলা যায় না ; কিন্তু তুমি জান।"

"জানি ? হেঁয়ালিতে কথা কইতে লাগ্‌লে যে !"

"মনে করে দেখ, অনেকদিন সে কথা তোমায় বলেছি।"

চিন্তিত হ'য়ে ভাব্‌তে লাগলুম। "নাঃ, কৈ মনে তো পড়ে না…"

"ধরিয়ে দিলে মনে পড়বে। 'চরিত্রহীন' রিভাইজ্‌ করার সময় তোমার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল আমার। তুমি কিরণময়ীর শেষের ব্যাপার বদলে দিতে বলনি ?"

"তা হবে ; সে তো তোমাকে আগাগোড়াই, চিরদিনই বলে এসেছি কিন্তু তোমরা ভীষণ কন্‌সারভেটিভ !"

"আমরা মানে ?"

"তুমি, রবীন্দ্রনাথ আর বঙ্কিমচন্দ্র—তোমরা সমাজকে ভয় কর।"

"ওটা তোমাদের ভুল।"

"ভুল নয় শরৎ, একদিন এর জন্যে তোমরাও ক্ষমা পাবে না।"

"কিরণকে বদলালে যে সুরবালাকেও বদলাতে হয়।"

"কি দোষ করলে সুরবালা বেচারি ?"

"দুজনেই একই!"

"অবাক করলে ভাই!"

"ঐ তো! তোমরা বিশ্বাস করতে চাও না। দাদামশাই বলতেন একটা ভারি ঠিক কথা: ওদের ফিকস্‌ড্‌ মাইন্‌ড্‌; যা' একবার ভেবে ঢুকেছে তা থেকে এতটুকুও, একচুলও, নড়বে না। ওইখানে আমাদের দুজনের ছিল ভারি মনের মিল!"

"যাক্ তাঁর কথা এখন—আজকের বিষয়টা আগে শেষ কর।"

খানিকটা চুপ্ করে শরৎ বললেন, "অল্পবয়সী ছেলেরা তাদের চেয়ে ঢের বেশি বড় বয়সের মেয়েদের কাছে,—ঐ সুরবালাই, আমার প্রবৃত্তির দিকটা জাগিয়ে দেওয়ার গুরু ছিলেন। ও চরিত্রটির বাইরের দিক আঁক্‌তে আমার প্রায় কিছুই পরিশ্রম করতে হয়নি। সতী, সাধ্বী, স্বামীর উপর যেমনি ভক্তি, তেমনি ভালোবাসা, তেমনি আকর্ষণ। আর শেষও হ'ল তেমনি—চারিদিকে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল: অমন আর হয় না! স্বামীর পায়ে মাথা রেখে সুরবালাও চলে গেল! কিন্তু—কিরণময়ীকে আমি তারই,—মানে সুরবালার, শিক্ষায় যে জ্ঞানলাভ করলাম, সেই উপকরণ দিয়েই গড়ে তুলেছি।—ওতে যদি কোন ভুল থেকে থাকে তো সে নিছক আমারই। সুরবালার আগাগোড়া কন্‌ট্রাস্ট্ করতে গিয়ে, ঐ রকম করতে বাধ্য হয়েছি······মোট কথা, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার যে সজাগ্রতা দেখ্‌তে পাও,—সে ঐ সুরবালার জন্যে। তাঁকে আমি চিরদিন শ্রদ্ধা করে এসেছি···গুরু-দক্ষিণা আমার ঐ চরিত্র-চিত্রণ।

"তাই বলেছিলাম—দেবানন্দপুরে জীবনের সব চেয়ে বড় কথা যাঁর কাছে শিখেছি—যাঁর জন্যে ও-দেশকে এত ভালবাসি—তাঁর ঋণ শোধ আমার করা হয়ে গেছে!··জন্মভূমি বলে হৈ-হৈ করা আমার স্বভাব নয়।—নিজেকে বড় করে ভাবলে লোকে তার জন্মভূমিকে বড় করে তুলতে চায়। দেখ্‌লে না, এত বয়সেও আমার আত্ম-জীবন-চরিত লেখার সাহস হ'ল না। ও ধৃষ্টতা আমি কোন দিনই করব না!"

শরৎচন্দ্রের উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বড় ছেলেদের কর্ম-প্রেরণায়; কোন বিশেষ দেশ কি স্থান অবলম্বন করে নয়। ঠিক দেবানন্দপুরের গ্রাম-সংস্কারের:

প্রতি কোন মোহ ছিল না তাঁর। কিন্তু দেশের [illegible] জন্য তিনি লিখে এবং মুখে যুবকদের চিরদিন উৎসাহ দিতেন।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে:

সে [illegible]; জনকয়েক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হয়েছেন।

"কি চাই আপনাদের?"

"ইস্কুলের জন্যে একটা মোটা চাঁদা।"

"কোন্ ইস্কুল?"

"আপনি যেখান থেকে ছাত্র-বৃত্তি পাশ করেছিলেন।"

শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, "দেখুন ঐ ইস্কুলের সব চেয়ে বড় অগৌরব যে আমি একদিন ওখানে ছাত্র ছিলাম। আমাকে আপনারা মার্জনা করবেন, আমি কিছু দিতে পারব না।" তাঁরা অবাক হয়ে চলে গেলেন।

চলে গেলে শরৎ বললেন, "ইস্কুলের দরকার আছে, স্বীকার করি; কিন্তু একশো দিলেও যার অভাব ঘুচবে না,—তার আর প্রয়োজন আছে বলে বিশ্বাস হয় না। পাঁচ-ছ'হাজার বাঙালী যার দুঃখ দূর করতে পারলে না—একা আমি তার কি করব?

সামতার শিশু-বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয় দিতে যেতে উঠ্তেও আবার তাঁকে দেখা গেছে। মেয়েদের দিকে শিক্ষার সর্ব-তত্ত্ব সমন্বিত একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছেও তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠছিল। সংস্কার তিনি সর্বাঙ্গ-করণে চাইতেন, সমগ্র দেশের।

উদার চিত্ত-বৃত্তির উচ্ছৃঙ্খল বিক্ষোভ, পারিবারিক অননুকূলতা, এবং তীব্র অভিমান শরৎচন্দ্রকে জীবনের বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল, দেবানন্দপুরে। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তরুণ সৈনিক সেদিন জীবনের খর-স্রোতে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন বোধ ছিল না, বিবেচনা ছিল না। নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়ার উত্তেজনায় [illegible] গাঁজা-তাড়ির আড্ডায়, চোর-ডাকাতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে [illegible] ঘুরে,—[illegible] জীবনের যে পাঠ

[illegible] সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের কারবার আদৌ ছিল না।

একদিন যে সব কথা বলতে তাঁর মনে কোন দ্বিধা-বাধা ছিল না, শেষ-জীবনে তিনি মনে করতেন যে সেই সব কাহিনী তাঁর বহু যত্নে অর্জিত সাহিত্যের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করে—তাঁকে লোকের চোখে ছোট করে দেবে। তাই তিনি শুধু নীরব হয়ে যেতেন না,—সে কথার উল্লেখ করলে তাকে পরিষ্কার অস্বীকার করতেন।

কিন্তু দেবানন্দপুরের ঋণ তাঁর জীবনে অপরিশোধ্য ছিল। যেমন শরৎচন্দ্রের চরিত্র এবং জীবনের অভিব্যক্তি বুঝতে হ'লে ভাগলপুরকে ঠিক করে না জানলে সব জানাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়; তেমনি দেবানন্দপুর তাঁর প্রবৃত্তির তান্ত্রিক-সাধনার যজ্ঞ-বেদী ছিল। সেখানে শরৎচন্দ্র প্রবৃত্তির বাম হস্ত দিয়ে আহরিত গরল পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন; কিন্তু সেই সাধনের প্রাণান্ত চেষ্টায় যে স্পর্শমণি তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল—তারই স্পর্শে তিনি নিজে হয়েছিলেন সোনা—এবং তারই প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছিল সাহিত্যের আদর্শ-মুকুরে। বুদ্ধদেবের গয়ার মত দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্রের সাধনা-ক্ষেত্র আবার রেঙ্গুনেই তিনি ঐ ব্রতের উদ্‌যাপন করেছিলেন।

তাঁর জীবনের এই দুটি যুগের তথ্য-সংগ্রহ করা সহজ নয়। শরৎচন্দ্র সহজে মনের দ্বার খোলার মানুষ মোটেই ছিলেন না। তাঁর অভিনয় করার শক্তিও ছিল অপরিসীম; মিথ্যাকে সত্যে রূপায়িত করার শক্তিও অপরিমেয়। বহুদিনের সান্নিধ্যেও তাঁর মনের গবাক্ষ অতি অল্প সময়ের জন্য উন্মুক্ত পেয়েছি। তাই শরৎচন্দ্রের নিকটতম হবার অবসর পেয়েও এমন স্পর্ধা নেই যে বলি, তাঁকে ঠিক করে জেনেছি।

যেমন স্টীম-ইঞ্জিনের বাষ্প যথারীতি নিয়ন্ত্রিত না হ'লে মানুষের কাজে লাগেনা, তেমন শরৎচন্দ্রের প্রবৃত্তির উদ্দাম শক্তি নিয়ন্ত্রিত হ'ত ভাগলপুরে এবং ভুবনমোহিনীর বাৎসল্য এবং স্নেহ-ধারায়। উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর গাঙ্গুলিবাড়ির নিয়মের লৌহ-দুর্গে ছিদ্র খুঁজে পেত না। আবার, ভুবনমোহিনীর অগাধ স্নেহোদকে শান্ত হয়ে রূপ এবং রস-ধারায় পূত-পবিত্র হয়ে উঠত।

শরৎচন্দ্রের জীবন-দোলক দোলায়মান হয়ে পথ এবং বিপথে বিচিত্র রেখাঙ্কিত করে রেখে গেছে তাঁর যৌবনের দিনগুলির ইতিহাসটি।

শরৎচন্দ্রের জীবনে ভুবনমোহিনীর কতখানি প্রভাব ছিল তার একটি ছোট ঘটনার কথা জানা আছে বলি :—

শরৎচন্দ্রের বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁকে "ন্যাড়া" বলে ডাকতেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ হওয়ার পর ভুবনমোহিনী বল্লেন, "তোকে একবার তারকেশ্বর যেতে হবে যে!"

"কেন?"

"আমি তোর চুল মানত করে রেখেছি, বাবার কাছে।"

সে যুগে শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের নাস্তিক্যবাদ ছিল ফ্যাসান। শরতের পক্ষে তারকেশ্বরে চুল দেওয়ার চেয়ে গলা দেওয়া ছিল ঢের সোজা।

শরৎ ঘোর আপত্তি করে বল্লেন, "সে কিছুতেই হবে না, মা।"

"কেন রে?"

"লোকে আমার গায়ে থুতু দেবে।"

"দিলে তুই সইবি। তাই বলে আমি নরকে পচবো? বেশ,—তবে থাক্‌নে, আমি ব্যবস্থা করছি।"

"কি করবে মা?"

"কেন? নাপ্‌তিনীকে ডেকে পাঠিয়ে আমি নিজের চুল কেটে—পাঠিয়ে দেব।"

সেই রাত্রের গাড়িতেই শরৎচন্দ্র তারকেশ্বর রওনা হলেন। ফিরলেন "ন্যাড়া" হয়ে।

সেই তেজস্বিতার বহু-পরিচয়ে শরৎ-সাহিত্য সমৃদ্ধ।

দেবানন্দপুরের অগ্নি-পরীক্ষা থেকে ভুবনমোহিনী কি করে একদিন উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করেছিলেন তা' ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরের জীবনের অভিনব এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়ে আবার মামার বাড়ির শান্ত-পরিমণ্ডলে এসে নিঃশব্দে অবতীর্ণ হ'লেন।

তারপর এইখানেই তাঁর লিপি-কুশলতার শিক্ষা শুরু হল।

[illegible]

ফের

দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুরে ফিরে এসে শরৎচন্দ্রের মনের অবস্থা অবর্ণনীয় হ'ল। তিনি দেখলেন যে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলেজে ঢুকেছে। তাঁর পক্ষেও কোথাও হীন, ছোট, কি অবহেলিত হয়ে থাকা একেবারে স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। সেই অবস্থায় কি করা যেতে পারে তাই অহরহ তাঁর চিন্তার বিষয় হ'ল।

নিবিড় চিন্তার পর যে পথ অবলম্বন করা স্থির হ'ল তা কাক-পক্ষীকেও বলা চলে না।

যে ইস্কুলে দেবানন্দপুরে গিয়ে ভর্তি হ'য়েছিলেন, সেখান থেকে ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট আনতে অনেক টাকা লাগে; সে টাকা যোগাড় হয় না। সে কথা বলাও চলে না সকলকে। উপরন্তু সেই বছরে আর পরীক্ষা দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না। এখন উপায়?

শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের তৈরি বাধা মানুষের আগে চলার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে কিছুতেই থাকতে পারে না। অতএব তাকে যে-কোন উপায়ে দূর করতেই হবে। অবশেষে যে-কোন উপায়েই তা দূর হয়েছিল।

জেলা-স্কুলের ছাত্র ছিলেন; স্কুলটি বাড়ির কাছেও বটে; কিন্তু সেখানে সকল দিক বিবেচনা করে না যাওয়াই স্থির হ'ল।

সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তেজনারায়ণ কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকতা করতেন। তাঁর পিতা বেণীমাধব কেদারনাথের বন্ধু ছিলেন। পাড়া-সুবাদে শরৎ পাঁচকড়ি বাবুকে মামা বলতেন। স্কুলে ভর্তি হবার বিষয়ে শরৎ তাঁর কাছে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা লাভ করেছিলেন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু। ইনি ছাত্রদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তাদের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করার জন্যে সর্বদাই উন্মুখ। ইংরেজিতে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ছাত্র এবং অভিভাবকদের সঙ্গে আত্মীয়তার ব্যবহার ক'রতেন। তিনি পরে কলেজের ইংরেজী অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন এবং অবশেষে অধ্যাপকতা ছেড়ে দিয়ে ওকালতি করেন।

দোরের বাইরে একটি খুঁটোতে একটা বেজি বাঁধা থাকত। [illegible] হয়ে না গেলে বেজি দু একটা কামড় দিতে ছাড়ত না। নিজের অংশের এক টুকরো মাছের অর্ধেক না খাওয়া, দুধ ভাত একটি খুরিতে দিয়ে শরৎ পরম প্রিয় বন্ধুটিকে খাইয়ে কৃতার্থতা লাভ করেন। আর একটি খুরিতে জল।

সেই মাটির কুটুরি ঘরে ইঁদুরের উৎপাত ছিল প্রচণ্ড। তাই শোবার আগে শরৎ তাকে চেন মুক্ত করে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতেন।

সেদিন সকালে মাঝের ফটক খোলা হয়নি তখনও; প্রায় সারা রাত্রি জেগে শরৎ সবে শুয়েছেন। নীলা বাইরে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়া দেখলে শরতের গায়ের কাপড়খানা রক্তাক্ত!

"শরৎ, ও শরৎ!…"

"কিরে? নীলা!"

জড়িয়ে থাকা ঘুমে চোখজোড়া। না খুলেই শরৎ উত্তর দিলে, "কিরে নীলা? একটু বেড়িয়ে আয়—এই মাত্তর শুয়েছি ভাই!"

"তোর অসুখ করেছে?"

"হাঁ।"

"রক্ত বমি করেছিস?

"দুৎ,—জ্বালাস নে।"

"ও রক্ত কিসের?"

"কোথায় রে?"

"তোর গায়ের কাপড়ে—"

ধড়মড় করে শরৎ উঠে বসলেন।

"এ কিরে! এ বেজি ব্যাটার কাজ—ইঁদুর খুন করেছে নিশ্চয়!" বলে শরৎ গায়ের কাপড় ফেলে, বেজি বেঁধে, নীলাকে দোর খুলে দিতে বেরিয়ে গেলেন।

ফিরে এসে দেখলেন, নীলা গালে হাত দিয়ে নির্বাক হয়ে বসে বেঞ্চের উপর।

"যাক,—খুব চোট পেয়েছিস; তোর বেজি-ব্যাটা একটা গোখরো মেরেছে।" :

দুই বন্ধুর চক্ষু স্থির!

একটা কাটি দিয়ে নাড়তেই ল্যাজটা নড়ে উঠল।

"কখন শুয়েছিলি?"

"তা তিনটে হবে বোধ হয়…"

"তুই মরবি, বলছি।"

"দূর্…"

"এ ঘর ছাড়।"

"কোথায় সাপ নেই, শুনি?"

"তোর এই ঘরটা বেটাদের আড্ডা।"

"তুই তবে আর আসিস নে।"

"তোর তামাক সাজবে কে রে? কেন করে মরবি, দেখছি।"

"সব কোরবো; কিন্তু ওটি কিছুতেই করা হবে না।"

দুই বন্ধুতে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে তাম্রকূট সেবন করার পর, নীলা চলে গেল; শরৎ অঙ্কের বই টেনে আবার পড়ায় মন দিলেন।

বাড়িতে একটা হৈ-রৈ ব্যাপার বেধে গেল। মুশাই চাকর সাপটাকে বার করে নিয়ে এসে, উঠোনে কাঠ-পালা জড়ো করে—অগ্নি-সংকারের ব্যবস্থা করতে লাগল।

শরৎ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে দেখেন, ছোট ছেলেমেয়ের ভীড় লেগে গেছে উঠোনে। মুশাইকে জিজ্ঞেস করলেন, "ই কেয়া করতে হো মুশাই, সাঁপকো জলায় কর খাওগে?"

"নেই।" মুশাই মাথা নেড়ে বললে।

"তব্?"

"গোহুমনা সাঁপ ব্রাহ্মণ হ্যায়, জরুর জলানা চাইয়ে।"

"উসকে মু বরকায়কে গঙ্গাজি মে বিগ দেও। মছ্‌লি সব খা লেগা।"

কর্তার অবর্তমানে মুশাই এখন বাড়ির প্রকৃত কর্তা।

"রেহি, তোঁ বাকে পড়। ই কাম হামরা হ্যায়: তোঁ কি জানেইছিস্?"

কিন্তু ব্যাপারটার এইখেনেই নিবৃত্তি হল না। ভুবনমোহিনী মুশাইকে দিয়ে

মনসার পূজো পাঠিয়ে দিয়ে, প্রসাদের প্রতীক্ষায় উপবাসী রইলেন। মুশাই তিতোপ্পর বেলায় ফিরলো। মানে, ছোট্ট সামর্থ্যের মধ্যে দিয়ে পাত্রে কষ্ট সঙ্গে যতখানি করতে পারা যায় তার কিছুমাত্র ত্রুটি হ'ল না।

শরতের টেবিলের উপর খুরি ঢাকা প্রসাদ রইল, নীলার জন্যে—সে বিকেলে তামাকের টানে এসে যে পৌছবে, শরৎ তা জানতেন তাই ব্যস্ত হলেন না।

এসেই নীলা জিজ্ঞেস করলে, "ওটা কিরে?"

"ওটা ভাই তোর জন্যে পেসাদ মনসার, মা রেখে গেছেন।"

নীলা কপালে ঠেকিয়ে খেয়ে ফেলে বললে, "খুব বেঁচে গেছিস্ কিন্তু⋯"

"হয়েছে,—তামাক সাজ। তোর আর বক্তৃতা করতে হবে না।"

নীলা কাজে মন দিলে।

শুধু মতিলাল সম্পূর্ণ উদাসীন। খেতে বসে বললেন, "এটা ফের কি গো?"

"মনসার পেসাদ।"

"এতোও জানো, বাবা। গাঙ্গুলিবাড়ির মেয়েদের ভাটপাড়ায় বিয়ে হওয়া উচিত—সর্বশাস্ত্র বিশারদ।"

"মন্দটা কি, শুনি?"

"মন্দ কে বলেছে? অতো সাত-সতেরো আমাদের বাড়ি কেউ জানেও না, মানেও না।"

"তোমরা পুরুষেরা জান না; আমাদের হাতেই তো ধর্মকর্ম।"

"সে ঠিক", বলে মতিলাল, এক নিমেষে খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন।

"ওকি, দুধ খেলে না?"

"না, আমার দুধে কলা দিয়ে ভাঁড়ারে রেখে দেওগে। বাস্তুকে ভোগ দিতে হয়।"

"এ আবার এক নূতন বিধেন শুনছি।"

"আমাদের দেশে ওই করে।" বলে মুখ টিপে হেসে মতিলাল বাইরে গেলেন।

ভুবনমোহিনী পাথর বাটিতে দুধ-কলা সাজিয়ে রেখে গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করে বললেন, "তোমার কৃপাতে আমার শোরো রক্ষে পেয়েছে, মা বাস্তু!"

শরৎ এঁকে খেতে বসে বললেন, "আচ্ছা মা! দেশের কেউ বাদ গেল

যা—সবাই [illegible]—[illegible] কর্বে [illegible]
[illegible] ?"

"কেন নীলাকে দিব কি ?"

"নীলা নাকি সাপ মেরেছে ?"

"বাটি ! বাটি ! অমন বাই, কি ভুল আমার !" বলে ছুটে গিয়ে—একটি ছোট পাথর বাটিতে দুধ কলা মেখে এনে বললেন, "তুই দিবি না আমি দিয়ে আস্ব ?"

"তোমাকে কামড়াবে। আচ্ছা, মা ! যে যেমন জীব সে তাই খায় ! ও কলা খাবে কেন ?—মাছ দাও।"

"দুধে-মাছে এক করতে নেই যে।"

"কি হয় মা ?"

"গরুর অকল্যাণ। এই নে এই পাতে—আলাদা করে দিস্—দুধে মাছে এক করিস্ নে।"

"আচ্ছা ! আচ্ছা ! তাই হবে।" ব'লে শরৎ হাস্তে হাস্তে বাইরে চলে গেলেন।

ভুবনমোহিনীর কাছে কেউ ছোট নয়, কেউ অবহেলার নয়। যে যাই বলে তাই শোনেন। শুধু সবাই বেঁচে বর্তে সুখে থাক্ !

পরের দিন সকালে সময়ের একটু আগেই নীলা এলো। দেখলে, শরৎ আলো জ্বালিয়ে তখনও পড়ছে।

"এ কি রে ! আজ উঠ্লি ?"

"আজ রুটিন্ বদলে গেছে, ভাই। ও রাতে কেমন ঘুম পেয়ে গেল সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলাম, জানিনে ক'টা,—ঘুম ভেঙে গেল।"

বেণী বেঁধে শরৎ দোর খুলে দিয়ে এল। নীলা টেবিলের ওপর একটা বী-টাইম-পীস্ রেখে বল্লে, "এই নে, এটাতে তোর কাজ চলবে বোধ হয়।"

"চুরি করে আনলি ?"

"কতকটা তাই বটে। বাবার অসুখের সময় ওটা কেনা হয়। নৈলে

ওষুধ খাওয়াবার বড় মুস্কিল হ'ত। তাই মা বড়িটা সকলকে দেখতে দিতেন না। তুলে রেখেছিলেন। জানি চাইলেও দেবেন না। এদিকে তোর একটা বড়ি নইলে চলেই বা কি ক'রে? তাই চুপি চুপি...”

নীলার মুখে একটি স্নিগ্ধ ম্লান হাসি ফুটে উঠলো। সে খাটের কাছে বসে পড়ে তামাক সাজতে লাগলো।

শরৎ বললেন, “আচ্ছা নীলা, তুই আমায় এত ভালবাসিস্ কেন রে?”

“ওটা ভাই বলা যায় না। সবাই ঐ কথা জিজ্ঞেস করে। একজন একজনকে কেন ভালবাসে, তাকি বলা যায়?”

“যায় বই কি।”

“তুই পারিস্?”

“নিশ্চয়।”

“কি বলতো, দেখি।”

“বললে তুই দুঃখু পাবি।”

“দূৎ, তা কেন? তুই যা বলবি, তা তোর আন্দাজ, সত্যি নাও হ'তে পারে তো।”

“সত্যি মেলে, বলি যে। এ কথা আজই আমার মনে আসেনি, অনেক দিন থেকে দেখে দেখে, তবে আমি ঠিক করি। তোর সঙ্গে আমিই আগে কথা কই, মনে আছে?”

“খুব আছে।”

“আচ্ছা বল্, কেন কথা কইলাম।”

“বা—রে, তোর মনের কথা আমি কি করে বলব?”

“অই! তুই কিন্তু পারিস্—তোর খুব বড় কল্পনা আছে: তোর হৃদয় মানে মনটা ভারি নরম। তুই লোকের দুঃখু নিজের মন দিয়ে বুঝতে পারিস্। তুই তোদের বাড়ির আর সকলের মত নোস্।”

“কেন?”

“আচ্ছা নীলা, তুই-ই বল আমাকে, ঐ টিনের মধ্যে কিস্‌মিস্ পেস্তা আর রোট-আবার সেদিন দিয়ে গেলি কেন?”

"আবাজের অনেক কিনে এনেছিল বলে।"

"আর কেউ তা তো দেয় না?"

"আর কেউ তোকে আমার মত করে জানে না।"

শরৎ হাস্‌লে, বল্‌লে, "জানারও বিশেষত্ব আছে।"

"আচ্ছা তুই বল, শরৎ, কেন আমার সঙ্গে ভাব করলি?"

"তোর চেহারার মধ্যে ভারি একটা মিষ্টি মেয়েলি ভাব আছে। কিন্তু তোর সঙ্গে সেদিন কথা কয়েছিলাম, সে একেবারে অন্য কারণে।"

"কি কারণ রে?"

"তোর ঠোঁট দুটো দেখে বুঝেছিলাম, তুই তামাক খাস। আমার এক বন্ধু ছিল দেবানন্দপুরে, তার বাড়িতে তামাকের আড্ডা ছিল। এখেনে এসে কি মুস্‌কিল যে হ'ল! বাবা তামাক খান; কিন্তু পুড়িয়ে ছাড়েন।"

"আমারও ঠিক তাই, আমি শিখি বড়োদের তামাক খাওয়া দেখে; কিন্তু একটু রস জম্‌লে ওতে আর সানায় না। তখন আলাদা বন্দোবস্ত করতেই হ'ল। তোর বাড়িতে বেশ নিরিবিলি, আমার দাদার জ্বালায়··"

"জানি। কিন্তু তুই পয়সা পাস এত কোত্থেকে রে?"

"আমি যে বাজার করি। ও থেকে দু-এক পয়সা সরালে—কেউ জান্‌তেও পারে না।"

"বটে, চুরি বিদ্যে চালাচ্চ? কিন্তু ভাই তোমার পাপের অংশ আমি নিতে পারবো না, নীলা।"

"নিতে বলবও না। তোকে তামাক খাইয়ে আমার বেশ ভালো লাগে।"

"সেই কথাই তোকে বল্‌লাম, তোর মধ্যে একটা মেয়ে মানুষের মতো একটা মিষ্টি মানুষ আছে।"

"শয়তান তুই, পাজি! আমাকে মেয়ে বলে লজ্জা দিচ্চিস?"

শরৎ হেসে বললে, "আগেই বলি নি?"

"কি?"

"তুই চটে যাবি।"

"চটিনি, আমিও জানি যে আমার মার মতো আমার মনটা ভারি নরম।

"আচ্ছা, তুই যা।"

নীলা গান করতে পারতো। তার একটা এস্রাজ ছিল। একজামিনের পর শরৎ সেটি দখল করে নিজের বাড়ি নিয়ে এলেন। সে বিনাবাক্যে সেটি দিয়ে দিলে।

চণ্ডীমণ্ডপের পাশের কুঠুরি—যা' কেদারনাথের আমের ভাঁড়ার হ'ত, আর প্রয়োজন হ'লে ছেলেদের আটকের জন্তে সলিটারি সেলরূপে ব্যবহৃত হ'ত, শরতের সেই ঘরটি হ'ল সংগীতশালা।

একদিন সকালে সেই ঘর থেকে আওয়াজ শুনে ছেলেদের তরুণ-হৃদয় বিচলিত হয়ে উঠলো। এস্রাজের সঙ্গে মিষ্টি গলায় "মধুরা বাসিনী, মধুর হাসিনী" গান শুনে মন হ'ল স্বর্গের পরীদের গানের মোজরা বসে গেছে বুঝি সেই ঘরটার মধ্যে!

অনেক আবেদন-নিবেদনের পর দোর খোলা হ'ল।

কিন্তু নীলা বেশিদিন বাঁচেনি। সে হঠাৎ একদিন কলেরায় মারা গেল। শরতের কি শোক! যখন তার এস্রাজটি ফিরিয়ে দিতে হ'ল, তখন মনে আছে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে গেছে!

ভাগলপুরে এসে শরতের—সেই প্রথম বন্ধুটির বিচ্ছেদ তার মনে একটা গভীর দাগ রেখে গিয়েছিল।

এইবার একটু পেছু হেঁটে আর একদিনের কথা বলতে হচ্ছে। ভুবনমোহিনী বিপ্রদাসকে কাছে বসে পরিতোষপূর্বক খাইয়ে বললেন:

"বিপিন, ষোলো পাশ হয়েছে।"

"হুঁ, কিন্তু এ পাশ তো কিছুই না মেজদি, ভালো করে পড়ায় মন দিতে বল ওকে।"

"বলছিল, ফি দিতে হবে। নাকি অনেক টাকা লাগ্‌বে।"

"কত?"

"ওকে জিজ্ঞেস কর। আমি ডেকে দিচ্ছি।"

"থাক্, আমি জেনে নেব।"

পরদিন সকালে বিপ্রদাস চললেন খড়্গপুর। টাকা ধার নেবে, সংগ্রহ করতে হবে। কাঙালীটোলা থেকে খড়্গপুর মাইল দেড়েকের পথ। সেইখেনে গুলজারিলালের বাড়ি।

গুলজারিকে সবাই চেনে। কাছারির অশ্বত্থ গাছের ধূলিবহুল প্রাঙ্গণে—নিম কালো রঙের পেট-মোটা এই মানুষটাকে নিত্য ঘুরে বেড়াতে দেখতে পাওয়া যায়। সে ছিল খড়্গপুরের মহাজন। টাকা তার কাছে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। সুদের জন্যে একটু ইতস্তত করলে সে মাথা নেড়ে একেবারে জবাব দেবে, "বেশি হোগা, সাহেব।"

বিপ্রদাস সরকারি দপ্তরে প্রবেশ করেছেন, অতএব গুলজারির কাছে মোটেই অপরিচিত নন্। সে জানে যে, টাকা আদায়ে কোন মুস্কিল হবে না। কেবল যা-কিছু বিবেচনা সুদটা নিয়ে। তাই সে বললে, "কিন্তু কি সুদ দিচ্ছেন?"

"সুদ? যা উচিত বিবেচনা করবে।"

"দেখুন বাবু, আমার এ বিষয়ে যথেষ্ট নজির আছেই। আর, সুনাম কেনার কোন তোয়াক্কা আমি রাখিনে। আসলে, কড়া সুদের তাগিদে আসল আপনি আদায় হয়ে আসে। তা হ'লে, আমার মরণ কি বাৎ! টাকায় চার পয়সা, প্রতি মাসে। রাজি থাকেন, এই কাগজ কালিকলম আছে—এই টিকিট। নিয়ে যান টাকা।"

বিপ্রদাস হ্যাণ্ডনোট লিখে, টাকা নিয়ে এলেন। অতি অল্প বেতনে তিনি সবে চাকরিতে ঢুকেছেন। বৃহৎ পরিবার পালনের সামর্থ্যও সে সময় তাঁর ছিল না।

শুনতে পাওয়া যায় যে, অর্থের অভাবে শরৎচন্দ্র লেখা-পড়া করতে পারেন নি এবং তার জন্যে তাঁর দূর এবং নিকট আত্মীয়েরাই দায়ী! কিন্তু তাঁর পিতৃদেব মতিলাল যে কেন দায়ী ছিলেন না, তা' ঠিক ক'রে বুঝে ওঠা শক্ত। আজও এই তর্কের অবসান হয়নি। এখনও অনেক শরৎচন্দ্রের তথা-কথিত বন্ধুকে এই বিতণ্ডা করতে দেখা যায়। তাই বলাবাহুল্য নিয়ম, তোষামোদকারীদের স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টায় অজস্র [illegible] [illegible] [illegible] করতে

হয়। আর একবার যথাকালে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করতে হবে। চাণক্য বলেছেন: সত্য বল, প্রিয়সত্য বল, অপ্রিয় সত্য ব'লো না। দুঃখ, নির্জলা মিথ্যেকে খণ্ড-খণ্ড করতে হ'লে সত্যকেই ইস্পাতের মত কঠিন করে তুলতে হয়।

এই পৃথিবীতে গুলজারিলালেরা অমর। তাদের নথি-পত্র ঘাঁটলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এই সময়ে বিপ্রদাস একাধিকবার অধমর্ণরূপে তার দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু গুলজারিলালের টাকার পয় ছিল। শরৎচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে প্রবেশলাভ করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর ফল বার হওয়ার মধ্যে একটি দীর্ঘকালের ব্যবধান পড়ে। সেই ব্যবধানে বাঁধা-গোরু ছাড়া পেলে যা' চিরদিন ঘটে, শরৎচন্দ্রের পক্ষে তা' না-ঘটার কোন বিশেষ কারণ ছিল।

এই সময়ে রাজেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জমে উঠেছিল। রাজেন্দ্রর—ওরফে রাজুর এবং শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" বই-এর ইন্দ্রনাথ—সেই সময়ে, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তাঁদের কাঠের কারখানায় ছুতোর মিস্ত্রির কাজে মন দিয়েছিলেন। তাঁর কিছু পরিচয় ইতিপূর্বে দিয়ে চুকেছি। শরৎ অবসর বিনোদনের জন্য রাজুদের কারখানায় ঘন ঘন যেতে লাগলেন। রাজুর সমাজ-শাসনের বীরত্বের বহু কাহিনী এক সময়ে এই ছোট শহরের অল্পসংখ্যক বাঙালীর কাছে সুবিদিত ছিল।

বাঙালীটোলার মাণিক সরকার ঘাটই তখন সব চেয়ে বেশি চালু ছিল। জলের কল বসেনি এবং ঘরে ঘরে জলের অভাব দূরের ব্যবস্থা মানুষেরা অগত্যা নিকটস্থ কুয়ো ইঁদারার সাহায্যে করতেন। তবে, স্নানের ব্যবস্থার জন্যে মা গঙ্গার শরণ গ্রহণ করতেই হ'ত। মা-লক্ষ্মীদের একটি খিড়কির ঘাট ছিল বটে, কিন্তু সেখানে পাড়ার মেয়েরা ছাড়া আর বড় কেউ যেতেন না। অল্প পরিসর—আর কাঁকরের দু'চারটে সিঁড়ি নেবে একেবারে অথৈ জল। অতএব নানা কারণে তা দুর্গমও ছিল।

সুন্দর ঘাটে মেয়েদের স্নানের আলাদা বিভাগ ছিল। তাতে মধ্যে মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সমাগম হ'ত। এই রকম ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হ'লে গীতাকার

[illegible] বাঁ দিকে যদি সোজা চলে যাওয়া যায় তো [illegible] মধ্যেই রাস্তা তিন ফোঁড় হয়েছে। কিন্তু আমরা পূবে যেতে চাই, মনে রাখতে হবে। ভাগলপুর শহরে একটু পাহাড়ে ভাব আছে। বাঁয়ে গেল খড়্গপুর রোড, ডাইনে ওয়েস রোড। আর সামনে সামান্য চড়াই উঠলে ডান দিকে "কাটি" সায়েবের বাংলা। ইঞ্জিনিয়ার রামরতনের পরিকল্পনার পরিচয়। এইখেনে লর্ড সিংহ থাকার সময় বলতেন: ভাগলপুর তো প্যারাডাইস্! তারপর, বাঁয়ে কমিশনর সাহেবের কুঠি—তার সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। আরো খানিকটা পূবে গেলে বাঁ দিকে কয়েকটা ছোট খাট বাড়ির পর সুখরাজ রায়ের বাড়ি। এত বড় বাড়ি আর দুটো নেই ভাগলপুরে। ডান দিকে দেখলে স্যাণ্ডিস্ সায়েবের হাতা।

সব চেয়ে আগে চোখে পড়ে একটি মাঝারি গোছের টিলা। মানে, কাঁকর আর মাটির বড় গোছের ঢিবি। এটির একটি সুন্দর গল্প আছে। স্যাণ্ডিস কে ছিলেন জানিনে, কিন্তু তাঁকে যেন চোখে দেখতে পাওয়া যায়। ছেলে বয়স থেকে তাঁর কথা শুনতে শুনতে তিনি মনের কাছে এত পরিচিত হয়েছেন যে তাঁর সম্বন্ধে যেন আর কোন প্রশ্ন উঠে না। দেখতে পাই—সায়েব হাত কাটা জামা পরা, হাফ প্যাণ্টে কোদাল চালিয়ে চলেছেন, মাথায় একটা ট্রু-হ্যাট। তিনি নাকি ব্যায়াম করতেন মাটি কেটে। টিলার পাশের সে গর্ত মজে গিয়েছে; কিন্তু বুজে যায় নি। সায়েবদের কাজ ভালোবাসা আর কাজের তৎপরতার এত পরিচয় আছে যে, আমাদের পক্ষে এটি অসম্ভব মনে করলেও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়, মনে করতেই যেন মন চায়। দূরে একটা বুড়ো বটগাছ আছে।

গল্প শোনা যায় যে, সায়েবের খাট নাকি বটের ডালে ঝুলতো! তাতেই রাতে তিনি নিদ্রা দিতেন। গল্পের মা-বাপ নেই, রোদ-বৃষ্টি শীত-গ্রীষ্ম নেই, আর আমাদের বিশ্বাস করে নেওয়ার শক্তিও কম বড় নয়। এই স্যাণ্ডিসের প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে সায়েবদের ক্লাব। সেখেনে দিনান্তের কর্তব্য সেরে ওরা হাত-পা নাচে, গান গায়, মদ খায়, তাস খেলে, বিলিয়ার্ড খেলে আর বিদেশে পরস্পরের ঐক্য দৃঢ় করে। বই আছে, খেলার বিপুল সাজ-সরঞ্জাম আছে।

খাওয়ার ব্যবস্থা [illegible] এবং অভ্যাগত আগন্তুকের থাকার স্থানও হয়। এই ক্লাবটি চিরদিন জনগণের বিস্ময়, কৌতূহল আকর্ষণ করে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এটি এককালে কালীঘাটের হালদারদের কি ক'রে জমিদারিভুক্ত হয়েছিল জানিনে, কিন্তু এখন ওটি সরকারি খাস-মহলের অন্তর্ভুক্ত —নামমাত্র দক্ষিণায় ওদের করতলগত।

ক্লাবের হাতা পেরিয়ে—তিলকা মাঝি। একটা বট গাছের নীচে কুয়ো বুজিয়ে স্তম্ভ করা হয়েছে। এই সাঁওতাল ডাকাত পথিকের ধন লুণ্ঠন ক'রে এই গাছের ডালে তাকে ঝুলিয়ে দিয়ে দারিদ্র্য দুঃখের শাস্তি করে দিত। এইখেনেই সেকালের শহরের শেষ ছিল।

তার পর আমাদের বাঁ হাতি যেতে হবে উত্তর পুবে। মাইল দেড়েক গেলে —বাবারি। এখেনে ঠাকুরদের জমিদারি—বড় বড় বাড়ি, ইস্কুল, হাসপাতাল আর মস্টের মাট।

তিলকা মাঝির পুবে চলেছে সোজা বড় বড় গাছের ছায়া-নিবিড় চওড়া শড়ক। ডান দিকে রেস্ কোর্স আর বাঁয়ে সেন্ট্রাল জেল। আরো গেলে সাবোর।

এইবার বুঝতে পারছি যে আমার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। ভাগলপুরের এক বড় একটা ভূ-বৃত্তান্ত দেওয়ার কি দরকার?

শরৎচন্দ্র ঘরে বসে ভালো মানুষটির মত যৌবনে মোটেই "গুড বয়" ছিলেন না—পশ্চিমে সাহজাহঙ্গী তলাও থেকে আরম্ভ করে—পুবে বাবারির সন্নিকট গুম্ফা পর্যন্ত তাঁদের লীলাক্ষেত্র ছিল। আর একটি কথা—তাঁর বইএর পথঘাটের বর্ণনার মধ্যে এই পট-ভূমিকে বার বার আসতে দেখি। তাই মনে হয়, এই প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্রকে এবং তাঁর বইগুলিকে ঠিক করে বুঝতে, ভাগলপুরের পথ-ঘাটের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয় থাকা মন্দ নয়।

এইবার আমরা রাজুর আর একটি কীর্তির উল্লেখ করব।

বাবারির জমিদারেরা মৈথিলী ব্রাহ্মণ। এঁদের সঙ্গে বাঙালীর অনেকটা সমসাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আচার-ব্যবহার, ভাষার নৈকট্য এবং প্রবাসী বাঙালীর সেকালে বৈশিষ্ট্যের জন্য এই জমিদার বংশের মধ্যে বাঙালী প্রভাব

দেখতে পাওয়া যেত। এখানকার ফ্রী-ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আজও বাঙালী। সেকালে বেহারের স্কুলে বাঙালী শিক্ষকের সংখ্যা বিহারীদের চেয়ে বেশি ছিল। একজন নিম্নতম শিক্ষক স্কুলের কেরাণীর কাজ তখন করতেন। অধ্যাপনার কাজ সেরে আপিসের প্রয়োজনীয় কাজ করে তাঁর বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে যেত।

একদিন বৃক্ষবহুল অন্ধকার পথে এই নিরীহ শিক্ষকটি অন্ধকারে একলা ফিরছিলেন। হঠাৎ পিছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দের পর তাঁর পিঠের উপর সশব্দে চাবুক পড়ল এবং নিমেষে সাহেবের টম্‌টম্‌-গাড়ি অন্ধকারে মিশে গেল। কি অপরাধে যে এতবড় শাস্তি ঘটে গেল তা' সেই মাষ্টারমশাইটি বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি শুনেছিলেন যে রাজু এই রকম অত্যাচারের প্রতিকারের ভার, কথা কানে যাওয়া মাত্রেই, হাতে নিয়ে থাকেন। অতএব বাড়ি যাওয়ার আগে, তিনি রাজুকে নিজের পিঠের উপর রক্তাক্ত দাগটি দেখিয়ে এলেন।

রাজু বললেন, "আপনি বাড়ি যান। কালকে ছুটি নেবেন। পরশু কি হয় তা' শুনতে পাবেন।"

ভগ্‌ৎ সিংএর "হোপ" ইষ্টিমার আদামপুর ঘাটে বাঁধা হত। অতএব একটা কাছি সংগ্রহ করা রাজুর পক্ষে একান্ত সহজ। এবং রাজুর বন্ধুবান্ধবেরও অভাব ছিল না। অতএব সন্ধ্যার পর সদলবলে রাজেন্দ্রনাথ ছায়াবহুল ঘনান্ধকার স্থানে গিয়ে সমাসীন হ'লেন। সাহেবটি নিত্য ক্লাবে খেলতে যান। সেদিনও যথাসময় টম্‌টম্‌ হাঁকিয়ে চলে গেলেন। রাত নটার সময় ক্লাব বন্ধ হয়।

দূরে সাহেবের গাড়ির আলো দেখা যেতেই দুধারের দুটি গাছে কাছির দুটি প্রান্ত টেনে বেঁধে দিয়ে রাজুর দল নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

সাহেব স্বপ্নেও চিন্তা করেনি যে, এমন একটা বিপদ ঘটতে পারে। ঘোড়া এসে কাছিতে বেধে গেল এবং সাহেব ঘোড়া ডিঙিয়ে, পথের মধ্যে চিৎপাৎ। এই সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ। তিনি সাহেবকে উত্তম-মধ্যম ধনঞ্জয় দান করে বললেন, "আওর কভি বেকসুর মুসাফির কো মারো গে?"

"নেভার।"

"বোলো, মাপ করো…"

"মাপ করো।"

"ঘর যাও।"

অকুস্থান থেকে সাহেবের ঘর খুব দূরে ছিল না।

রাজেন্দ্রনাথের আরও একটু বীরত্বের পরিচয় দি:

মাঘ মাসে ভাগলপুরে দারুণ শীত হয়। সেই দুর্বিষহ শীতের রাত্রে বাংলা ইস্কুলের পণ্ডিত মশাইয়ের স্ত্রীবিয়োগ ঘটল। তিনি নিজে অসুস্থ এবং কোলের ছেলেটি নিতান্ত শিশু। সে ক্ষেত্রে মৃত-সংকারে তাঁর যোগ দেওয়া সম্ভবপর নয়। তাতেও বড় কিছু আসে যায় না।

ব্রজেন্দ্রনাথ পীড়িতজনের ছিলেন অভিভাবক। খবর দিলে কি না দিলে, তিনি সে বাড়িতে হামেহাল হাজির! আবার রুগী না বাঁচলে নাকি কর্তব্যের তিনিই ছিলেন একেবারে অধ্যক্ষ! তাঁর কর্তৃত্বে বাঙালীর মড়া বাসি হওয়ার চেয়ে বড় অপমান কি আছে? সূর্যদেব গাফিলি করে হয়তো একদিন পশ্চিমে উঠতে পারেন, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে এ অসম্ভবেরও অসম্ভব! কিন্তু এ সংসারে এতোবড় নিষ্ঠাও সকলের থাকে না। ব্রজেন্দ্রনাথ অধিকন্তু হিসেবে একটি ইস্কুলের হেড মাস্টার—অতএব ছাত্র সম্প্রদায় তাঁর মুঠোর মধ্যে। এমন শীতের রাতে পত্নীদের সন্তানসম্ভাবনার কাহিনী অমূলক হ'লেও নেহাৎ অকেজো হয় না; অন্তত স্বামী বেচারিদের শবদাহের আশু দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় হয়। পুন্নাম নরক থেকে মুক্তি? সে তো পরলোকের কথা! বর্তমানে বাঁচলে তবে তো সে দিনের কথা!

রাজুর দল কোমর বেঁধে অগ্রসর হল। তাদের মাঘেও শীত নেই, মেঘেও ডর নেই। একে অমানিশা, তায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন! যেতে হবে মণ্টের ঘাটে —ক্রোশ দুই এর ধাক্কা—অতএব ব্রজেন্দ্রনাথ আর সবুর সইতে পারলেন না। চারজন হ'তেই নৈশ আকাশে প্রকম্পিত হ'য়ে উঠলো 'বলো হরি,—হরি বোলের' নিদারুণ ধ্বনি!

হাস্য-রসিক বিধাতা এতেও তৃপ্ত হলেন না। গোদের উপর বিষ-ফোড়া! টিপিটিপি বৃষ্টিও সুরু হ'ল!

সেকালে হারিক্যান্ লণ্ঠন প্রবর্তিত হয়নি। যেহেতু, বালক ডিকস্ তখন সবেমাত্র ইস্কুল ভর্তি হয়েছে, আর ডিজ বাবাজির জন্মই হয়নি! কিন্তু মানুষের —যাকে বলে, উদ্ভাবনী শক্তি তা' চিরকালই অপরাজেয়! একটি হাঁড়ির মধ্যে ভেরাণ্ডার তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে একটা চাকরের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে অভিযান সুরু হয়ে গেল। ব্রজেন্দ্রনাথ চলেছেন অশ্বগতিতে। পিছন থেকে বামাচারণমামা ডাকেন:

"ওহে, শুনছো,—আস্তে আস্তে! ছেলেদের পা মচকে যাবে যে,—সব্বার তো তোমার মত ঠ্যাং লম্বা নয়, বোজেন্দর!"

"গেলে—আপনি তো আছেন!" ছেলেদের মধ্যে থেকে কে একজন বললে।

"বাপ সকল, আমি আর বহনে পটু নই! তোমাদের সঙ্গদানই বর্তমানে আগমনের উদ্দেশ্য!"

ব্রজেন্দ্র বললেন, "বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি হচ্ছে, ঝমাঝম হ'তে আর দেরি কি?"

অবিলম্বে আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হ'ল। পা অসাড় হয়ে গেছে। জলে ভিজে স-শয্যা মড়া ফুলে ঢোল! ছেলেদের কচি কাঁধ বাঁশের ঘসড়ানিতে সোন্‌টা পড়ে জ্বালা করতে লেগেছে!

"মাস্টার মশাই, একটু রাখলে হয় না!"

"তবে রাখ এই তেঁতুল-তলায়!"

গাছটা যেন একটা বনস্পতি! বামাচরণমামা বসে বললেন, "কিন্তু জায়গাটা আমার পছন্দ সই নয়।"

"কেন, ঠাকুরদা?"

"এৎবারি বেটা এখেনেই থাকে কিনা।"

"কে এৎবারি? ডাকাত?"

"দূৎ, সে তো তিলকা মাঝি!"

"তবে?

"বামাচরণ বললেন, সে একটা মস্ত ইতিহাস। বলি শোন্: আমাদের ঐ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেয়েকে দেখেছিস্?—নীল গাউন পরা?—"

"খোপানী?"

"ধোপানী হলে কি হয়, মানুষটা ভালো। ও সায়েবের ছোঁয়া খায় না। বাবুর্চির রাঁধা ছুঁয়ে গঙ্গাস্নান করে আসে।"

ব্রজেন্দ্র বললেন, "এতও তুমি জান মামা!"

"ঠেকলেই জানতে হয়, বাবাজীবন!"

"তারপর ঠাকুরদা?"

"ঐ যে দেখছো—ঐ ছোট্ট কুঁড়ে, সায়েবের ফটকের লাগাও; ঐতে থাকতো এংবারি ধোপা! হঠাৎ এংবারি মারা গেল। তারপর ধোপানীর উন্নতি হল; সে নীল গাউন পরলে। কিন্তু তার বেশী আর সে কিছুতেই এগোতে চায় না! সায়েব অনেক বোঝালে, কিন্তু ধোপানীর সেই এক কথা: সায়েব, তোমায় সব দিতে পারি, কিন্তু জাত দেব কেমন করে?"

কেন? সায়েব জিজ্ঞেস করে।

জাত তো আমার নয়, জাত যে বাপ-দাদার!

এই অকাট্য যুক্তির পর আর তর্ক চলে না। তবুও লোকে ছাড়ে না, বলে, তুই সায়েবকে সাদি করিস নি?

সাদি নয় তো, নিকা করেছি। নৈলে বেটাবেটি হল কি করে? ধোপানী দৈহিক সংস্কারে নীল গাউন পর্যন্ত এগিয়েছিল, কিন্তু মানসিক সংস্কারে যে তিমিরে সেই তিমিরেই র'য়ে গেল। অতএব তার এংবারি বরে ভূত ছাড়া আর কি হ'তে পারে?

ধোপানীর মন দিয়ে মেম সায়েব সেই ভূতকে মোটেই পরিত্যাজ্য মনে করেনি। সে দিনে-রাতে এই তেঁতুল-তলায় এংবারির সঙ্গে কথা ক'য়ে নিজেকে আপাপ-বিদ্ধ রেখেছিল। এংবারিও এমন মেয়েকে ছেড়ে যায়নি; সে এই গাছেই বিরাজ করে—অবশ্য কুলীন ভূত নয় বলে কথা কইতে পারে না; কিন্তু গাছের ডাল নাড়িয়ে ধোপানীর সমস্যার সমাধান করে দেয়। অতএব—তাই বলছিলাম বোজেন্দর,—এই গাছটার ওপর লোকে একটু ভয়চকিত কটাক্ষ ফেলে, একটু তফাৎ রেখেই আনা-গোনা করে থাকে।"

এই কথা কটি বলে মামা সেঁতানো টিকে ধরবার জন্যে গাল ফুলিয়ে ক'লকের ফুঁ পড়তে লাগলেন।

"তারপর ঠাকুরদা ?"

"হুঁ, তাই বলছিলাম,—আজ তিথিটাও সুবিধের নয়—আর এই জায়গাটা গিয়ে কি বলে, আমার মনঃপূত নয়।"

ব্রজেন্দ্রনাথ ভূতে অবিশ্বাস করতেন না; কিন্তু ঠিক এই সময়ে তা' স্বীকার করা উচিত হবে না মনে ক'রেই বোধ হয় ব'ললেন, "ও সব কিছু না; আচ্ছা দেখাই যাক্ না—সত্যি মিথ্যে—আমরা তো আর একা নই!"

"কি দেখবে ? দেখা আমার ভালো করেই আছে।"

"কি রকম সে ?" কে একজন পেছন থেকে প্রশ্ন করে বসলো। তাকে চাপা দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন,—"থাক্ মামা! থাক্ ও-সব এখন, ছেলেরা ভয় খেয়ে যাবে।"

কিন্তু মানুষের স্বভাব ভালো নয়। ভয় পায়, তবুও সে আবার ভয়ংকরকেও চায়; বিশেষ ক'রে ঐ অর্বাচীনের দল! তারা সমস্বরে বললে, "না ঠাকুরদা, বলুন। আপনাকে বলতেই হবে।"

"দেখছো হে ব্রোজেন, এদের আব্দারটা!"

"বলুন তবে; সময়টা তো কাটবে।"

থেলো হুঁকোটায় বার কতক কলকে-ফাটান টান মেরে, খুব কতকগুলো কেশে নিয়ে বামাচরণ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প শুরু করে দিলেন।—

"তুমি বোধ হয় দেখে থাক্‌বে ব্রোজেন, আমার পিসে রঙ্গলাল মুখুয্যে মশাইকে। তিনি ওই ঠাকুরদের এষ্টেটের ওভারসিয়ার ছিলেন।"

"দেখেছি মনে হয়। উদুরিতে মারা গেলেন তো ? তাঁকেও ঐ মঠের ঘাটের পূবে পুড়িয়েছি।" বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বেশ একটু শ্লাঘা অনুভব করলেন।

"এমন ভালো মানুষ কালে ভদ্রে দেখা যায়। পুকুরের পাঁক যেন! আর আমার পিসিমাটি! বাপ্! যেন পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ—"

"ধূমটা কি মামা ?"

"বচন হে, ক্ষুরধার! রাগে দুর্বাসা মুনিটি! নিত্য উদ্দীপনাময়ী, রণচণ্ডিকা!"

বামাচরণ আফিং সেবা করতেন এবং তার সহকারী ছিল তাম্রকূট! নিত্য-উৎসারিত ধূমকুণ্ডলীতে অতিপুষ্ট গোঁফ জোড়া, চোখের উপর ঝুলে পড়া

ভ্রূণযুগল আর চুলগুলি পেকে তাম্রবর্ণ ধারণ করেছিল। কথার বাঁধুনি ছিল; কিন্তু তা চিবিয়ে চিবিয়ে। যেন মনটি রসে রোমন্থন করছে। কথায় গতি মন্দাক্রান্তা।

বামাচরণ বললেন, "আমি থাকি কোথায় সেই বাঙালীটোলায় আর তিনি এই বাবারিতে! পিসিমার হুকুম হ'ল, বোশেখী পূর্ণিমার সত্য-নারাণের সিন্নি খেয়ে যেতে হবে তাঁর বাড়িতে! "না" বললে রক্ষে আছে! এলুম সকাল সকাল। আশা যে, শীগ্‌গির শীগ্‌গির ফেরা যাবে। কিন্তু পিসিমার রোগটাও জানা ছিল। লক্ষ্মীপুজোর বরাতে শেষ পর্যন্ত ফেঁদে বসবেন মহামায়ার সাড়ম্বর পূজো!—আঁবই করেছেন সাতাশ রকমের—মায় সেই জরদালু থেকে আরম্ভ করে, বোম্বাই, ল্যাংড়া,—তো ভরত-ভোগ, কিষণ ভোগ, ফজ্‌লি, গঙ্গাসাগর—শেষ গিয়ে ঠেকেচে পাতুকায়—"

"পাতুকাটা কি দাদামশাই?"

"সেই যে কালো কালো ছোট ছোট আমগুলো,—"

"আর কাগ্‌ দেশান্তরি?"

"তার অম্বল হয়েছিল।"

"তার পর?"

"ক্ষীরের সঙ্গে,—যে-সে ক্ষীর নয় গো! ভঁয়সার ক্ষীর। তার সঙ্গে—বোম্বাই—বুঝেছ, বোজেগুর—সে একেবারে, ব্লড্‌—ব্লড্‌!"

"মানে?"

"গায়ে রক্ত গজিয়ে উঠবে।…শেষ করতে পাক্কা আড়াই ঘণ্টা কাবার হ'য়ে গেল। ঠিক সাড়ে বারোটার সময় একটা কেঁদো লাঠি হাতে ক'রে—অগস্ত যাত্রা শুরু হ'ল।"

পুলিস সায়েবের বাংলো পেরিয়ে এই তেঁতুলগাছের মগ্‌ডালটায় নজর প'ড়লো—নির্মেঘ আকাশ, ফুট্‌ফুটে জোচ্ছনা। কোথাও কিচ্ছু নেই; কিন্তু হঠাৎ ছাঁৎ ক'রে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল! দূরে সায়েবের কুকুরগুলো ঝাঁউ, ঝাঁউ করে ডাকচে। পেঁচার ডাক্! আকাশে মারওয়াড়ির দোকানে কাপড়-ফাড়ার আওয়াজ। গায়ে কাঁটা দেবেই! কিন্তু বামাচরণ ভয় পাবার

বাজা নয়। বামাচরণ ভীতুও নয়, আবার হোঁংকাও নয়। অবিশ্যি, লাঠিটা বাগিয়ে ধরলুম,—হাত থেকে না ফসকে খসে যায়।

চ'লচি আর ব'লচি, হে বাবা ব্রজকনন্দন! তুমি যে ঐ তেঁতুলগাছে আছ তা আজকালকার ইংরিজি পড়া আহাম্মকেরা অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু আমার সব দোষ থাকতে পারে, নেশাটা আস্টা—তা অস্বীকার করলে যে আমার কালাচাঁদের উপর অসম্মান দেখানো হয়, কিন্তু মন্দ লোকে কি না বলে—জানে কি তারা যে বামাচরণ কি বিপদে প'ড়ে ওকে ভোজেছে?

"কি রকম মামা?"

"যৌবনে ভিড়ি কাং হয় আর কি গ্রিহিণী রোগে।"

"গ্রিহিণী নয় মামা, গ্রহণী!"

"তা হবে বাবা,—একটা ই-কার বাদ দিলে—যে ভুগেছে সে জানে, ও ব্যাধির কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ হয় না!"

"তার পর?"

"তখন আমাদের নিত্যানন্দ কবরেজ তাঁর ছাগলাদ্য দাড়ি নেড়ে, হিঁকো হিঁকো ক'রে হেসে বললেন: ইসে বাবা, বামাচরণ 'কালাচাঁদ' না ভোজলে এ যাত্রায় রক্ষা পাওয়ার আর তো কোন উপায় দেখিনে! তারপর সেই প্রাণ-মাতান হিঁকো হিঁকো হাসি আর থামে না। গায়ে জোর থাকলে উঠে ব'সে যা•থাকে কপালে ব'লে ঠাস ক'রে গালে একটা চড় বসিয়েই দিতুম হয় তো বা,—কিন্তু ভগবানের দয়া অসীম ঐ কবরেজের উপর,—উঠবো কি, বিছানায় প'ড়ে চিঁ চিঁ ক'রছি!

"সেই আমার কালাচাঁদ! ওকে নেশা বললে—বুঝেছ কিনা ব্রজেন্দর, শিবকেও গেঁজেল বলতে হয়!"

কে একজন অন্ধকার থেকে বললে: "শিব কি তা নন্?"

"বাপরে! তাঁর নিন্দে! গঞ্জিকা বলে ইতর লোকে—ও হ'ল স্বরিতানন্দ! যত্তো পারে কুঁচকি কণ্ঠা ঠেসে খাও—আর মারো একটি দম! পেটের মধ্যে সব সমপট্ট! ভুঁইকম্পেও অমন সমভূমি হয় না পাহাড় পব্বোত।"

"তারপর, আপনার ব্রজকনন্দন কি বললে?"

"কিচ্ছু না। সাধ্যি কি কথা কয় চকোত্তি বামুনের সামনে এসে? ন' থেই সুতো কি বৃথায় ঝোলে বামুনের গলায়? চোলছি আর বোলছি, লোকে বলে এংবারি তুই আছিস ঐ তেঁতুল গাছের মগাটায়; কিন্তু প্রত্যয় হয় না, একটা কিছু তোর কারসাজি না দেখলে! বলি, পারিস দেখাতে?

"একশো হাত দূর থেকে বুড়ো আঙুলে পৈতে জড়িয়ে জপছি ব্রহ্ম-মন্তর গায়ত্রী। উঃ কি তেজ মন্তরের—গা চপ্‌ চপ্‌ ঘামে—যেন সুরধুনী বইছে গায়! আর বুকের মধ্যে—যেন বালাপোষের তুলো ধুন্‌চে আমাদের গোমিস মিঞা! ব্রহ্মতেজ কি অসাধারণ মাইরি! থামিনি! চলেছি গুড়ি গুড়ি! জিভ জড়িয়ে আসে—ওঁ বলতে বেরোয় বোং।"

অন্ধকারে হাসির খুক্ খুক্ শব্দ শুনে বামাচরণ বললেন: "হাসছো এখন; পড়তে যদি সে পাল্লায় বাছাধনরা—সাতদিন দাঁত কপাটি লেগে থাকতে এই গাছতলায়! রোজা ডেকে হলুদ পুড়িয়ে জ্ঞান করাতে হেতো, তা তোমায় আমি বলে দিচ্ছ, বোজেন্দর!"

"তারপর, তারপর দাদা?"

"গাছতালায় এসেছি কি না এসেছি। সমস্ত গাছটাই উঠলো হুড়মুড়িয়ে দুলে! আর মগডাল থেকে পড়লো একখানি ঝাড়া দশ ইঞ্চি চৌপল থান ইট; পড়ে শব্দ হল ঠং—আনকোরা মিন্টের টাকার মতো! ঠিক সামনে! বেঁচে গেল পৈত্রিক মাথাটি আমার। মাথাটা যে একটু ঘোরেনি, আর চোখে সরষে ফুল দেখিনি বললে সত্যের উপক্ষয় হবে। কিন্তু বামাচরণের ভুল হয়নি, অবস্থা দেখে ব্যবস্থা! গায়ত্রী ছেড়ে—সোজা ধরেছি রামনাম!

"বললুম, কেয়াবাৎ এংবারি হাতের তারিফ তোর! সামনে ইটখানা পড়ে আছে টাট্‌কা…যাকে বলে গরমাগরম, একটা কোণার এতটুকু বালি পর্যন্ত খসেনি!…ভৌতিক, একদম ভৌতিক! আমরা তোমরা ফেললে, ইটখানা চৌ-চাকলা হয়ে ভাঙতো, না বাবাজীবন?"

"নিশ্চয়!"

"তারপর দাদা?"

"ধোপানি তখনো ফেরেনি কুঠিতে। দৌড়ে এসে বললে: কেয়া হুয়া বাবুজি?

কুছ্ নেহি, মেম জি…এক লোটা পানি তো মাংগাও!

সবুর সয়না…ছুটলাম সোজা বাবলা বনের মধ্যে দিয়ে।

বাড়ী ফেরার পথে দেখি তখনও দফাদার ডাক্তার পড়ছে তার সেই মোটা মোটা বইগুলো!

বললুম: একটা পেট কামড়ানির ওষুধ দাও। সে দিলে কি না জেলস্… বললুম: ডাক্তার, একাজ্বরির ওষুধ দিচ্ছ কেন? সে আমার বিদ্যে দেখে হাসে জানে কিনা বামাচরণ গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ।"

"তা হলে আপনি ভূত মানেন?"

"নিশ্চয়! আমি ভেবে দেখেছি যে ভূত অস্বীকার করলে ভগবান অস্বীকার করতে হয়। তবে এলো কোত্থেকে এই বামাচরণ চক্কোত্তী, শুনি!"

বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়তে আরম্ভ হল।

ব্রজেন্দ্র বললেন, "কাছাকাছি আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু মড়া ফেলে তো আর যাওয়া যায় না!"

রাজেন্দ্র বললে, "আপনারা যান…আমি তো আছি।"

"কে রে তুই? সাবাস্!"

"ও রাজু…"

"তা ছাড়া আর কে হবে?" বলে বামাচরণ বললেন, "চলো চলো…আমাদের নিমোনিয়া হবে বোজেন্দর…আমরা ছা-পোষা মানুষ!…ওদের কি? টাঁসে ত একাই টাঁসবে। কিছু স-পুরী এক-গাড়ে যাবে না।"

"তাই তো! ভাবছি!"

"আরে,. মাথা দিয়ে ভাববে তো! যদি শিলে মাথাই ভেঙে চুর হয় তো ভাববে কি দিয়ে? শুভস্য শীঘ্রম্।"

"বাবু হামভি…"

"আবার চাকরটা যেতে চায় যে, মামা!"

"কাহে রে?"

"ডর।"

"ডর কৌন্ বাৎ কা ?"

জোরে চেপে ঝড় আর শিলা বৃষ্টি আসাতে সবাই ছুটে চলে গেল আশ্রয়ের সন্ধানে।

রইল একা রাজু।

শেষ রাতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আলো দেখা দিতেই সবাই ফিরে এসে দেখলে মড়া পড়ে আছে, আর কেউ নেই!

"ও আমি আগেই জানতুম, বোজেন্দর।"

"কিন্তু কাজট কি ভালো হল? ভারি অকল্যাণ,—মমা!"

"দাঁড়াও অকল্যাণ,—লাশটা যে উঠে চলে যায়নি, এই আমাদের ভাগ্যি!"

"রেজোর উপর আমার ধারণাটা কিন্তু ভালোই ছিল।"

"ভুলে গেলে এটা কোন্ কাল?

"তা ঠিক।"

"সরে এসো,—সবাই সরে এসো! সব্বাই শোন বামাচরণ চক্কোত্তির কথা,—নৈলে প্রাণ খোয়াবে, বলে দিলুম।"

সকলে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াল। ব্রজেন্দ্র বললেন, "ব্যাপার কি মামা?"

"ব্যাপার গুরুচরণ!"

"সে কি?"

"দেখছো না, মড়া নড়তে সুরু করেছে।"

"তাই তো!"

"পেটটা ফুলে ঢাক হয়ে গেছে।"

"এ সব এংবারি বেটার খেলা! বামুনের মড়া, বিশেষ করে এয়ো স্ত্রী,—আর রক্ষে আছে!—বোজেন্দর, যা বলি শোন।"

"কি মামা!"

"আমরা সবাই বামুনের ছেলে আছি—ডান হাতের বুড়ো আঙুলে পৈতে জড়িয়ে—চীৎকার করে বলবে রাম, রাম, রাম; দেখবে একতার জোর—ভয় আমার ঐ চাকরটাকে নিয়ে, ওকে না ভর করে বসে ব্যাটা!"

"এই কেয়া নাম তুমারা ?"

"গরভূ—"

"হট যাও গরভূ—তফাৎ যাও। বল সবাই এক সঙ্গে।"

"রাম, রাম, রাম।"

"ব্যস্,—নড়চে ফের, বল।"

"রাম, রাম, রাম।"

"ওই দেখ উঠছে। আরো চেঁচিয়ে বল—"

"রাম, রাম, রাম।"

"ঐ আসচে, পেছু হটে—সবাই পেছিয়ে—"

হাসতে হাসতে মড়া-ঢাকা লেপের ভিতর থেকে রাজু এলো বেরিয়ে।

"সাবাস বাচ্ছা! জীতে রহো—এই তো মরদের সাহস।"

ছোট ছেলেদের জন্য লেখা গোটা কয়েক গল্প শরৎ শেষ অসুখে পড়েও লিখেছিলেন। তাতে নাম না দেওয়া থাকলেও, সেগুলি ইন্দ্রনাথের (রাজুর) কাহিনী ফলিয়ে সাহিত্য করে লেখা হয়েছে।

বইখানি এম, সি, সরকারের সুধীর বাবু প্রকাশিত করেছেন। শেষ কদিন শরৎচন্দ্র সর্বদাই ভাগলপুরের কথা বলতেন। একদিন উমাপ্রসাদকে ডেকে বললেন, "বিজু চল ভাগলপুরে যাওয়া যাক। সেখানে ভারি চমৎকার গঙ্গা। দুজনে পাথর ঘাটে স্নান করবো, যাবে ?"

"যাবো বৈ কি !"

সে যাওয়া আর হয়নি।

শ্রীকান্তে শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথের যে সব বীরত্বের কহিনী লিখেছেন সেগুলিকে একেবারে নির্জলা সত্য বলে ধরে নিলে আমাদের ভুল হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। কেন না শ্রীকান্ত বইখানি নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের আত্ম-জীবন-চরিত নয়। সেরকম ভুল যাঁরা করেন তাঁরা ভুলে যান যে, শ্রীকান্ত বইখানি জীবনী নয়, সেটিও একখানি উপন্যাস মাত্র।

তবে, একখানি সাধারণ উপন্যাসের সঙ্গে এর তুলনা ক'রলে একটি বিশেষত্ব

পরিস্ফুট হ'য়ে উঠে। এই উপন্যাসখানির উপকরণ বাস্তব-ঘটনাকে কল্পনার রঙে রসে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

একটু বিশদ ভাবে দু-একটি ঘটনার বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারব যে, শরৎচন্দ্রের কল্পনা কি রকম মায়া সৃষ্টি ক'রেছে।

শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের আরম্ভেই আমরা দেখি যে, একটি 'ফুট-বল ম্যাচে'র পরিসমাপ্তির পর মারামারি; এবং বিপন্ন শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথ আততায়ীর হাত থেকে উদ্ধার করছে।

এই মারামারির সময় সেখানে বর্তমান লেখকের উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য ঘটেছিল। ভাগলপুর "টয়েন বি স্পোর্টের" একটি খেলার শেষে এ ব্যাপারটি ঘটে এবং ইন্দ্রনাথের (রাজুর) দল লাঠির জোরে বিপক্ষ পক্ষকে তাড়িয়ে দেয়।

শ্রীকান্তের (শরতের) সঙ্গে ইন্দ্রনাথের (রাজুর) এটি প্রথম দেখা নয়। কারণ এই ঘটনা ১৮৯৩-৯৪ সালে ঘটে। এই সময়ে শরতের বয়স সতের বৎসর, রাজুর আটার উনিশ হবে।

এখানে রাজুর বর্ণনাটি একটুও কাল্পনিক কি অতিরঞ্জিত নয়।

কিন্তু শ্রীকান্তকে একেবার অন্য ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে বল্‌ছে :—না তবে কি ? দাঁড়িয়ে মার খাবি নাকি ? ঐ, ওই দিক দিয়ে ওরা আস্‌চে—আচ্ছা, তবে খুব ক'সে দৌড়ো—

এ কাজটা বরাবরই খুব পারি।

শেষেরটি শ্রীকান্তের উক্তি। কিন্তু জানি যে শ্রীকান্তের সহকারিতা নৈলে সেদিনের জয় ইন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

শ্রীকান্তে, শ্রীকান্তের চরিত্রটি কল্পনার রঙে রসে এমন রূপ দেওয়া হয়েছে —যা ইন্দ্রনাথকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তোলার সহায়তা দান ক'রেছে!

তারপর ইন্দ্রনাথের সিদ্ধি এবং সিগারেটের প্রসঙ্গ। ইতিপূর্ব্বে নীলার কাহিনীতে বলা হ'য়েছে যে, শ্রীকান্ত দেবানন্দপুর থেকে নেশায় দক্ষ হ'য়ে ফিরেছে। অতএব এটি সম্পূর্ণ অলীক ছদ্ম-সাধুতা!

ইন্দ্রনাথের রাতে বাঁশী বাজিয়ে বেড়ান'র গল্প সত্য। বড়দাদার মন্তব্যটি

নির্মলা সত্য : সে হতভাগা ছাড়া এমন বাঁশীই বা বাজাবে কে, আর ঐ বনের মধ্যেই বা ঢুকবে কে ?

গোঁসাই বাগান সেকালে ছিল "রামবাবুর বাগান"; এখন শিবচন্দ্র খাঁর দৌহিত্র ধরণীবাবু এই বাগানের মালিক।

এইবার মেজ'দাদার কঠোর তত্ত্বাবধানে তিন ভাইএর নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাসের কাহিনী।

ক্যাম্বিসের খাটের উপর শুয়ে আছেন পিশে মশাই নয়—দাদা মশাই এবং বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য—রামচন্দ্র ভট্চায্।—ছোড়দা এবং যতীন দা—তুজনেই মামা—গল্পের খাতিরে দাদা হ'য়েছেন। এই সময় দেউড়িতে গৌরী সিং তুলসীদাসের রামায়ণ প'ড়তো সুর ক'রে।

টিকিট-বিলির গল্প সত্য। ছিনাথ বউরূপীর অভিযানও সত্য। তবে সবটাতেই কল্পনার রসান আছে।

বউরূপীর ল্যাজ কাটাটি শরৎচন্দ্রের "অধিকন্তু না দোষায়।" সেদিন ইন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিল না। শরৎচন্দ্রও না। এই গল্প কুসুমকামিনীর সান্ধ্য বৈঠকে শোনা—শরৎচন্দ্র তাকে এমন অদ্ভুতভাবে রূপায়িত করেছেন ! এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। কল্পনার ইন্ধনে বাস্তবের খেয়ালি পোলাও !

শ্রীকান্তের বিস্তৃত আলোচনা করলে দেখ্তে পাওয়া যায় যে এমনি করেই শরৎচন্দ্র বাস্তবকে কল্পনার সহযোগে সাহিত্যের পংক্তিভুক্ত ক'রেছেন। কিন্তু শ্রীকান্তকে তাঁর আত্ম-জীবন-চরিত ব'লে ধ'রে নিলে সমূহ ভ্রান্তির মধ্যে প'ড়তে হয়। এমন কি শ্রীকান্ত-চরিত্র শরৎচন্দ্রের চরিত্র নয় এ কথা জোর ক'রেই বলা যায়—এবং বললে সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ করা হয় না।

তবে আর একটি কথা প্রণিধান-যোগ্য। শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের জীবনের অভিজ্ঞতার উপকরণেই গঠিত। এমন কি শ্রীকান্তের সহিত শরৎ-জীবনের একটি অদ্ভুত সমান্তরলতা আছে। কিন্তু আবার এ কথাও সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তে সবচেয়ে বেশী আত্ম-গোপন ক'রেছেন।

শ্রীকান্ত চরিত্রে একটি পরিস্ফুট সংসার-নৈর্ব্যক্তা আছে; সেইরূপটি শরৎ-

চন্দ্রের চরিত্রে মাত্র ছিটেফোঁটায় ছিল ; কিন্তু তাঁর পিতা মতিলালের চরিত্রের সেইটিই মেরুদণ্ড ব'ললে একটুও অত্যুক্তি করা হয় না।

অনেক ব'লে থাকেন যে, শরৎচন্দ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে আত্ম-প্রকাশ করে গেছেন, জীবনী হিসাবে তাই যথেষ্ট। তাঁর স্বতন্ত্র জীবন-চরিতের কোন প্রয়োজন নেই। শরৎচন্দ্র কিন্তু তাঁর নিজের সাহিত্যের মধ্যে অদ্ভুত আত্ম-গোপনই ক'রেছেন। এ কথা যাঁরা জানেন না, তাঁদের ভুল হওয়া কি একান্ত স্বাভাবিক নয় ?

শ্রীকান্তের আরম্ভে ইন্দ্রনাথকে লোক-চক্ষুর গোচর করার ভূমিকায় শরৎচন্দ্র বলেছেন : কিন্তু কি করিয়া "ভবঘুরে" হইয়া পড়িলাম, সে কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথ, অর্থাৎ বাস্তব রাজেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ হ'বার বহু পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র—সেকালে যখন পুরী যেতে রেল হয়নি—তখনই পায়ে হেঁটে পুরী বেড়িয়ে এসেছিলেন। ইন্দ্রনাথের থিয়েটারের দলে যোগ দেবার আগেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গীত এবং অভিনয় বিদ্যায় হাতেখড়ি হ'য়েছিল—এক যাত্রার দলে।

অতএব শরৎচন্দ্রের "ভবঘুরে" বৃত্তির গুরু রাজেন্দ্রনাথ নন্।

সৃষ্টির মহত্ত্ব উপলব্ধি ক'রে সৃষ্টিকর্তাকে জানার ইচ্ছে একান্ত স্বাভাবিক। ইংরেজিতে যাকে "ব্যাক্‌ডোর কিউরিওসিটি" বলে, এ নিশ্চয়ই তা নয়। ইংরেজি সাহিত্যে তেমন একটা ইচ্ছা এবং চেষ্টা সেক্সপীয়র সম্বন্ধে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রকে ব্যক্তিগত ভাবে জান্‌তে পারলে সাহিত্যের দিক দিয়ে কোন ক্ষতি হবে ব'লে তো মনে হয় না। অবশ্য, এখেনে শরৎচন্দ্রকে অন্যায় ভাবে উঁচু করার জন্যে সেক্সপীয়রের সঙ্গে তুলনা করার এই স্থলে লেখকের কোন দুরভিসন্ধি নেই। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান যে কোন্ ধাপে হবে তা নির্ণয় করার সময় হয়ত' আসেনি এখনও ; কিন্তু একটা স্থান হ'লেও হ'তে-পারে মনে করার মধ্যে খুব বড় বেশী অপরাধ হয় না, হয়তো।

বর্ত্তমান লেখকের শরৎচন্দ্রকে বাল্যকাল থেকে জানার সুযোগ এবং

সৌভাগ্য ঘটেছিল। শরৎচন্দ্র তাঁকে ১৩৩৯ সালের ৩০শে আশ্বিনে সামতাবেড় থেকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন—"কত কাল পরে যে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে ব'সেছি তার ঠিকানা নেই। বোধ করি বছরখানেকের মধ্যে একখানা চিঠিও লিখিনি। তুমি আমার বিজয়ার ভালবাসা জেনো। এ স্নেহ কোন দিনই কম নেই,—কম হয়নি।" সে যাক্।

এই চিঠিতে দেখা যায় যে দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল। বর্তমান লেখকের শ্রীকান্ত বারম্বার পড়ার পরও দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, শরৎচন্দ্রের জীবন-চরিত—শ্রীকান্তে নিঃশেষে লেখা হয়ে যায়নি।

শরৎচন্দ্রকে বুঝতে হ'লে শরৎ যে সময়ে ভাগলপুরে অতিবাহিত করেন সেই সময়ের বাঙ্গালী সমাজের কথা কিছু জানা দরকার। কেন না, তাঁর লেখার বহু উপকরণ ভাগলপুরের সেই সময়কার ঘটনার প্রতিচ্ছায়ায় পরিপূর্ণ!

তা ছাড়া মানুষটি-ই বা কোথা দিয়ে, কেমন ক'রে এমনটি হ'য়ে গ'ড়ে উঠ্‌লেন, তা জানার আগ্রহ মানুষের থাকা অন্যায় ত নয়ই পরন্তু একান্ত স্বাভাবিক।

ভাগলপুর এখন বিহারে গিয়ে পড়েছে; কিন্তু বছর কয়েক আগে বাংলার অন্তর্ভুক্তই ছিল। সেখানে উদ্যমশীল অভাবগ্রস্ত চাকুরে-বাঙালী গিয়ে তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করেন। প্রতিযোগিতাও ছিল কম।

এখানে বাঙালী ব'লতে বাংলা ভাষা-ভাষী লোকদের কথাই ধ'রতে হবে। এমন যাওয়া মুসলমান আমলেও ছিল; কিন্তু সে যুগের বাঙালীরা তাদের আচার-ব্যবহার, এমন কি, মাতৃ-ভাষাও ভুলে গিয়ে না-মুর্গি, না-বটের অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েছেন! শুন্‌তে পাই এই অবস্থা-প্রাপ্ত বাঙালী অন্য জায়গাতেও আছেন।

কিন্তু ইংরেজ আমলে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা কিম্ভূতকিমাকার ভাব ধারণ করেন নি। তার অন্যতম দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্র নিজেই!

মুঙ্গের আর ভাগলপুর আজকের বিহার প্রদেশের বাঙালী-অধ্যুষিত দুটি কাছাকাছি শহর। এদের মধ্যে জামালপুর এক সময়ে ই-আই

রেলের কর্মকেন্দ্র ছিল। সেই সময়ে বহু বাঙালী কর্ম-উপলক্ষে এখেনে বাস করতেন। মুঙ্গের থেকে জামালপুর বেশী দূর নয়, অতএব মুঙ্গেরে বাঙালীদের একটি সুন্দর উপনিবেশ গড়ে ওঠার সুযোগ ঘটেছিল। মুঙ্গের সীতাকুণ্ডের জন্যে বিখ্যাত। এখানে গঙ্গা উত্তর-বাহিনী এবং প্রসিদ্ধি আছে যে, মুঙ্গেরের কষ্টহারিণীর ঘাটে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পথ-ক্লান্তি অপনোদন ক'রেছিলেন। এই হিসেবে মুঙ্গের ভাগলপুরের চেয়ে লোভনীয় স্থান। তার উপর মুসলমান আমলে মুঙ্গের প্রসিদ্ধিও লাভ ক'রেছিল।

সেকালে ফ্যাসানের দিক দিয়েও মুঙ্গের ভাগপুরের অগ্রণী ছিল। এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে পাটনা এবং ক'লকাতার ফ্যাসান প্রথমে আসে মুঙ্গেরে এবং তারপর রক্ষণশীল ভাগলপুর ধীরে ধীরে তার অনুকরণ করে। মুঙ্গেরে সে কালে কাঁচা পয়সার গরম ছিল। যাত্রা-থিয়েটারের রব-রবা ছিল। মুঙ্গেরের ব্রাহ্ম-মন্দির ভাগলপুরের ব্রাহ্ম-মন্দিরের চেয়ে পুরোনো। মোট কথা, ভাগলপুর অগ্রগতিতে মুঙ্গেরের আজও পিছনেই চ'লে থাকে।

একটি নূতন উপনিবেশে আদিতে—যখন নবাগতের সংখ্যা থাকে মুষ্টিমেয়, তখন তারা যেন এক পরিবারভুক্তের মত ঘনিষ্ঠতায় বাস ক'রতে থাকে। একজন দাঁড়ান কর্তার মতো, তাঁর আদেশ, নির্দেশ, অনুজ্ঞা এবং বিধি-নিয়মে বাকি সকলে চলে। ভাগলপুরে বাঙালীকে গোড়ায় জঙ্গল কেটে বাস ক'রতে হ'য়েছিল। যারা আদিতে এসে বাঙালীটোলার সৃষ্টি করেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন ব্রাহ্মণ। বাঙালীটোলার প্রথম বাড়ী গঙ্গার উপর মাণিক সরকার তৈরি ক'রেছিলেন। মাণিক সরকার—আদামপুরের নীল কুঠির সরকার অর্থাৎ ম্যানেজার ছিলেন। সরকারের এখন একটা মানে ছোট হ'য়েছে; কিন্তু মাণিকচন্দ্র সেই শ্রেণীর গোমস্তা সরকার ছিলেন না। নীলকুঠি থেকে পাকা পুলের উপর দিয়ে তাঁর বাড়ী আস্‌তে হ'তো। এই কাজের মুনাফা সরকার মশাই জমিদারী ক'রে গেছেন। এবং মাণিক সরকারের বংশধরেরা—মাণিক সরকারের পুরোনো বাড়ীকে নূতন ক'রে আবার এসে বাস ক'রছেন। এঁরা মধ্য কলিকাতার

বাড়ী করে বাস করতেন। বাঙালীটোলার এই বাড়ীর পর ব্রাহ্মণের বাস শুরু হয়—এবং দু-চার ঘর কায়স্থ বাদে প্রকৃত এটি ব্রাহ্মণ পাড়া।

কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদের আগে এসে প্রায় সকলেই জমিদারী ক'রেছেন।

এক-শো দেড়-শো বছর আগে ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা ছিল, তাই ভাগলপুরের বাঙালী সমাজও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যেই পরিচালিত হ'তো। কায়স্থরা সংখ্যায় অল্প হ'লেও সম্পত্তিপন্ন ছিলেন; কিন্তু তাঁরা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মেনেই চ'লতেন। হিঁদুয়ানির দিক দিয়ে ভাগলপুরের বাঙালী-সমাজ মুঙ্গেরের বাঙালী-সমাজের চেয়ে বেশী রক্ষণশীল ছিল।

এর উপর আর একটি বড় কথা ছিল। যে সব বাঙালী মুসলমান আমলে এসেছিলেন, তাঁদের অবস্থা কতকটা শোচনীয় দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা বাংলা ছেড়ে "ছিকা-ছিকি" ধ'রেছিলেন। চেহারা আচরে-ব্যবহারে তাঁদের মধ্যে বাঙালীত্বের স্বরূপ খুঁজে বার করা শক্ত। সে দল এখনও বিরল নয়।

নতুন দল এটাকে দুর্গতি মনে ক'রে—তা' থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার বিধিমত চেষ্টা ক'রেছিলেন। নিজেদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার এবং আচার ব্যবহারে স্বদেশের ধারা প্রবাহিত রাখার চেষ্টার সুফল আজও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বর্তমান শাসনতন্ত্র সেটিকে বড় একটা সু-নজরে না দেখ্‌লেও, ভাগলপুরের বাঙালী সমাজ আজও গর্ব করার অনেক-কিছু দেখাতে পারে। এখেনে বাঙালীর সাহিত্য-পরিষৎ শাখা আছে, সঙ্গীত-সমাজ, ভাগলপুর ইন্সটিট্যুট, হরিসভা, দুর্গাস্থান, কালীস্থান, ব্রাহ্ম-সমাজও আছে। এই শহরে রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার জন্মেছিলেন—তাঁর সঙ্গীত এবং সাহিত্যের কৃতিত্বের কথা ভাগলপুরের বাঙালীর শ্লাঘার বস্তু। শরৎচন্দ্রের শিক্ষা-দীক্ষা সাধনার কেন্দ্র হিসাবে ভাগলপুর বাংলা দেশের স্মরণীয় স্থান। ভাগলপুর তেজনারায়ণ কলেজও একজন বাঙালীর পরিকল্পনা-প্রসূত। তাঁর নাম ডাঃ লাড্‌লিমোহন ঘোষ। তেজনারায়ণ সিং তাঁরই অনুপ্রেরণায় এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন।

যাক্, কথা এই যে, বঙ্কিমের বন্দে-মাতরম্ রচনার আগেই ভাগলপুরের প্রবাসী নয়, প্রান্তবাসী বাঙালী নিজেদের বাঙালীত্ব রক্ষা করার প্রাণপণ

চেষ্টা ক'রে কায়েমি বন্দোবস্ত ক'রে গিয়েছিলেন। সেখানকার বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানগুলি সিপাই বিদ্রোহের আগেকার।

একদিন যা সকলের সমবেত চেষ্টায় হয়েছিল পরে তা আবার জাতিত্ববোধ জাগাতে দুটো তিনটেও হ'য়ে ভাগ হয়ে গেল। এই দলাদলি, ভাঙ্গা-গড়ার বিষম-কালেই শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে ছিলেন। ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র শৈশব থেকে ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন। পাঁচ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বয়স পর্যন্ত মানুষের শিক্ষা-দীক্ষায়, চরিত্র, সংস্কার গড়ে ওঠার কাল। আমাদের বক্তব্যও মূলত শরৎচন্দ্রকে অবলম্বন ক'রেই চ'লবে।

ভাগলপুরের সেকেলে বাঙালী যে কি রকম অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত দিলে এ কথা আরও পরিষ্কার হবে ভরসা করি।

তারাপদ ঘোষাল মশাই তখন জেলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার ছিলেন। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বহু-ভাষা-বিদ্,—গ্রীক্, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, সংস্কৃত, পালি ইত্যাদি বহু ভাষায় তাঁর দখল ছিল প্রগাঢ়। অবশ্য, তিনি ইংরেজিতে এম-এ তো ছিলেনই। ছেলেবেলা শুনতাম তিনি বত্রিশটা ভাষা জান্‌তেন।

উদার প্রকৃতির মানুষ। সকল বিষয়ে দৃষ্টি তাঁর গভীর এবং প্রশস্ত।

ইস্কুলের হাতায় নারকুলে কুলের অসংখ্য গাছ ছিল, ফলও ফলতো অসম্ভব। কিন্তু তাঁর শান্ত-শাসনে, তাঁর অজ্ঞাতে একটি ফলও কোন ছাত্র ছিঁড়ে খেতো না। কুল-পাক্‌লে এক-একদিন ঝুড়ি ঝুড়ি পাড়া হচ্চে, আর ছেলেদের মধ্যে বাঁটা হচ্চে। বিচার-বুদ্ধিকে ছেলেদের মনে এমন দৃঢ় করে দেবার ব্যবস্থা সচরাচর ইস্কুল-পাঠশালায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আবার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও ছিল অতিশয় বিচিত্র। সে যুগে ইস্কুলে ম্যাজিক দেখান, কুস্তি শেখান এবং ছেলেদের দিয়ে অভিনয় করান—একটা অবাক কাণ্ড।

অভিভাবকেরা তখন খেলার মর্মই বুঝতেন না। অভিনয় নিয়ে চাপা আলোচনাও চলতো বাড়ি বাড়ি, কিন্তু এমন সংযতবাক্ রাশ-ভারি মানুষ ছিলেন তিনি যে, প্রতিবাদও কেউ করতো না, তাঁর পাণ্ডিত্যের উপর সকলের বিশ্বাসও ছিল অপরিমেয়।

সে বছর গ্রীষ্মের ছুটির দিন সন্ধ্যার সময় ছেলেদের আমোদ-প্রমোদের জলসায়" অভিভাবকেরাও আহূত হ'য়েছিলেন। জলযোগের পর রঙ্গমঞ্চে সীতার পাতাল প্রবেশের অভিনয়ের ভূমিকায় ছেলেদের প্রবর্ত্তিত কনসার্ট বেজে উঠলো। তারপর অতি সংক্ষেপে ঘোষাল মশাই বুঝিয়ে দিলেন কি সুফল পাওয়া যায় এই অভিনয় করাতে।

মাঙ্গলিক গানের পর—লাল শালুর পর্দা উঠে গেলে দেখা গেল শ্বেত পদ্মের উপর ব'সে আছেন দেবী সরস্বতী—বীণা-রঞ্জিত পুস্তক-হস্তে! তাঁর পায়ের কাছে রাজ-হংস। ঋষিবালকেরা গান ধরলে—যা কুন্দেন্দুতুষারহার-ধবলা… ধূপ-ধুনোর গন্ধে চারিদিক আমোদিত!

চারিদিকে চটাপট হাততালি!

বাঃ! বাঃ! ক্যাপিট্যাল্! একসেলেণ্ট!

এমন সময় খাঁ মশাই উঠলেন ব্যাঘ্র হুঙ্কার দিয়ে এক লাফে ষ্টেজের ওপর। সরস্বতীর পরচুলো উঠে এলো তাঁর বজ্র-মুষ্টির মধ্যে!

ফুটলাইটের মোমবাতি কার্পেটের উপর প'ড়ে লঙ্কাকাণ্ড, সেদিনের প্রমোদের আনন্দ বিপদের ঘনান্ধকারে লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল সত্যি বটে; কিন্তু চিরদিনের জন্যে তা' নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি!

সরস্বতী সেজেছিল খাঁমশাইএর তৃতীয় পুত্র ক্ষীরু।

কিন্তু প্রমোদ-প্রবণ মানুষের মন যথানিয়ম ছিদ্র-অন্বেষণ ক'রে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা বেঁধে ছিল। বাঙালী-টোলাতেই এক যাত্রার দল! কিন্তু যাত্রায় নবীনদের মন উঠে না। অচিরে আর্যসমাজ নাম দিয়ে যাত্রা দলের বাছা একটররা এক থিয়েটারের দল খুলে ফেললে। কিন্তু তাতেও আকাঙ্ক্ষা মেটে না! অবশেষে অতি-আধুনিকরা খুল্লে "আদামপুর ক্লাব।" রাজা শিবচন্দ্রের একমাত্র ছেলে কুমার সতীশ হ'লেন তার পৃষ্ঠপোষক, গৌরী সেন। রাজু ছোড়দার নেতৃত্বে তার বাড়-বাড়ন্ত। ষ্টেজ ম্যানেজার হ'লেন ম্যানেজার ললিত—আর রাজু, শরৎ, নরু, ক্ষীরু, মহেন, উপীলা ইত্যাদি ইত্যাদি ক্লাবে "নরক গুলজার" করতে লাগ্‌লেন।

কিন্তু "আদামপুর ক্লাব", শত্রুপক্ষেরা যার নাম দিয়েছিল "এ ড্যাম পুয়োর

ক্লাব”—শুধু থিয়েটার করার উদ্দেশ্য নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়নি। ক্রীকেট, শিকার, দাবা, তাস, পাশা, বিলিয়ার্ডস্ এবং পরে “ফুট বল” এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

সেদিন সাহিত্যের কদর ছিল না। তবে নভেল পড়া বাদ যেতো না এবং শেষের দিকে ছোড়দা (শরৎ মজুমদার) লিখলেন এবং অচিরে ছাপালেন “ক্রীতা।”

এমনি ক'রে দিনে দিনে প্রতিযোগিতার উত্তাপে সমাজ দ্বিধা ভিন্ন হ'য়ে প'ড়লো! রক্ষণশীলেরা—অর্থাৎ দক্ষিণ-পন্থীদের—আর্য-ধর্ম প্রচারিণীর পতাকার নীচে—হরি-সভার এক মণ্ডলী জমাট বাঁধলে।

অন্যদিকে উদার-পন্থীরা ব্রাহ্মধর্মের অতীন্দ্রিয় প্রভাবে দানা বাঁধার উপক্রম ক'রে—ভাগলপুর ইন্সটিট্যুটে সমবেত হ'লেন।

ঠিক এই সময় ভাগলপুরের বাঙালী-সমাজের ইতিহাসে একটা প্রকাণ্ড সমস্যা-মূলক ঘটনা ঘ'টে গেল।

শিবচন্দ্র তাঁর তীক্ষ্ণ প্রতিভায় অল্পকালের মধ্যে ধন-কুবের হয়ে উঠলেন এবং সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে সমুদ্র যাত্রা করলেন।

এই অমার্জনীয় অপরাধে শিবচন্দ্র এক-ঘরে হ'লেন। বাংলা দেশের সনাতন দলাদলির পুনরাবৃত্তি সুরু হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্রের তখন বয়স অল্প হ'লেও ব্যাপারটিকে হৃদয়ঙ্গম করার মতো তিনি একেবারে অবোধ নন।

এইখেনেই তাঁর মনে পল্লী-সমাজের বীজ উপ্ত হ'য়েছিল ব'ল মনে হয়।

বাংলা দেশের পল্লীর বহু ছবি শরৎচন্দ্রের লেখার রস সমাবেশে অনেক বইএ এমন অভিনব চমৎকার ভাবে ফুটেছে যার তুলনা আগেকার নামী লেখকদের মধ্যেও ছিল না।

যে কথা একদিন সাহিত্যে প্রকাশ করার সাহসে কুলোতো না তাঁদের, শরৎচন্দ্র তা অনায়াসে বোলে যেতেন। সবই মানুষের কথা, রামায়ণ মহাভারত থেকে আরম্ভ কোরে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। তারই বিচিত্র বলার ভংগী! সেই চিনি, সেই ছানা কিন্তু অভিনব পাকের গুণে তা মানুষের মনে অভিনব আস্বাদ এনে দিয়ে দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র।

যে কথা বলার সাহিত্যিকদের সাহসে কুলোয়নি কোনদিন, শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীনে' তা রণদামামার মত বেজে উঠেছিল। তার স্থান হয়নি "ভারতবর্ষে"। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির মত তা বেজে উঠেছিল "যমুনা" পুলিনে। বই হোলে তা প্রকাশ করলেন এম. সি. সরকার। কিন্তু যেদিন সাহিত্য-সমাজপতি শরৎচন্দ্রের দ্বারস্থ হোয়েছিলেন সশরীরে শরৎচন্দ্রের কুটিরে, সেদিন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় শুভদিন।

'ভারতবর্ষ' বার হোলে, শরৎচন্দ্র তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে চিঠি দিয়েছিলেন: "ওরা টাকা দিতে চায়—ওদের কাগজে লেখা দেওয়া চোলবে না।" সাহিত্যের আভিজাত্য ছিল তখন।

মাঝখানে দেখা দিলেন মজঃফরপুরের বন্ধু প্রমথনাথ! সেই ভোলানাথের দৌত্যে শরৎচন্দ্রের গলায় সোনার-চেন বকলস্ শোভা পেল!

'বিচিত্রা'র জন্যে দৌত্য কোরতে গিয়ে দেখা গেল যে, শরৎচন্দ্রের মাথা বিকানো 'ভারতবর্ষের' দোরে মাসিক এক শো টাকায়—অন্য কাগজে লেখা না দেওয়ার কঠিন সর্তে। কোন রকমে রফা হোল। অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

যুধিষ্ঠির ছিলেন মহাভারতের প্রবলেম্। তেমনি 'ইতিহাস'! যতই না কেন তুমি সত্যের ভাণ কর, অন্ধকূপ হত্যাকে খাড়া না কোরলে যে ইংরেজের রাজাই দাঁড়ায় না!

সময়ে সময়ে মিথ্যাও হয় অমূল্য! এলোপ্যাথিরা বলেন জলের ইন্জেকশনও ইন্জেকশন। বোকা মন ওতেই ভোলে। আবার হোমিওপ্যাথরা "প্লাকল্যাকে" ওষুধের গুণ দেখেন!

এ দুনিয়ার রথের চাকা টানে "ইতিগজে"। যাক্ অবান্তর।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন ওকালতি পাশ কোরে উকিল হোতে। অন্নদিদির—উপেন্দ্রনাথের মেজদিদির স্বামী ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় একজন বিরাট পুরুষ ছিলেন। তাঁর মধ্যে প্রবৃত্তিগুলি পূর্ণতা লাভ কোরেছিল। দেহটি ডন্ বৈঠক এবং ম্যাগুোর শরীরচর্চার গুণে এমন একটি সৌন্দর্য লাভ কোরেছিল যা দেখলে আর সহসা চোখ ফেরান যায় না। এক তুলনা চলে কার্তিকের সঙ্গে। ইচ্ছে কোরলে কণ্ঠ থেকে সিংহনাদ বার কোরতে পারর্তেন।

একদিনের কথা পরিষ্কার মনে পড়ে। ভবানীপুরের যত্নবাবুর বাজারের পাশে একটা ময়দার দোকানের বিজ্ঞাপনটা খুব বড় বড় হরফে লেখা ছিল। গাড়ি কোরে যেতে যেতে, সেই বড় হরফের সমুচিত মূল্যদান কোরে তিনি শব্দব্রহ্মকে উচিত সম্মান দান কোরে যে হুংকার ছেড়েছিলেন, তার কাছে চিড়িয়াখানার আধপেটা খাওয়া সিংহ-গর্জন কোথায় লাগে! আনন্দে উদ্বেলিত হোয়ে তিনি "ময়দা" লেখার আকারের অনুপাতে যে নাদ ছেড়েছিলেন তাতে কোচওয়ান কোচবাক্স থেকে নিমেষে কোথায় "হাওয়া হোয়ে" গেল! চারিদিকে লোকারণ্য! কি হোয়েছে! কি হোয়েছে!! কি হোয়েছে মোশাই?

নাঃ, হয়নি কিছু; ঐ ময়দা লেখার উচিত মূল্য দান কোরছিলাম মাত্র! দেখা গেল ঘোড়া দুটো রাস্তায় বহুল পরিমাণে জল ত্যাগ কোরে দাঁড়িয়ে কম্পমান।

কিছু পরে কোচওয়ান ফিরলে—কোথায় গিছলে হে? প্রশ্ন। এজ্ঞে লুংগি বদলাতে! কেন, ছেঁড়া ছিল? এজ্ঞে না।

চল, চল হাঁকিয়ে যাও,—দেরি কোরেছ।

চট্টোপাধ্যায় মশাই লিলিপুথিয়ানদের "হেট" কোরতেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড "ব্রব্ডিগন্যাগ!"

ইংরেজি ১৮৯৪ সালে তিনি কিছুদিন ভাগলপুরে গিয়ে বাড়ী ভাড়া কোরেছিলেন। সেই সময় মতিলালের সংগে তাঁর নিভৃতে পরামর্শ হোত: কেন মিছে এফ-এ পড়াচ্চেন—পাঠিয়ে দিন আমার কাছে, উকিল হোলে আর আপনাদের দুঃখ থাকবে না।

শরৎচন্দ্র সেই আশায় গিয়েছিলেন বর্মায়, কিন্তু বর্মিজ পাশ কোরতে না পারায় সেখেনে জগাখিচুড়িত্ব লাভ কোরলেন। তার উপর অঘোরনাথের টাইফয়েড হওয়ায় একটা বয়কে এমন কিক্ কোরেছিলেন যে তাই দেখে শরৎচন্দ্র পিগুতে পালিয়ে যান।

মাস ছয়েক সেখানে থেকে রেঙ্গুনে ফিরে এসে ৺মণি মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় সরকারি চাকরিতে বাহাল হন। পুজুংডংএ একটা বাড়ী ভাড়া করেন এবং চক্রবাজের হোটেলে খাওয়া-দাওয়া কোরতেন।

অঘোরনাথের মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের মণিমামা উপেন্দ্রনাথের দিদিকে নিয়ে রেঙ্গুনে গেলে শরৎচন্দ্রের খোঁজ কোরে জানতে পারেন যে তিনি নাকি একটা চীনা হোটেলে পীড়িত হোয়ে আছেন। কারুর সংগে দেখা সাক্ষাৎ কোরতে অক্ষম।

সেই সময়ের ব্যাপারটা শরৎচন্দ্র কিছুতেই প্রকাশ কোরতে চাইতেন না, এবং তা জানার সাহিত্যের দিক দিয়ে কোন লাভও নেই।

রেঙ্গুন যাবার আগের দিন তিনি আমাদের বাসায় যান একখানি পিয়ার্স সোপের ছবি একটাকা দিয়ে কিনে নিয়ে। আমার একখানি 'জনসনের' পকেট ডিক্‌সনারী নেন এবং গিরীন ভায়ার কাছ থেকেও কোন একটা বই নেন।

পরে আমাকে সংগে নিয়ে পাথুরেঘাটায় ঠাকুরদের বাড়ী যাচ্ছি বোলে পথে গিয়ে বলেন যে "কুন্তলীন পুরস্কারের" জন্য আমার নামে একটি গল্প দিয়ে গেছেন "মন্দির" নাম দিয়ে। গল্পের প্লট বলেন এবং বলেন প্রাইজ পেলে মোহিত সেন প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী যেন তাঁকে দেওয়া হয়। এ সমস্ত কথা আমি সৌরীন মুখোপাধ্যায়কে বলি। তিনি রেঙ্গুনে গিয়ে অনেকদিন পরে যে চিঠি দেন তাতে লেখেন যে তোমরা পলায়নে বাধা দেবে ভয়ে তোমাদের বলিনি। শুধু দেবীনকে সংগে নিয়ে রাত ৪টের সময় ভবানীপুরের বাড়ী থেকে ষ্টীমারঘাটে যাই। কেবলমাত্র দেবীন জানতেন আমি রেঙ্গুনে গেলাম। সে অনেকদিনের কথা,—তবে প্রকাশচন্দ্র তখন জলপাইগুড়িতে ছিলেন। প্রভাসচন্দ্র ভাগলপুর ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে কাজ শিখছিলেন এবং ছোট বোনটি পার্বতী ঘোষাল মশাইএর জিম্মায় ছিল। সে ভুবনমোহিনীর মৃত্যুর পর তাঁর দাই এর জিম্মায় ছিল। পরে প্রকাশ হবে কেন শরৎচন্দ্র মজঃফরপুর পালিয়ে গিয়েছিলেন।

মানুষ অনেক সময় সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে মিথ্যে কথা বোলতে বাধ্য হয়। সুবিচারক তাকে ক্ষমা কোরে থাকেন।

শরৎচন্দ্র নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে অনেক কথা বানিয়ে বোলতে বাধ্য হোতেন। পরিবারের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যও অনেক সত্যকে চাপা দিতে হোত।

মতিলালের মৃত্যুর পর চারিদিক ধামা চাপা দিয়ে গত্যন্তর না থাকায় ভাগ্য পরীক্ষার জন্ত যে শরৎ রেঙ্গুন পালিয়েছিলেন, তা একটু বিবেচনা কোরে যেতে গেলে দেখা যায়, সে ছাড়া তাঁর অন্ত উপায়ও ছিল না।

চৌদ্দ

মানুষ-চরিত্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কোরলে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগে করা যায়। একটি প্রবৃত্তির দিক, আর একটি বুদ্ধির দিক। মহাপ্রভু এদের নাম দিয়েছেন আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, আর, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা: 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' এখানে কামের অর্থ কামনা। তাদের উৎস দু'টিই মানুষের মধ্যে আছে। একথা যে শুধু আমাদের দেশেই আছে আর অন্যদেশে নেই তা মনে কোরলে ভুল মনে করা হয়। কিন্তু এর স্ফুরণ এদেশে যেমন কোরে হোয়েছিল তেমন অন্ত দেশে হয়নি।

রাসেল সায়েব এই সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা কোরছেন তাঁর একখানি বইয়েতে এবং কতকটা দুঃখ কোরেই বোলেছেন, ওঁদের দেশের শিক্ষাটা বুদ্ধির দিকে যতখানি মনোযোগ পেয়েছে ততখানি পারেনি অগ্রসর হোতে প্রবৃত্তির দিকে। এদিকে মুস্কিল যে, শক্তির আধার হচ্চে প্রবৃত্তির কেন্দ্রটি।

একটি বিষয়ের দিকে আমরা যদি মনোযোগ দিই তাহলে তিনি যা বোল্‌তে চেয়েছেন তা অনেকটা পরিষ্কার কোরে বোঝা যাবে। ভারতবর্ষ কোনদিন বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অন্ত দেশে যায় নি। খৃস্টান মিশনারিরা যখন গোড়ায় এদেশে এসেছিলেন তখন হয়তো তাঁরা দেশ বিজয়ের কামনা নিয়ে আসেন নি। পরে বহুলোকের কামনা বাসনা জড়িভূত হোয়ে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অন্ত রকমের। যে সব মিশনারিরা গোড়ায় এদেশে এসেছিলেন তাঁরা ধর্ম প্রচারের সাধু ইচ্ছা নিয়েই এসেছিলেন। পরে নানা কারণে তা রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি। সে কথা একদিন রবীন্দ্রনাথ খুব পরিষ্কার কোরেই বোলেছিলেন: "তোমাদের একদিন দেবতা মনে কোরে সম্মান দান কোরেছিলাম; কিন্তু এখন দেখি তোমরা তা নও।" তাই সে শ্রদ্ধা আর দেখান সম্ভবপর

হয় নি। কেন যে হয়নি, তার সাক্ষ্য ইতিহাস দিচ্ছে। এ কথা কি সত্যি নয় যে, যেদিন অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীটা একেবারে মিথ্যা প্রমাণ হোয়েছিল সেদিন আমাদের মন থেকে ঐ জাতের প্রতি শ্রদ্ধাটা, কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল?

আমরা বর্তমানে নিজেদের আলোচ্য বিষয় থেকে অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছি।

শরৎচন্দ্র কেন রেঙ্গুন যাওয়ার আগে "কুন্তলীন পুরস্কার" নিজের নামে না দিয়ে অন্যের নামে দিলেন? এটি একটি এমন প্রশ্ন যাতে তাঁর চরিত্রের উপর এমন একটা আলোকপাত করে যা তাঁর সাধুতার বিরুদ্ধে যাওয়া একান্ত সম্ভবপর। বন্ধু নরেন দেব মশাই এই বিষয় নিয়ে তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে যে কথা বলেছেন তা কল্পনাপ্রসূত। মন্দির গল্প প্রথম প্রকাশের সময় তিনি শরৎচন্দ্রের কোনও পরিচয় রাখতেন না, কিন্তু যাঁদের সেই পরিচয় ছিল এবং যাঁরা এই বিষয়ের সঠিক সংবাদ রাখতেন, যেমন, উপেন্দ্রনাথ, সৌরীন্দ্রমোহন এবং আমি এঁরা সকলেই কলকাতায় ছিলেন, তাই বই লেখার আগে অনায়াসে এঁদের সংগে দেখা কোরে ব্যাপারটা পরিষ্কার কোরে নিতে পারতেন।

কেন করেননি? এই প্রশ্ন আসা খুবই সহজ এবং সমীচীন। একথা উপেন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধে উত্থাপন কোরেছেন। এর উত্তর দেবমশাই সেই বইখানিতেই দিয়েছেন। তথাকথিত "দাদা এবং ভাই" এর প্ররোচনায় তিনি সীতা উদ্ধারের প্রচণ্ড পরিচেষ্টায় বিব্রত ছিলেন। গ্রন্থকার মামাদের "দূর সম্পর্কের মামা" বোলে অগ্রাহ্য কোরেছেন। লাঙ্গলের ফালে সীতা উঠেছিলেন। সেই সীতাকে নিয়ে রামায়ণ হোল। শরৎচন্দ্রের জীবনী লেখার জন্যে তাড়াতাড়ি 'দাদা' এলেন এবং তাঁর অনুজ্ঞায় কবি বাল্মীকি কলম ধোরলেন। রাম নেই, রাবণ নেই! কিন্তু রামায়ণ আছে!

"কুন্তলীন পুরস্কার" সম্বন্ধে—পাঠক মনে কোরতে পারেন যে, এত বেশী লেখার কি প্রয়োজন ছিল? কিন্তু এর পেছনে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের খুব দামী কথা আছে।

এক কালে, শরৎচন্দ্র যে খুব বড় লেখক তা তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং স্তাবকের

দলই বোলতো ; এটাই তিনি কি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কোরতেন ? সাহিত্য আসরে গিয়ে এর কি অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে, তা বুঝতে না পেরে তিনি নিজের শক্তির উপর বড় বেশী আস্থা রাখতে পারতেন না। এদিকে রেঙ্গুন যাওয়ার সময় প্রকৃত পক্ষে সেগুলি আমার জিম্মায় রেখে যাওয়াতে তাঁর স্তাবকদের মধ্যে একটা মনোমালিন্যের স্পষ্ট ভাব ক্রমেই দাঁড়াচ্ছিল। তিনি আমাকে যাওয়ার সময় পরিষ্কার কোরে বোলেই গিয়েছিলেন যে, তিনি না বোললে পাণ্ডুলিপি কাউকে যেন না দি। আর, যদি "প্রবাসীতে" প্রকাশের সুযোগ পাই তো দিতে পারি। কয়েকটি লেখা এই গোলযোগের অবস্থায় হারিয়ে যাওয়াতে সহজে সেগুলি কাউকে দেওয়া সম্ভব হোত না, সে কথা শরৎচন্দ্র জানতেন ; তাই তাঁর সাহিত্য পরিষদ্ থেকে অধুনা প্রকাশিত 'পত্রাবলীর' মধ্যে দেখা যায় যে, আমি তাঁর লেখা ভালোবাসি বোলে দিইনে ; কিম্বা হারিয়ে যাওয়ার ভয়েই দিইনে। এ বিষয়ে খোলা কথা বোললে অন্তর গ্লানিই করা হয়। এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, কেউ কেউ শরৎচন্দ্রের লেখা দিতে পারেন আশা দিয়ে কোনো নামী কাগজে নিজের লেখা চালাবার চেষ্টা যে কোরতেন না এমন নয়। তখন "সাহিত্যের" সমাজপতি মশাই যদি কারুর লেখা কাগজে বার কোরতেন তো সেই লেখক মনে কোরতেন—তিনি বাজিমাৎ কোরেছেন।

বন্ধুবর শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখছেন—দীপালী কাগজের দোল সংখ্যায় (১৭ই মার্চ ১৯৩৮)।

"ইতিমধ্যে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটলো তাঁর লেখা 'বাল্যস্মৃতি' এবং 'কাশীনাথ' গল্প "সাহিত্যে" ছাপান নিয়ে। সাহিত্য-সম্পাদকের কৃপা-লাভের বাসনায়, অর্থাৎ নিজের লেখা গল্প 'সাহিত্যে' ছাপাবার সুবিধা হবে ভেবে আমাদের এক বন্ধু শরৎচন্দ্রের লেখা ঐ দুটি গল্প কোনরকমে হস্তগত করেন ; কোরে শরৎচন্দ্র এবং আমাদের সকলের অজ্ঞাতে ও-দুটি লেখা চুপি চুপি "সাহিত্য" সম্পাদকের হাতে তুলে দেন এবং 'সাহিত্যে' তা ছাপা হয়। আমরাও এ অপরাধ কোরেছিলাম। সুরেনের কাছ থেকে এনে 'বোঝা' গল্প ছেপে দিলুম যমুনায়।"

এজন্য শরৎচন্দ্র বহু অনুযোগ জানিয়ে চিঠি লেখেন ফণিপালকে এবং,

আমাকে। লেখেন, তাঁর অযত্নে যেন তাঁর আগেকার কোনো লেখা আমরা আর-না ছাপাই।

চন্দ্রনাথ গল্পটি পাচ্ছি না। সে লেখা সুরেনের হস্তস্খলিত হয়েছিল ফন্দিবাজীতে। চন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ফণীন্দ্র পাল অনুযোগ কোরেছিলেন। সে কথা তাঁকে লেখা হয়। জবাবে তিনি ফণীন্দ্র পালকে লিখলেন,—উপীন আমাকে অনেকবার লিখলে সে চন্দ্রনাথ পাঠাচ্চে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পেলাম না। বোধ করি সে হাতে পাচ্চে না, তাই। অলমতি বিস্তরেন!

সেই সময়ে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে "হবু" সাহিত্যিকের দল নিজের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করার প্রাণপণ চেষ্টায় ছিলেন।

কিন্তু তাতে ভবি ভোলে না।

আজও বুঝতে পারিনে শরৎচন্দ্র তাঁর ছেলেবেলাকার লেখাগুলি আমার জিম্মায় রেখে আমাকে কেন যে অযথা বিব্রত কোরেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র ছাপার সময় যাঁরা অগ্রসর হোয়ে চিঠি ছাপাতে দিয়েছিলেন তাঁরা যে বেছে বেছে চিঠি দিয়েছিলেন—তরে প্রমাণ এই কয়েক ছত্রেই পাওয়া যায়। ঐ বাছাই চিঠিগুলির মূল্য কি?

যদি সেই অনুমান একজন বিশ্বাস কোরে বসে তো তার অন্যের সংগে মনোমালিন্য হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। রেঙ্গুনে বোসে শরৎচন্দ্র এটি জানতেন এবং বুঝতেন; কিন্তু সেকথা তিনি কাউকে প্রকাশ কোরে বোলতে পারতেন না। শুধু আমার কাছে আসতো অনুযোগের পর অনুযোগ।

তিনি চিঠির পর চিঠিতে জানাতেন, 'প্রবাসী' ভিন্ন অন্য কোন কাগজে তাঁর লেখা তাঁকে না জানিয়ে যেন বার না হয়।

ঠিক এই সন্ধিক্ষণে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুরে এলেন হাকিম হোয়ে। আমাদের সাহিত্য-সংহার সভায় মাসে একদিন কোরে শরৎচন্দ্রের যে সব লেখা আমার জিম্মায় ছিল তা পড়া হোত।

এই সংহার-সভার একটি চমৎকার নিয়ম ছিল। প্রত্যেক সভ্যকে প্রতি শনিবারে আট আনা চাঁদা দিতে হোত এবং অধিবেশনের আগে গুণতিতে যিনি সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী লুচি তাড়াতাড়ি ওড়াতে পারতেন সেদিন তিনিই সংহারপতি হোতেন। সে বিষয়ে অধ্যাপক সুরেন সেন মশাইকে কেউ হারাতে পারতো না।

শরৎচন্দ্রের এই লেখা তাঁর খুব ভাল লাগাতে জ্ঞানেন্দ্রবাবু বোললেন, রামানন্দ বাবুর সংগে তাঁর বিশেষ আলাপ থাকতে সে কাজ তিনি সিদ্ধ কোরতে পারবেন। আমরা আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলাম যেন! দুর্বিষহ আনন্দে খাতা থেকে নকল কোরতে লেগে গেলাম। দুটো খাতা হোয়ে গেল। লেখা শেষ হোলে জ্ঞানেন্দ্রবাবু পূজোর ছুটিতে বাড়ি গেলেন। পূজোর ছুটির পর তিনি বদলি হওয়াতে আর ভাগলপুরে ফিরে এলেন না। 'প্রবাসীতে' লেখা বার হয় নি। কারণ? শোনা গিয়েছিল গল্পে "এলোকেশীর" নাম থাকতে 'ব্রহ্ম কৃপায়' তা অদেয়ম্, অপেয়ম্ এবং অগ্রাহ্যম্ হোয়ে গেল। তখন সেই যুগ: ষ্টার থিয়েটার কোন দিকে যাব মশাই, জানেন? জানি কিন্তু বোলবো না। হায় এলোকেশী! হায় শরৎচন্দ্র!

কিছুদিন পরে পরম বন্ধু শ্রীমান ভট্টজি চিঠি দিলেন। লেখা কিন্তু তাঁর নিজের হাতের নয়! তারপর সৌরীন ভায়ার এক চিঠি—তাঁদের কাগজে (ভারতী) "বড়দিদি" বার হোয়েছে। শীঘ্র বাকিটা পাঠাও। শরৎচন্দ্রকে চিঠি দিলাম। উত্তর এলো "অগত্যা"! মনে হয়, বিভূতিভূষণ ও নিরুপমা দেবী চিঠি দেওয়াতে শরৎচন্দ্র তাঁদের অনুরোধ এড়াতে পারেন নি।

* * * *

পরে যা শুনেছি তা এখানে লিপিবদ্ধ কোরলে ব্যাপারটার খেই খুঁজে পাওয়া যাবে বোলে মনে হয়।

প্রবাসী কাগজ থেকে 'বড়দিদি' প্রত্যাখ্যাত হোয়ে লেখাটি স্বর্গীয়া সরলা দেবীর হাতে যায়। তিনি শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং ⁄মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে লেখাটি দিয়ে 'ভারতী'তে প্রকাশ করার ইচ্ছা জানান। এই হাতে হাতে ঘুরতে ঘুরতে লেখার শেষাংশটি লুপ্ত হয়। তখন তাঁরা

বহরমপুরে চিঠি দিলে বিভূতি ভট্ট আমায় চিঠি দিয়ে অনুরোধ করলেন যে, বাকিটা না দিলে মুস্কিল দাঁড়াচ্ছে। তার আগে সৌরীন্দ্রমোহনের চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্রকে জানান হয়েছিল এবং শরৎ মত দিয়েছিলেন। বুদ্ধি কোরে সৌরীন লেখকের নাম দেন নি।

কিন্তু তাতে মোটের মাথায় মন্দের ভালই দাঁড়িয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ "নব পর্যায় বংগদর্শনে" আর লেখা দেবেন না জানিয়ে দিয়েছিলেন সহকারী সম্পাদক শৈলেশ মজুমদার মশাইকে। ভারতীতে নামহীন 'বড়দিদি' লেখা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারুর হোতে পারে না মনে করে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পত্র দিলে উত্তর এলো—ও লেখাটি তাঁর নয়। শৈলেশ বাবু লেখার পাকা "জহুরি" ছিলেন। তাঁর পক্ষে এই রকমের ভুল প্রায় অসম্ভব! তবে, ইনি কে? সেদিনের সাহিত্যক্ষেত্রে আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। তবে কে এই উদীয়মান জ্যোতিষ্কটি!

রেঙ্গুনে এই খবর যখন পৌছল তখন শরৎচন্দ্রের আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হবার উপক্রম। তিনি তাঁর চেলা চামুণ্ডাদের প্রতি প্রসন্ন হোলেন। ভাগ্যদেবতার শিকে তা-হলে ছিঁড়েছে এইবার। তখন ফাউণ্টেন পেন এক আধটা কোরে সবাই পেতে লাগল।

সেই সময়ে ৺প্রথম ভট্টাচার্য মশাইএর মাথায় ভারতবর্ষ বার করার প্ল্যান এসে উপস্থিত হোল। বাংলা সাহিত্যের নোতুন যুগের অভ্যুদয় হোল। ডি. এল. রায় সম্পাদক, সুরেশ সমাজপতিও শোনা যায় যোগ দিয়েছিলেন। একটা হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড।

এখানে ৺ফণি পালের 'যমুনার' কথা না বোললে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের অনেকখানি বাদ পড়ে যায়; এবং সেই সংগে হাতে লেখা ছায়া মাসিকপত্রখানির যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখও দরকার।

উচ্চ শ্রেণীতে উঠে আমরা স্কুলেই একটি মাসিক কাগজ বার করার চেষ্টা কোরেছিলাম। নিম্ন শ্রেণীতে ৺গিরীন্দ্র ভায়ার একখানি শিশু বোলে কাগজ ছিল। গিরীন্দ্র ভায়া তাতে নিজের কল্পনাকে গদ্যে পদ্যে ডিগ্‌বাজি খাওয়াতেন। তাতে রাজার টাক্ মাথায় সন্ন্যাসীর হাত বোলানতেই

মাথায় ভ্রমরকৃষ্ণ কালো চুল কুঁকড়ে ঘাড় পর্যন্ত লতিয়ে যেত। ছবি থাকতো—কুইন ভিক্টোরিয়ার। ছবিখানি লাল নীল সবুজ কালোয় উজ্জ্বল! মেরিলি, মেরিলি, ডিং ডং ডিংএর আধুনিক রাজ-ভাষায় তর্জমা :—"খুশি সে, খুশি সে, তাক্ ধিনা ধিন্।"

এ সব বোধহয় আমাদের শরৎচন্দ্রের নকল। তাঁর প্রিয় কুকুর "কাণা" মারা গেলে শরৎচন্দ্র একটি ইংরাজিতে কবিতা লিখেছিলেন। সবটা মনে না থাকলেও যেটুকু আছে বলি :

Poor Kana, thou art dead
Being long unfed!
No more ana gona!
Are there dreams to look at;
Can'st thou see the cat;
A little bit fat!

তিনি তখন বাংলাতেও পদ্য লিখতেন, অবশ্য অমিত্রাক্ষ
"ফুলবনে লেগেছে আগুন" ইত্যাদি

অন্দর মহলে এই সব সম্ভব হোত। বাইরের দরজায় মা সরস্বতীর প্রবেশ নিষেধ। শুধু গৌরী সিং প্রদীপ জেলে তুলসীদাস পোড়ে কিছু ধর্ম সঞ্চয় কোরতো এবং সেই সংগে চোর তাড়ানও হোত!

প্রমথবাবু শরৎচন্দ্রের প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁর চেষ্টা না হোলে অত তাড়াতাড়ি হয়তো ভারতবর্ষ প্রকাশিত হোত না। মস্ত বাধা হোল ডি. এল. রায়ের মৃত্যুতে। অবশেষে ৺জলধর সেন মশাই সম্পাদকের গদিতে বোসলেন। সম্ভবতঃ সাহিত্য সমাজপতি মশাইও কাগজের দেখা-শোনার কাজে যুক্ত ছিলেন। তারপর কি একটা ব্যাপার নিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিতে হোয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের লেখার সুখ্যাতি 'যমুনায়' ছোটখাট লেখাতেই হোয়েছিল। অনিলা দেবীর নামে প্রবন্ধগুলিও খুব সুনাম অর্জন কোরেছিল।

শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' যখন 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ কোরতে কর্তৃপক্ষের সাহসে কুলোয়নি তখন তা 'যমুনায়' প্রকাশিত হোলে সাহিত্য জগতে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেল। এত বড় দুঃসাহসিক লেখকটা কে হে? বই আকারে প্রকাশ কোরতেও 'ভারতবর্ষের' কর্তৃপক্ষ সাহস করেননি প্রথমে। তাই বই আকারে প্রকাশ কোরেছিলেন এম. সি. সরকারেরা। বাংলা সাহিত্যে বিজয়ডঙ্কা বাজিয়ে শরৎচন্দ্রের প্রবেশে বাংলা সাহিত্যের নব যুগের সূচনা হোয়েছিল। শরৎচন্দ্র একদিনেই বাংলাদেশের সুপরিচিত লেখক হোয়ে দাঁড়ালেন। আর কিসের জন্যে রেঙ্গুনে থাকা? যা খুঁজতে তিনি বিশ্ব সংসার হাঁট্‌কে ফিরছিলেন তাই পেয়ে গেলেন ঘরের দরজায়। একের পর এক কোরে বই বার হোতে লাগল। ওদিকে বসুমতী গ্রন্থাবলী প্রকাশের জন্যে ছুটোছুটি লাগলেন।

সে বছর সামতায় দুর্ভিক্ষ, শরৎচন্দ্র জমি কিনে বাড়িতে হাত দিলেন। দরিদ্ররা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ কোরলে। অনিলা দেবীর পাকা ঘর-দালান উঠলো! আরও অনেক কিছু হোয়েছিল, কিন্তু সঠিক না জেনে বলা যায় না।

পনর

শশপের বাজির দৌড়ে বেচারি কচ্ছপের অবশেষে জয় হোয়েছিল দেখা যায়। সাহিত্য পরিষদের হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিকের সংগে আমাদের যুদ্ধ করার শক্তিও নেই সামর্থ্যও নেই! তবে এইটুকু জানি এবং মানি যে, সত্য অপরাজেয়। বঙ্কিমচন্দ্র আছেন আমাদের দিকের কৌঁসিলী। জীবন-চরিত লেখায়, তিনি দ্রুত চালের বিরোধী ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের রথীরা তা মানেন নি।

সাহিত্যের সঙ্গে যখন ব্যবসাদারী বুদ্ধির যোগ হয় তখন সাহিত্য বিপন্ন হয় বোলে অনেকের বিশ্বাস। সাহিত্য ঠিক 'তেল-নুন-লকড়ির' সংগেও সম্বন্ধ রক্ষা করে না। তার দৃষ্টি অন্য, ভোগও অন্য। সে যে কি, তা মানুষ মানুষকে বুঝিয়ে দিতে পারে না।

সাহিত্য মানুষের সাধনার একটি সুকঠিন তপস্যার ফল। ভাত রাঁধা কি তরকারি কোটা শিখতে হোলেও মানুষের কিছু কিছু ট্রেনিং আবশ্যক হয়।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর একটি অসমাপ্ত বইকে সমাপ্তি দান করার জন্ম একদিন হরিদাস বাবু এসে অনুরোধ কোরলে আমি বোলতে বাধ্য হোয়েছিলাম যে, দামোদর বাবুর মত সাহসের আমার সম্পূর্ণ অভাব। যদিও শরৎচন্দ্রকে আমি ঠাট্টা কোরে বোলতুম্ঃ তুমিই প্লট ভুলে গেছ, তাই হাৎড়ে বেড়াচ্ছ! তিনি বোলেছিলেনঃ ওটা ভাগলপুরের গল্প। তাঁদের বাড়ির নাম কোরেছিলেন এবং গল্পটাও মোটামুটি বোলেছিলেন। তবুও আমার ও-কাজ কোরতে সাহসে কুলায় নি।

উত্তরে হরিদাস বাবু বোলেছিলেনঃ কিন্তু শেষ করা তো দরকার।

প্রসংগক্রমে বোলেছিলাম যে, শরৎচন্দ্র যতটুকু লিখেছেন সেটা ছাপার পর—আপনি উপেনকে বাকিটা শেষ কোরতে অনুরোধ করুন। তারপর সৌরীনকে ধরুন। তারপর, বিভূতি ভট্টকে ধোরতে পারেন এবং শেষকালে নিরুপমা দেবীকে অনুরোধ করুন। কেউ কারুর লেখা দেখবেন না।, যারটা সবচেয়ে ভাল হবে মনে করবেন তারটা নিতে পারেন।

হরিদাস বাবু এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। শরৎচন্দ্র যে শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে প্লট বোলেছিলেন তা আমার জানা ছিল না।

অবশ্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বইখানি সমালোচনা করার সময় বোলেছেন—সমাপ্তি অংশটা শরৎচন্দ্রের লেখা নয় বোলে মনেই হয় না। কিন্তু অনেক সাহিত্যিককে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বোলতে শুনেছি।

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের ব্রজেনবাবু "শরৎ পরিচয়" বোলে আর একখানি চটি বই (১৩০ পৃষ্ঠার) বার কোরে ফেলেচেন। তার মধ্যে বড় একটা নোতুন কিছু নেই চর্বিতচর্বণ ছাড়া! এবং ভুল আছে দেখে আশ্চর্যও হোলাম। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর—'শরৎ পরিচয়' প্রবাহ কাগজে প্রকাশিত হচ্ছিল। সে কথা সাহিত্য "পরিষদের" পাণ্ডারা বলেন যদি যে, জানেন না, তো বোল্‌তেই হয় যে, অশেষ গুণান্বিত ব্যক্তিবর্গের আরও একটি বিশেষ গুণের পরিচয় পাওয়া গেল।

শরৎচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি পাশ করার পর ভাগলপুর জেলা স্কুলের সেকালের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। তিনি কিছুদিন দেবানন্দপুরে থাকার সময় হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে

ভর্তি হোয়ে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিলেন এবং পরে বিশেষ কোন অপরাধ করায় সেখান থেকে চোলে আসতে বাধ্য হোয়ে নেড়া বট তলায় আড্ডা গেড়েছিলেন। পরে একটি ছাড়পত্র নকল কোরে ভাগলপুরের তেজনারাণ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। তখন ৺চারুচন্দ্র বসু মহাশয় ঐ স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। তাঁকে পরে আমি সেই বিচিত্র ছাড়পত্রের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কোরে জানি যে, তিনি তার ইতিহাস জেনেও তাঁকে ভর্তি করেন "ছেলেটার কেরিয়ার যাতে নষ্ট না হয়।"

ব্রজেন বাবুর মত ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মানুষের কাছে এটা আশা করা নিশ্চয়ই যায় যে তিনি ভুলগুলো সংশোধন কোরবেন, তিনি অবহিত হবেন।

রেঙ্গুনে থাকার কালে শরৎচন্দ্রের শ্রীমান্ সুবোধ রায়ের সংগে কোন পরিচয় ছিল না।

শুনেছি উপেন্দ্রনাথ এই বইখানির সমালোচনা কোরেছেন। সম্ভবত তিনি এই ভুলগুলি লক্ষ্য করেননি। শরৎচন্দ্রের জীবনী লেখকের পক্ষে এই বইগুলি খুবই কাজের হচ্চে যে, সে বিষয়ে কোন মানুষের তিলমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। তবে ভুল থাকা উচিত হয় না।

শরৎচন্দ্রের ১১।১২ বছর বয়স থেকে আর তাঁর মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পড়া পর্যন্ত—একাদিক্রমে না হোলেও, তাঁকে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রত্যক্ষ জানা-শোনার বহু অবসর যে ঘোটেছে তা বোললে মিথ্যে বলা হবে না নিশ্চয়। এ সম্বন্ধে কারুর কিছু বলার থাকলে আমাকে জানালে পরম বাধিত হব।

আমার ভুল-ভ্রান্তি হবার বয়স বর্তমানে এসেছে, এ কথা অস্বীকার কোরলে শুধু ভুল নয় আহাম্মকি করা হবে বোলেই মনে করি। গিরীন ভায়া আজ বেঁচে নেই। শরৎচন্দ্র তাঁকেও চিঠিপত্র দিতেন নিশ্চয়; কিন্তু ব্রজেন বাবুর চিঠিপত্রের সংগ্রহের মধ্যে তাঁর একখানি চিঠিও দেখি না। আমার মাত্র একখানি চিঠি আছে। শ্রীমান বিভূতিভূষণ ভট্টদের অনেক চিঠি পত্র দিয়ে থাকতেন তিনি জানি, তাও দেখিনে। ৺নিরুপমা দেবীর সঙ্গে হয়তো পত্র ব্যবহার ছিল—তাঁকে তিনি স্নেহ কোরতেন নিজের বোনের মত। তাঁর চিঠিও দেখি না।

শরৎচন্দ্র যে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন, সে সম্বন্ধে আর দ্বিমত দেখা যায় না।

তাই এখন দেখছি, শরৎচন্দ্রের নাম ভাঙ্গিয়ে কেউ কেউ শাঁসে-জলে হোয়ে উঠার সাধু চেষ্টা কোরছেন।

আমাদের "নেই কাজ তো খই ভাজ!" এখন ব্রজেন বাবুর চিঠির সংগ্রহ থেকে শরৎচন্দ্রের মানুষের প্রতি অপ্রীতিটা উদ্ধার কোরলে তাঁর স্বরূপের কতকটা উদ্ধার হোলেও হোতে পারে।

* * * *

ব্রজেন বাবুর প্রতিভার একদিকের পরিচয় হচ্চে, তিনি রাই কুড়িয়ে বেল কোরতে পারেন।

বর্তমান যুগের নিয়ম হচ্চে, তুমি যেই কেন হওনা—কিছু টাকা যদি জমিয়ে বোসতে পার তো আর দেখে কে? এইটিই বর্তমানে যুগধর্ম!

আর একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে এ সবই টাকার খেলা। লোক ভাল কি মন্দ সে বিচারের প্রয়োজন নেই! যখন ভোটের ওপর সব নির্ভর—তখন টাকাই যে দেশকে ভালমন্দের পথে নিয়ে চোলেছে তা যার ঘটে সামান্য মাত্র বুদ্ধি আছে—সে বুঝতে পারবেই!

এখন টাকা যে যেমন উপায়ে উপার্জন করে করুক, তা দেখার প্রয়োজন নেই—সে চুরি করে কি ডাকাতি করে, তার বিচার করার জন্য আইন আছে, বিচারলয় তো আছেই। এই যে রীতি-নীতির যুগ, একেই সেকালের সাধুরা কলি-যুগ বোলে গেছেন। ভোটাভুটি ও-দেশের ব্যবস্থা। আমাদের পরাধীনতার অভিশাপ এখনও খণ্ডায় নি। অতএব যুগ-ধর্মকে মেনে চোলতেই হবে। যিনি অর্থের সহায়তায় নিজের প্রতিষ্ঠা গোড়ে তুলেছেন তাঁকে আমরা মানতে বাধ্য! তাই তাঁদের কথামত চোলে দেখাই যাক না কোথায় গিয়ে দাঁড়ান যায়।

শরৎচন্দ্র যখন বাড়ি-গাড়ি কোরতে পেরেছিলেন তখন তাঁর চিঠিগুলোই বর্তমানের বেদ! একথা ব্রজেন বাবু জানেন কিনা আমাদের জানা নেই।

কিন্তু তাঁর পত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা দেখে বোঝা যায় যে, তিনি পত্রে লিখিত কথাগুলি সত্য বোলে ধোরে নিয়ে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এমন কথা বোলতে পারেন যা পাঠকবর্গ স্বীকার কোরে নিতে বাধ্য।

শরৎচন্দ্র যখন ভাগলপুরে লেখাপড়া কোরতে আরম্ভ করেন তখন সেখেনে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত কোন হাইস্কুল ছিল না। তিনি এই বাঙালী প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুল কথাটি কোথা থেকে সংগ্রহ কোরেছেন জানতে পারলে সুখী হব। আমাদের যতদূর জানা আছে তা থেকে জানি যে, জেলা স্কুলের তখনকার দিনে তিনি সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হোয়েছিলেন। ব্রজেন বাবু যদি প্রমাণ কোরতে পারেন যে, সে সময় সে রকমের একটি স্কুল ছিল তাহোলে বড় ভাল হয়। তিনি এমন অনেক কথা বোলেছেন তা হয়তো শোনা কথা, নয় তাঁর মনগড়া কথা। তিনি একজন সাধু ভদ্র লোক। তাই, একথা তাঁকে জানান দরকার। তাঁর পুস্তকের তারিফ কোরে যাঁরা সমালোচনা কোরেছেন তাঁরা কিসের জোরে করেন তাও বুঝে ওঠা শক্ত। ছাপা হোলেই তা যদি সত্য হয় তো এমন অনেক কথা অনেক লোকের সম্পর্কে বলা চলে। চিঠি পত্রের ওপর বিশ্বাস কোরে অনেক কথা বোললে দেখা যায় যে, তা পরে প্রমাণ করা যায় না।

আমার জানা আছে যে, এক সময় শরৎচন্দ্রকে সাহিত্য পরিষদের সভ্য করার চেষ্টায় বহু গণমান্য লোকের আপত্তি হোয়েছিল। সাহিত্য পরিষদে তার নথিপত্র নিশ্চয় আছে। ব্রজেনবাবু দয়া করে সেগুলো উদ্ধার কোরে প্রকাশ কোরলে সত্যপক্ষেই চলা হবে। সত্য প্রকাশ কোরতে তিনি ধর্মত বাধ্য—যখন এ কাজে তিনি হাত দিয়েছেন।

শ্যালককেও সর্বসমক্ষে শ্যালক বোললে সে বেচারি ক্ষুণ্ন হয়। ভদ্র ভাষায় আর যখন সেই মানুষগুলোই শরৎচন্দ্রের পরম বন্ধুর কাজ কোরে এসেছে তখন তাদের নামের আগে বিশেষণ বসায় যারা, তারা নিজেদের ক্ষুদ্রতার পরিচয়ই দিয়ে থাকে। শরৎচন্দ্রের "সহোদর" মামারা তাঁর কোন সহায়তায় এসেছিলেন কিনা খুঁজে বার করা শক্ত। ভাগলপুরে নিজের মামা বর্তমান থাকলেও তিনি তাঁদের বাড়ি যেতেন না। ভাই প্রকাশচন্দ্রকে দূর-সম্পর্কের মামাদের বাড়িতেই

রেখে তিনি রেঙ্গুন যাত্রা কোরেছিলেন; আপন মামারা জীবিত থাকা সত্বেও তিনি সে চেষ্টা করেন নিই-বা কেন?

এই যে নিকট এবং দূর সম্পর্কের বিচার, সেটি ছোট ছোট মনের বিচার। নরেন বাবু একটু বিচার কোরে দেখলে দেখতে পেতেন যে, তাঁর গৃহ-লক্ষ্মীটি কোন সম্পর্কের নয় এবং যে সম্পর্ক পরে তাঁর সংগে দাঁড়িয়েছে সেটি নিকটতম সম্পর্কইতো।

একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে; সেটি নরেন বাবু এবং ব্রজেন বাবুকে মনে করিয়ে দিতেই ইচ্ছে হয়—"অয়ং নিজ পরো বেত্তি গণনা লঘু চেতসাম্।" উদার চরিত্রদেরই "বসুধৈব কুটুম্বকম্"। শরৎচন্দ্রের সহোদর ভাই থাকতে অন্যকে সেবার জন্য ডাকা হোয়েছিল কেন তা বোঝা শক্ত! নরেন বাবু ও ব্রজেন বাবু—তাঁরা "দূর সম্পর্ক"* বোলে কি জাহির কোরতে চান? তাঁরাই যদি নিকটতম ছিলেন তো শরৎচন্দ্র হাঁদা-বোকা নিশ্চয় ছিলেন না; তবে তাদেরই বা কেন ডাকা হোল? যদি বুঝিয়ে দেন তো চির বাধিত হব।

তখন শরৎচন্দ্রের নানা জাতীয় ভাইরা মামারা কোলকাতায় বিরাজ কোরছিলেন; তাঁদের ডাকা হয়নি কেন, সেটা নিশ্চয় একটা চিন্তা করার বিষয়। ব্রজেন বাবু নিশ্চয় নরেন বাবুর বই পড়েছিলেন। এই সব বংশের কুলুচি লেখার আগে তাঁর বইখানির সমালোচনা সহোদর ভাইকে দিয়ে করালে ভালো হোত না কি? শরৎচন্দ্রকে নিয়ে এই যে একটা দলাদলির ঘোঁট চোলছে, সেটার অবসান কবে হবে তা জানিনে। এর একটা কারণ নিশ্চয় আছে! হয়তো অনেকে তা জানেনও। একদিন তা লেখাপড়ায় প্রকাশ না হোলেও কানাকানিতে হোয়েওছে এবং হবেও। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর বহু পূর্বে সে সংবাদ আমাদের কানে পৌঁছেছিল। কিন্তু আমাদের তা বিশ্বাস হয় নি। আবার এ কথাও ঠিক যে, ডাক্তারদের বহু সাবধানতা সত্বেও আমরা সে বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক হইনি। কেন না, তা আমরা বিশ্বাস করিনি। শুধু ব্যবস্থা হোয়েছিল যে, সে ঘরে প্রবেশ কোরতে হোলে ইনচার্জ ডাক্তারের অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হোত, এমন কি

* ১৫১ পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের "মামাদের প্রকার ভেদ" দ্রষ্টব্য।

আমাকেও প্রবেশ কর্ত্তে হোলে সেই অনুমতিপত্র দেখিয়ে ঢুকতে হোত। এই যে সাবধানতা এটা শরৎচন্দ্র মোটেই পছন্দ কোরতেন না। যদি শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সহজভাবে ঘটে, তাহলে অত তাড়াতাড়ি জীবন-চরিত প্রকাশ করার প্রয়োজনও বোধ হয় হোত না।

আজ প্রায় একযুগ গত হোতে চোলেছে, আজও আমার মনে হয় যে, শরৎচন্দ্রের জীবনী লেখার যথাকাল উপস্থিত হয় নি। কারণ সব কথা আজও বলা চলে না, বিশেষ কোরে দূর সম্পর্কের মানুষদের পক্ষে। এ বিষয়ে আরো কিছু অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। তা একদিন সময়ে নিশ্চয় প্রকাশ পাবে। অন্ধকূপের সত্য ইতিহাস প্রকাশ পেতে অনেক বিলম্ব হোয়েছিল। সত্য যথাকালে আত্মপ্রকাশ কোরে থাকে। ধর্মের কল শুনি যে বাতাসে নড়ে। শরৎচন্দ্র বাঁচলেও তিনি অকর্মণ্য হোয়ে থাকতেন। তার চেয়ে জগতের মালিকের ব্যবস্থাই হয়তো ঠিক হোয়েছে। এই যে আক্ষেপ এটা হয়তো আমার অযথা এবং ভ্রান্ত।

আমি উইল দেখিনি। শুনেছি তার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। একদিন তাও প্রকাশ পাবে।

* * * *

এখন এ কথাই বোলতে চাই, তিনি কতবড় সৌভাগ্যবান ছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র কোনদিন এক পয়সা ফি নিতেন না। ডাঃ কুমুদ বাবুও তাই।

সার আশুতোষের বাড়ির রমাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ ঠিক আত্মীয়ের মতোই ব্যবহার কোরতেন। মুকুলচন্দ্র দে ও তাঁর স্ত্রী পরম আত্মীয়ের ব্যবহার কোরতেন; সতীশ সিংহ মশাই, তাঁদের বাড়ির দুই বৌমা নিত্য খবর নিতে আসতেন। শরৎচন্দ্রের ক্যাওড়াতলার সংকার কাজের প্রায় সব ব্যয় স্যার আশুতোষের বাড়ি থেকে হোয়েছিল।

শ্রাদ্ধ সমারোহ কোরে হোলেও তার বহু খরচ ও জিনিসপত্র যাঁরা দিয়েছিলেন কি যুগিয়েছিলেন তাঁরা দাম নেননি।

এস, পি, চ্যাটার্জীরা যে ফুল দিয়েছিলেন তার দাম দিতে হোলে চোখে সরষে ফুল দেখতে হোত!

একেই বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহন করেন।

শরৎচন্দ্র জীবনের কাঁটা বনে বিচরণ কোরে বহুতর পুষ্পের সন্ধান দিয়ে গেছেন জাতীয় সাহিত্যে। সে আহরণ কোরতে গিয়ে বহু অখ্যাতি বহন কোরতে হোয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ বোলেছিলেন : "তোমার ফাঁকির কারবার নয়।" যদি সাধারণ সাহিত্যিকের মতো কাগজের ফুলের কারবার কোরতেন তাহলে হয়তো আরও কিছুদিন বাঁচতেও পারতেন। শেষে সে ইচ্ছা যে হয় নি তাও নয়। বোলতেন, আমাকে "শেষের পরিচয়টা" শেষ করার সময়টুকু কোরে দাও। আমি ছাড়া এর শেষ আর কেউ কোরতে পারবে না। হায় শরৎচন্দ্র !

(মামাদের প্রকার ভেদ)

(ক) ৺ভুবনমোহিনীর পিতা ৺কেদারনাথের দুইপুত্র

১। ৺ঠাকুরদাস গঙ্গোপাধ্যায়
২। ৺বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায় } আপন মামা

(খ) ৺দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়—মেজকাকা

১। ৺তারাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়
২। ৺নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় } দূর সম্পর্কীয় মামা

(গ) ৺মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সেজকাকা

১। ৺লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
২। শ্রীরমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
৩। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় }

(ঘ) ৺অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ন-কাকা

১। ৺দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৬) ৺অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ছোট কাকা

১। ৺মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়*
৩। ৺গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৪। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৫। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৬। ৺শৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

} দূর সম্পর্কীয় মামা

(১) আপন মামা দুইজন,—বর্তমানে দুইজনেই মৃত।

(২) মেজ কাকার দুই পুত্র, দুইজনেই বর্তমানে মৃত।

(৩) সেজ কাকার তিন পুত্রের মধ্যে বর্তমানে দুইজন জীবিত।

(৪) ন কাকার এক পুত্র, জীবিত নেই।

(৫) ছোট কাকার ছয় পুত্রের মধ্যে তিন পুত্র* জীবিত আছেন।

শরৎচন্দ্রের আপন মামা বর্তমানে কেহই জীবিত নেই।

তথাকথিত "দূর সম্পর্কীয়" মাতুল জীবিত আছেন :—

(১) শ্রীরমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
(২) শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
(৩) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়*
(৪) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
(৫) শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আপন মামা বিপ্রদাস—

(১) বিপ্রদাস—শরৎচন্দ্রের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি দেন এবং শ্রীমতী মুনিয়া দেবীর, (শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগ্নীর) বিবাহ দেন, শোনা যায়।

(২) উপেন্দ্রনাথ—নাকি শরৎচন্দ্রকে রেঙ্গুন যাবার সময় ৪০্ টাকা ধার দেন; শরৎচন্দ্র এ কথা পত্রে কোন দিন স্বীকার করেন নি। তিনি

---

* এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার (জুন, ১৯৫৬) কিছুদিন পূর্বে লেখক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরলোক গত হইয়াছেন। —প্রকাশক।

বলেন, রেঙ্গুন যাওয়ার সময় মাত্র দেবেন্দ্রনাথ সংগে গিয়ে জাহাজে উঠিয়ে দেন। যেহেতু তিনি "বোকা টাইপের" লোক ছিলেন, তাঁকে প্রশ্ন কোরে উত্তর পাওয়া যেত না। উপেন্দ্রনাথের কথা বিশ্বাস কোরতে পারিনে, কেন না—তাঁর পক্ষে আমাদের কাছে এ কথা প্রকাশ করার বাধা সেদিন ছিল না। ধার হয়তো দিয়েছিলেন অন্য কোন বাবদে। এ কথা প্রকাশ করার বাধা তাঁরও ছিল না।

শরৎচন্দ্র যে ব্যাধিতে ভুগছিলেন তাতে কোন ডাক্তার আশা কোরতে পারেন নি যে তিনি দীর্ঘদিন বাঁচবেন।

বিধান বাবু স্পষ্টাক্ষরে বোলেছিলেন: যদি অপারেশন না করা হয় তো শরৎ বাবু পোরশু মারা যাবেন। অপারেশনের সময় টেবিলেও মারা যেতে পারেন। তাই অপারেশন করা উচিত মনে হয়। চেষ্টার কথা হোচ্ছে। কেউ "না" বোললেন, কেউ "হাঁ" বোললেন। মানুষের মনের সত্য পরিচয় তো সেইখেনেই। তার অধিক অগ্রসর হওয়ার দরকার নেই।

বিধান বাবু সর্বান্তঃকরণে চাইছিলেন যে, শরৎচন্দ্র সে যাত্রায় বেঁচে যান।

যখন অস্ত্রকরা ঠিক হোল, তখন বোলেছিলাম—ললিত বাবু তেরশো টাকা চাইলে তা সম্ভবপর হবে না, শরৎচন্দ্র রাজি হন নি। উত্তরে তিনি বোললেন, সে ব্যবস্থা আমি কোরবো। এবং ললিত বাবুকে মাত্র চারশো টাকায় রাজি কোরিয়েছিলেন। যখন অস্ত্র করাই স্থির হোল তখন টাকার জোগাড় করা দরকার। হরিদাস বাবুর কাছে গেলে তিনি হাজার টাকা দিতে রাজি হোয়েছিলেন এবং প্রকাশচন্দ্রের "সই" নিয়ে এক হাজার টাকা দিয়েওছিলেন।

শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়ে বলাতে তিনি বোলেছিলেন, তুমি আমাকে না জানিয়ে আমার কোলকাতার বাড়ি কেন বাঁধা দিলে?

না, তা তো হয়নি—উত্তরে বোলেছিলাম। তোমাকে যে এ কথা বোলেছে, সে ঠিক কথা বলেনি।

অর্থের অভাব হোলে যাঁরা পূর্বে বোলে রেখেছিলেন "টাকার জন্যে ভাবনা

নেই”—তাঁরা সেই সময়ে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। মানুষ এমনি কোরেই তো এই দুনিয়াকে চেনে।

নার্সিং হোমের ডাক্তার বাবুটি আমাদের দূর সম্পর্কের হোলেও বহুতর ভাবে সহায়তা কোরেছিলেন; এবং সব কথা ভালো কোরে জানেন। তবে তিনি ডাক্তার—সাহিত্যিক তো নন্!

অস্ত্রোপচারের পর শরৎচন্দ্রের যকৃৎটিকে সম্পূর্ণ অকেজো পাওয়াতে আর অগ্রসর না হোয়ে ডাক্তার তাঁকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখার অন্যতর ব্যবস্থা কোরেছিলেন। তরল খাদ্য অন্ত্রে যাওয়ার ব্যবস্থা নল দিয়ে কোরে—শরীর কিঞ্চিৎ সবল হোলে বিদেশে নিয়ে গিয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করার পথ মাত্র কোরে রেখেছিলেন। পরে য়ুরোপে যাবার উদ্দেশ্যে একটা ব্যবস্থাও কোরেছিলেন। নলে তরল খাদ্য দিয়ে শরীর পুষ্ট কোরে তোলার কিছুদিন পরে য়ুরোপে যাওয়ার শক্তি হোলে নষ্ট যকৃৎটা বোদলে কি সরিয়ে দিয়ে কৃত্রিম যকৃৎ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়তো সম্ভবপর হোত। তাই, মুখ দিয়ে কোন কিছু খাওয়ান সম্পূর্ণ নিষেধ হোয়ে গিয়েছিল।

এই ছিদ্র-পথ দিয়ে শনির প্রবেশ হয়। ভুলক্রমে মুখ দিয়ে অফিংএর জল খাওয়ানতে তাঁর আর বাঁচা সম্ভবপর হয়নি। বার-বার বমি হওয়াতে, পেটের কাব্ৰিকুরির বাঁধন ছিন্ন হওয়াতে শরৎচন্দ্রের বাঁচা আর সম্ভবপর হয়নি।

তাঁকে পাখি-পড়ানোর মতো কোরে বারম্বার বুঝিয়ে দিলেও যদি তিনি মুখ দিয়েই আফিংএর জল খান, তবে তাঁকে কে বাঁচাতে পারে?

মানুষের অশেষবিধ চেষ্টার পরও যদি তিনি সবকিছু জেনেও একাজ কোরে থাকেন তো শরৎচন্দ্র কতকটা আত্মহত্যা কোরেই মারা গেছেন।

অবশ্য এ সবের পরও অনেক তর্ক উঠতে পারে, কিন্তু সেগুলো তাঁর জীবনে ব্যর্থ হোয়ে গেছে। তবে এ থেকে ভবিষ্যতে মানুষ আরও বেশী সতর্ক হোয়ে কাজ কোরবে মনে কোরেই এইটি বিস্তারিত ভাবে লেখা প্রয়োজন মনে কোরেছি।

শরৎচন্দ্রের দেহের দুর্বলতা দূর করার জন্য তাঁর ছোটভাই প্রকাশচন্দ্র নিজের দেহ থেকে বহু রক্ত দান কোরেছিলেন।

একদিন শরৎচন্দ্র আমার কাছে দুঃখ কোরে বোলেছিলেন যে, উইলে তার নাম না দেওয়াটা আমার মহাপাপ করা হোয়েছে ; তাই ভগবান আমার উপর এই বিধান কোরেছেন।

সারা জীবন শরৎচন্দ্র মুখে বোলতেন, তিনি ঈশ্বর মানেন না।

এই প্রসঙ্গে তিনি আর একদিন বোলেছিলেন : গিরীন মামা অসুখ হোলে অনেক কিছু "নীলা-পলা" পোরলে—আমি ঠাট্টা তামাসা কোরতুম—মনে আছে ?

আছে।

আজ তুমি ঘরে এলে আমি তাড়াতাড়ি হাতটা চাপা দিই কাপড় দিয়ে। তারপর হাত খুলে বোললেন : দেখ আমার হাতে নীলা-পলার ঘটা। তোমার সামনে বার কোরতেও লজ্জা পাই !

আর একটা কথাও তোমাকে বলি : তোমার বোধ হয় মনেও আছে, তখন আমি শিবপুরে থাকতাম, কিসের ছুটিতে তুমি ভাগলপুর থেকে এসেচো।

একদিন সকালে ভোলা এসে বোললে : আশু বাবুর বড় ছেলে আর একজন বাবু আপনার সঙ্গে দেখা কোরতে এসেছেন। আমি বেললাম, বোলে দাও দেখা হবে না।

তুমি ভোলাকে ডেকে বোলেছিলে,—দাঁড়া ভোলা, একটু সবুর কর।

আমাকে বোললে,—শরৎ অন্যায় হোচ্চে, তাঁদের আহ্বান কর, কি তাঁরা বোলতে চান শোন। আশু বাবু কবে কোথায় কি বোলেছেন তা নিয়ে ঝগড়া কোরে কোন লাভ হবে না। আশুবাবু অসীম বুদ্ধিমান লোক। পাটনায় সাহিত্য সভায় তিনি নাকি বোলেছিলেন কৃত্তিবাস ওঝার পর বাংলা দেশে আর কবি জন্মায় নি। তাই বোলে কি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে কলহ কোরেছিলেন ?

কোথায় আশুতোষ কি বোলেছিলেন তোমার প্রসংগে, তাই নিয়ে তুমি তাঁদের সংগে "মেয়ে কোঁদল" কোরবে ? মস্ত ভুল হবে, যদি ঐ বোলে তাঁদের হাঁকিয়ে দাও। আশুতোষ মহা ধীমান ব্যক্তি। তিনি তর্কে লর্ড কার্জনকে বিধ্বস্ত কোরেছিলেন বোলে সায়েব তাঁকে হাইকোর্টের জজ

কোরে জব্দই কোরেছিলেন। তখন তাঁর মাসিক আয় দশ-বিশ হাজার। তিনি কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করেন নি। আজ তাঁর ছেলেরা এসেছেন। কোথায় শিমুল তলায়, কি বেল তলায় কি তিনি বোলেছেন তুমি স্বকর্ণে না শুনে যদি দেখা না কর তো তার চেয়ে বড় অপরাধ আর হোতে পারে না। জেন, তার শাস্তি হবে তোমার গলায় জগত্তারিণী মেডেল বেঁধে "বুধ্‌ধুর" নাচ করিয়ে ছেড়ে দেবেন। মানীর মান রক্ষা কর। ফেরালে মহা অপরাধ হবে তোমার।

তাঁরা এসে তাঁদের কাগজে লিখতে অনুরোধ কোরে গেলেন।

তাঁর কাগজ না হোলে বাংলা দেশে কোন দিন "পথের দাবী" আলো পেত না। সে কথা শরৎচন্দ্র আমাকে অনেকবার বোলেছেন। জগত্তারিণী মেডেল লুকিয়ে রাখতেন। জীবনের শেষ হওয়ার মাসখানেক আগে আমাকে বোলেছিলেন: তোমার অনেক কথা কিন্তু সত্যি হয়।

শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" আলো দেখতে পেত না যদি আশুতোষের আশীর্বাদ তাতে না থাকতো।

এই "পথের দাবীর" আর এক দিকের আর একটি কথা বলি।

আশুতোষের কাগজ ভিন্ন "পথের দাবী"র প্রকাশই সেকালে সম্ভবপর নিশ্চয়ই হোত না। পথের দাবীর প্রকাশ বন্ধ হোলে—শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন তাঁর মতামত দিতে। রবীন্দ্রনাথ যে মতামত দিয়েছিলেন, তা শরৎচন্দ্রের মনের মতো হয়নি। তিনি না কি বোলেছিলেন—ইংরেজ অতিশয় ভদ্র জাতি বোলে লেখককে বন্দী না কোরে বইটার প্রকাশ বন্ধ কোরেছেন।

সামতায় গিয়ে দেখি শরৎচন্দ্র রাগে ফুঁসচেন। কি একটা চিঠি দিয়েছেন শ্রীমান্ উমাপ্রসাদের কাছে রাগের মাথায় রবীন্দ্রনাথকে পাঠাবার জন্যে! সে চিঠি আমি কোন দিন দেখিনি।

সব কথা বলার পর—শুনে বোললাম—তুমি কি তাঁকে বইখানির সুপারিশ কোরতে অনুরোধ কোরেছিলে?—না, তাঁর ঠিক মতামতটি চেয়েছিলে?

হাঁ, মতামতই চেয়েছিলাম—উত্তরে বোললেন তিনি।

তবে ? মতামত চেয়েছিলে, দিয়েছেন তিনি। সেঠা তো সেইখেনে চুকে গেল। তারপর আর কিছু হোলে সেই ফের "মেয়ে কোঁদল !"

তখন তুলসী ছুটলেন—চিঠিটা পাঠান বন্ধ কোরতে। এ কথা উমাপ্রসাদ বাবু জানেন, তুলসী জানেন।

* * *

"পথের দাবী"র সংগে জড়িত আর একটি কাহিনীও আছে। এক দিন কে এক প্রেন্টিশ সায়েব শরৎচন্দ্রকে ডেকে বোললেন, তুমি সরকারের পক্ষ থেকে 'পথের দাবীর' মতো একখানি বই লিখে দাও, ভালো টাকা পাবে।

উত্তরে শরৎচন্দ্র বোলেছিলেন, সাহেব, ছেলেবেলা আমার ঘুড়ি উড়িয়ে লাট্টু-গুলি খেলে কেটেচে। যৌবনটা গাঁজাগুলি খেয়ে, তারপর রেংগুনে গিয়ে চাকরি কোরেছি। আর "চার অধ্যায় লেখার" বয়স নেই। আমায় ক্ষমা কর।—একথা এক দিন কোন মিটিংএ বলায় সেই সভার সভাপতি এমন ধমকালেন যে, আমার মনটা গজ-কচ্ছপের অবস্থা প্রাপ্ত হোয়েছিল। দেখছি জগতে সত্যটা বড় গোলমালের বস্তু! বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাই বোধহয় মিথ্যাই অবলম্বন কোরে থাকেন।

বোল

যখন মহাত্মা গান্ধীর "চরকা আন্দোলন" শুরু হয়, তখন কিছুদিনের জন্য স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়ে কোলকাতায় চোলে এসে শরৎচন্দ্রের বাড়িতে থাকি। শরৎচন্দ্র তখনও "চরকা আন্দোলন" মনে মনে স্বীকার কোরে নিতে পারেননি। তা নিয়ে বেশ হাসি-ঠাট্টাও কোরতেন।

সে সম্বন্ধে আমার সংগে বহু তর্কবিতর্কও চোলতো। তিনি বোলতেন, তুমি সমাজের যে কাজ কোরছো, তা চরকা আন্দোলনের চেয়ে অনেক বড়, সে বিষয়ে কি কিছুমাত্র সন্দেহ আছে ? মনে কর, আমি সাহিত্য লিখি ; সেদিক দিয়ে চরকার চেয়ে নিশ্চয়ই বড় কাজ করি। যদি আমি সর্বকর্ম পরিত্যাগ কোরে চরকা চালাতে থাকি তো দেশের লাভ হয়, না ক্ষতি হয় ?

উত্তরে বোলেছিলাম, খুব ক্ষতি হয়।

তবে ?

উত্তরে বোলেছিলাম, আমার অবসর সময়ে যদি চরকা করি তো সেটা কিসে অন্যায় হয় তা আমি বুঝে উঠতে পারিনে। যদি সরকার বলে যে, চরকা করা অন্যায়, যে চরকা কোরবে তাকে জেলে দেবো, তো কাজ ছেড়ে আমি চরকা কোরে জেলেই যেতে চাই। আমাদের দেশের ঠাকুরমা দিদিমারাই তো চরকা কোরতেন; তাতে কি দোষ হোত ?

শরৎচন্দ্র উত্তরে বোললেন, এটা ইংরেজের ভুলই হোয়েছে। যদি ভারতবর্ষ নিজের পরিধান-বস্ত্র কোরে নিতে পারে তো আমাদের লাভ, আর ওদের ক্ষতি হয়। তাই চরকা আন্দোলনকে ওরা অন্যায় বোলে মনে করে।

এটা শাসনকর্তাদের একটা গা-জুরি অন্যায়। এটা যদি ইস্কুলে না চলে তো আমি শিক্ষকতা কোরতে প্রস্তুত নই। তাই কাজ ছেড়ে দিয়ে চোলে এসেছি।

শরৎচন্দ্র বোললেন, কিছুই অন্যায় করনি।

আমি দেশালাইএর কল আনিয়ে দেশালাই কোরবো। এই দুটো যদি চালাতে পারি তো মাসিক কুড়ি টাকা গ্রাণ্ট চাইনে।

উত্তরে শরৎচন্দ্র বোললেন, তাঁত চরকা না হয় তোমার ঝগড়ু মিস্ত্রী কোরে দেবে; কিন্তু দেশালাইএর কলের দাম কত ?

চার শো টাকা, আর কুমিল্লা থেকে ষ্টীমারে আমার কি খরচ পোড়বে তা জানিনে। তবে একটা অসম্ভব কিছু হবে বোলো তো মনে হয় না। সেটাকে চালাতে হবে। কেমিক্যাল আশি টাকার কিনলে চালানো যাবে আশা করি। তারপর চাঁদা আছে। সে টাকা উঠে যাবে বোলেও মনে হয়।

শরৎচন্দ্র উত্তরে বোললেন, আমি তোমায় এক হাজার টাকা দেব। তুমি ফিরে গিয়ে সেই কাজ করগে। বোসে থেকে লাভ কি ?

বোলে তো নেই, শরৎ। পাঁচ শো টাকার বাপ্তা তসর এনে হাওড়ার হাটে গিয়ে বিক্রি কোরে কিছু টাকা উপায় কোরতে পারবো এ বিশ্বাসও আমার আছে। যতদিন তা না পারবো, ততদিন স্কুলের কাজ কোরব না।

উত্তরে শরৎ বোললেন, দেখি একটু ভেবে-চিন্তে; আমি তোমায় সাহায্য

কোরব। তুমি ফিরে গিয়ে দেখ, কি কোরতে পার। আমি রইলাম তোমার পেছনে।

*   *   *

শরৎচন্দ্র যে উচ্চ শ্রেণীর দেশ-প্রেমিক ছিলেন, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এবং প্রয়োজন হোলে অর্থ ব্যয় কোরতে তাঁর কিছুমাত্র কুণ্ঠা আসতো না, গায়েও লাগতো না।

*   ঙ   *

যখন মহাত্মাজির চরকা আন্দোলন চোলেছে তখন একদিন বৌবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে তিনি বহু ইতস্তত কোরে জিজ্ঞাসা কোরলেন,—কি বল, এতেই আত্মসমর্পন কোরবো ?

না, শরৎ; একাজে বহু লোক আসবে, হয়তো তোমার চেয়ে তারা ঢের ভাল কাজ কোরতে পারবে; কিন্তু তোমার মত লেখা লিখতে অল্প লোকেই পারবে। চরকা এক আধ ঘণ্টার জন্যে কাটতে পার। সেটাতে ফল হবে। লোকে শুনলে তারা চরকায় মন দেবে। সেকালে ঠাকুমা দিদিমারা এ কাজ কোরতেন সংসারের কাজ থেকে অবসর নিয়ে। তোমাকে এখন লেখার কাজ থেকে দেশ কিছুতেই ছুটি দেবে না। তোমাকে সাহিত্য কিছুতেই ছাড়তে দেওয়া যেতে পারে না। দেশ স্বাধীন করার মন্ত্র তোমার কাছেই আছে। তোমাকে সাহিত্য ছেড়ে এ কাজ দেশ কিছুতেই দেবে না কোরতে। তবে একটা ঢেউ উঠচে। লোকে যখন শুনবে, তুমিও লেগে গেছ এ কাজে, তখন আন্দোলনের কিছু সুবিধা হোতে পারে; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশ তাতে ক্ষতিগ্রস্তই হবে, তুমি সাহিত্য ছাড়লে।

তিনি বোললেন, তবুও দুটো চরকা কিনে এ কাজে লেগে যাওয়া যাক।

চরকা কেনা হোল। আমাদের ছাত্র শ্রীমান অনাথনাথ বসু চরকার মাষ্টার হোলেন এবং দিন কয়েকের মধ্যে আমরা চলনসই সুতো কাটতে শিখে গেলাম।

আমাদের তাঁত দেশালাইএ তিনি বহু অর্থ সাহায্য কোরেছিলেন। এবং স্বদেশী আন্দোলনে তিনি একজন বড় গোছের নেতা দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি A. I. C. C.র মেম্বর নির্বাচিত হোয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র যে কাজে হাত দিতেন তাতে প্রথম শ্রেণীর কর্মী না হওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুতেই মনে আরাম কি সুখ পেতেন না।

একদিন এক মেলায় প্রাতঃস্মরণীয় স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মশাই তাঁর সুতোর বোনা কাপড় মাথায় কোরে নৃত্য কোরেছিলেন সেই মেলায়।

শরৎচন্দ্র যে কত উচ্চ শ্রেণীর দেশপ্রেমিক ছিলেন তা তাঁর এই নীচের গল্পটি প্রমাণ করে।

যখন 'পথের দাবী'র পরিকল্পনা তাঁর মনে গড়ে উঠচে, তখন তিনি জানতেন যে ঐ বইখানি লেখার জন্য তাঁর জেল হবে নিশ্চয়। জেলে যেতে তাঁর ভয় ছিল না। তবে সেখানে আফিম পাওয়া যাবে না এটা নিশ্চয় কোরে জানতেন; তাই আফিম খাওয়া বন্ধ কোরে দিলেন। আফিম ধরার করুণ ইতিহাস যে, জেলে মদ পাওয়া অসম্ভব। আফিম তবুও পাওয়া গেলেও যেতে পারে। একদিকে জাঁতায় গম পেষা শুরু কোরলেন এবং অবশেষে আফিমও ছাড়লেন। সামান্য সামান্য জ্বর হোতে হোতে দিন কুড়ি বাইশের মধ্যে এমন জ্বর হোল যে, বিছানা নিতে হোল। ডাক্তার এসে বোললেন যে "টাইফয়েড"। তাঁর চিকিৎসায় জ্বর উঠা-নামা করে না, ১০৩°এ দিন রাত দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার মহা চিন্তিত হোলেন। তাই তো, ব্যাপার কি? আমার আহ্বান হোল। আমি এসে বড়মাকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বোললেন, আফিম ছাড়ার পর এই ব্যাপার ঘোটেছে। ডাক্তার বাবুকে সে কথা বলাতে তিনি বোললেন: ঠিক, একে "ওপিয়াম ফিবার" বলে। তখন তিনি শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা কোরলেন: আফিম কতদিন খান নি?

ঠিক মনে নেই, বৌ বোলতে পারেন। তাঁর মোট হিসাব, বোললেন,— মাস খানেক। শরৎচন্দ্র বোললেন, কুড়ি বাইশ দিন।

প্রবোধ বাবু বোললেন: আমাদের শাস্ত্রে একে বলে "ওপিয়াম ফিবার"। তখন তিনি ওষুধের সংগে ধীরে ধীরে আফিমের মাত্রা বাড়াতে জ্বর ত্যাগ হোল। তিনি তখন তাঁকে আফিম ছাড়ার কৌশলটা শিখিয়ে দিলেন। যথা: এক ভরি এক গ্লাস জলে দিয়ে খানিকটা খেলেন। যতটুকু জল খেলেন, ততটুকু জল দিয়ে সেটা আগের পরিমাণ কোরে দিলেন। আবার

পরের দিন যতটুকু খেলেন, পুরণ কোরে দিলেন। এই উপায়ে আফিম ছাড়া যায়। কেন মিছে ছেড়ে কষ্ট পাচ্চেন। বোলচি আপনাকে, আপনার জেলে যেতে হবে না। আর যদি হয় তো সে ব্যবস্থা আমি কোরবো। আফিম সেখানেও পাবেন। ধীরে ধীরে শরৎচন্দ্র সেবার সেরে উঠলেন।

একদিন তিনি শুয়ে শুয়েই আমাকে বোললেন, দেখ, কি ভুলই জীবনে কোরেছি এই নেশা কোরে। যখন ক'দিন আফিম খেতুম না তখন এই পৃথিবীর সব কিছু আমার কাছে অতিশয় স্বচ্ছ সুন্দর ভাবে আসতো। যদি আমি নেশা না কোরতুম তো এর চেয়ে ঢের বড় লেখক হোতে পারতুম।

আমি হাসলে তিনি বোললেন, হাসচো যে? উত্তরে বোললাম, এ পাপ তোমার স্বকৃত নয়।

তবে?

তোমার ঠাকুর্দার পাপ, তিনি নেশা কোরতেন শুনেছি। জান, তোমার বাবাও নেশা কোরতেন?

জানি, কিন্তু জানলে কি কোরে তুমি?

দেখেছি। বড় দাদাকে তিনিই তো মদ ধরান। এ আমি জানি। "তুমি কি কোরে জান্‌লে?" জিজ্ঞেস কোরলে—দোরের ফাশা দিয়ে দেখে, উত্তর হোল।

বটে!

"ত্রিবৃত্তে" এই কথা আছে। তিন পুরুষ চলে বোললাম।

ঠিক ঠিক, এইবার আমারও মনে হোয়েছে।

তাই, বোললাম, আমাদের শাস্ত্রে আছে,—মদ্যম অদেয়ম্ অপেয়ম্ অগ্রাহ্যম্।

বড় মস্ত কথা!

শরৎচন্দ্র কিছুদিন ঐ এক্সপেরিমেন্ট কোরেছিলেন, এবং মাত্রা খুব কমেও এসেছিল।

কিন্তু ওর সংযম অতিশয় কঠিন কাজ। বিশেষ কোরে লেখার চাপ হোলে নিতান্ত কমজমে চলে না—বোলে শরৎচন্দ্র বেশ একটা বড় নিশ্বাস ছাড়লেন।

অনেকক্ষণ কোন কথাবার্তা হোল না।

হঠাৎ শরৎচন্দ্র উঠে বোসে আমাকে বোললেন: দেখো, আজ তোমাকে আমার মনের প্রগাঢ় বিশ্বাস বলি—জীবনে আমি কোন নেশা না করতাম তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি এর চেয়ে অনেক বড় লেখক হোতে পারতাম। যখন দিনকতক ওটা খুব কমিয়ে আনি তখন যে সব উপলব্ধি আমার মনে আসে, সে গুলো যে কতো বড় তা ভেবে আমি অবাক হোয়ে যাই! তখন আপশোষে আমার মনের যে কি অবস্থা হয় তা প্রকাশ করা সত্যিই শক্ত!

আমি শুনে খুব হাসতে লাগলাম।

হাসচো যে?

তোমার এই কথার ঠিক উল্টো কথাই আমার এক ডাক্তার বন্ধু তোমার সম্বন্ধে বোলে থাকেন।

কে তিনি?

তুমি তাঁকে চিনতে পারবে না। নামও আমি তাঁর তোমাকে বোলবো না।

চিনি তাঁকে?

সাক্ষাৎ চেন না। তিনিও লেখক; কিন্তু নাম আমি তাঁর বোলবো না।

কি বলেন তিনি শুনে রাখা ভাল। হাজার হোক, ডাক্তার বটেন তো তিনি!

বোলতে আমার আপত্তি নেই, তবে নাম বলার ফল শেষ পর্যন্ত ভাল দাঁড়ায় না। তবে সেই মানুষটিকেও আমি খুব শ্রদ্ধা কোরে থাকি।

বেশ, নাম বোল না; তবে তিনি কি বলেন, সেটা আমার জেনে রাখা ভাল।

তিনি বলেন যে, মদ ছেড়ে আফিং ধরার পর শরৎ বাবুর সাহিত্য অনেকখানি নিরস হোয়ে গেছে। আমারও মনে হয়, তাঁর কথা হয়তো সত্যি! নয় তো কতকটা তো বটেই।

কেন বলো ত?

আমার মনে হয়, "গৃহ-দাহ" বইখানি লেখার সময় তুমি বোধহয় সব চেয়ে বেশী নেশা কোরতে এবং ঐ বইখানি তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ বই। ওটার মধ্যে তোমার চিন্তাশীলতার একটি গভীর পরিচয় আছে।

উত্তরে তিনি বোললেন, বোধহয় তোমার কথা অনেকটা সত্যি ? আমারও বিশ্বাস ওটাই আমার "বেষ্ট" বই। ওটা লিখতে আমার সবচেয়ে বড় শক্তি ব্যয় হোয়েছিল বোলে আমার বিশ্বাস।

আমারও তাই মনে হয়।

কেন বলো ত ?

ওটাতে তোমার গুরু-মারা বিদ্যের পরিচয় আমি পাই। একখানি বই তুমি যতখানি সুখ্যাতি কর তার, তোমার সত্যি কোরে পছন্দসই হয় নি, আর সেটাকে তোমার বিদ্যের মতো কোরতে গিয়েছ। তাই বইখানি একটা যেন কেমন কেমন হোয়েছে ; কিন্তু মনস্তত্ত্বে তুমি বোধ হয় খুব বড় পরিচয় দিয়েছ তোমার শক্তির।

বোধহয়, শরৎ বোললেন, তোমার কথা অনেকটা সত্যি। ওটার যদি এডিশন ফুরোতো তো ঢেলে সাজাতাম—কিন্তু বড় হওয়াতে দাম বেশী হোল তাই আর সংস্করণ শেষ হোল না।

বোললাম, কাজেই আর তোমার অবসর হোল না ফের বদল করার।

উত্তরে শরৎচন্দ্র বোললেন, ভেবে দেখবো, বোধহয় তোমার অনুমান অনেকটা ঠিক। দেখ, "মুড্" মানুষের জীবনে বদলায় আর বয়সের সংগে মানুষের শক্তিও কমে আসতে থাকে। এখন আমার ধৈর্যের হ্রাস হোয়ে গেছে। আর অভাবটাও কোমে গেছে কি-না। এসব জীবনের বড় বড় 'ফ্যাক্টর।'

অত তলিয়ে ভাবার বুদ্ধি আমার নেই বোধ হয়। উত্তরে বোললাম।

তবে ঐ বইখানি লেখায় ফিরে ফিরতি অবসর যদি আসতো, তা হোলে বইখানির দরজা আরও বাড়তো নিশ্চয়।

শরৎ হাসলেন। বোললেন, বোধহয় তা হোত না। কেন না—আমার মনে হয়, ওতে আমার যথাসাধ্য শক্তির প্রয়োগই হোয়ে গেছে।

তবে ঐ বইখানি যে আমার সবচেয়ে ভাল বই, সে মত এখনও আমার সুদৃঢ়।

দেখ, চরিত্রহীন সম্বন্ধে তোমরা অনেক কিছু "হাল্লা" কোরে চুকেছ ; কিন্তু আমি একেবারে "আডাম্যান্ট"। তোমরা গল্পের দিকটায় জোর দাও—আমি কিন্তু চরিত্রের দিকটাই বড় মনে করি। চরিত্রহীনে আমার বিশেষ

কিছু ভুল হয়নি—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর একদিন তোমাকে আরও কিছু বোলবো—ছাপা হয়ে আসুক।

আমি হাসতে লাগলুম।

তোমার ও হাসি আমি খুব চিনি; কি ব্যাপার বল তো?

ব্যাপার খুব বড় কিছুই নয়—খুব সোজা। তুমি চালাক শয়তান, আর আমি বোকা শয়তান। তোমার আর আমার মধ্যে এই যা তফাৎ।

বোললেন শরৎ, এবার যে হেঁয়ালিতে কথা কইতে লাগলে!

ওটা তো তোমার কাছেই শেখা।

কি রকম?

তুমি আমাকে বহুবার বোলেছ যে চরিত্রহীন বইটার সংগে আমাদের কোন যোগ নেই। ওর মধ্যে তোমার দেবানন্দপুরের অভিজ্ঞতাই আছে। তা থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। কেন না, যে বয়সে মানুষের সেক্স বুদ্ধি জাগতে থাকে সেটা তোমার দেবানন্দপুরেই কেটেছে। সুরবালার কথা তুমি আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সত্যি-মিথ্যার মনোরম রস-সংশ্রবে অনেক কিছু বোলেছ। তোমার পুরী পালানর কারণও আমি জানি। সাবিত্রীর কথাও বোলেছ। কিন্তু ওগুলোর মধ্যে তোমার রসানগুলো তো বলনি; আর জানি, তাও কিছু খুলে বলাও তো যায় না।

কেন? শরৎ জিজ্ঞেস কোরলেন।

সে অসম্ভব, বোলে—উত্তর দিলাম—এমন সব কথা মানুষের মনে আনা-গোনা করে তা কারুর কাছেই বলা যায় না। আর যদি বোলতেই হয় তো, অনেক লুকোচুরি, অনেক রেখে ঢেকে বোলতে হয়। তুমি সে বিদ্যেয় ওস্তাদ। তুমি অনেকবার বোলেছ যে ওটা দেবানন্দপুরের গল্প। তা আমি অস্বীকার কোরব না। কেননা, ওর প্রথম পর্ব দেবানন্দপুরের ব্যাপার না হোলে তুমি পুরীই বা পায়ে হেঁটে পালাচ্ছিলে কেন? যখন তুমি স্পষ্টই বুঝেছিলে, সুরবালাকে তোমার সম্পূর্ণ ভুল বোঝা হয়েছে—তখনই তুমি নিজেকে সম্পূর্ণ অপরাধী মনে কোরে ছুটেছিলে পুরীতে জগন্নাথের কাছে দোষ ক্ষালনের জন্যে। পথে তোমার সাবিত্রীর সংগে পরিচয়। ঠিক নয়?

মুখ গম্ভীর কোরে শরৎ বোললেন—অনেকটা। তারপর বোললাম, সুরবালা নামটা কিন্তু তোমার ছোড়দার বৌএর নয়। ওটা শুধু দ্যোতক হিসেবে ব্যবহার কোরেছে, অন্য একজনকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে। নয় কি?

বোধ হয়।

না, নিশ্চয়।

শরৎচন্দ্র স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

কথা কোইচো না কেন?

ভাবচি·····

কি ভাবো?

তুমি ডিটেক্‌টিভ হওনি কেন?

যে হেতু ওটা আমার পছন্দসই লাইন নয়; তা ছাড়া, আমি বেঁটে—পুলিশ-লাইনে ওদের আইনে আমার প্রবেশের দরজা বন্ধ।

বটে? প্রশ্ন কোরলেন তিনি—কেন?

আমি হাইটে শর্ট!

এখন সুরবালা কে, তা কি তোমাকে বোলে দিতে হবে? শান্তিপুরে কা'কে পৌঁছে দিতে গিয়ে কুলিদের সংগে মারামারি কোরেছিলে নৈহাটি ষ্টেশনে?

তুমি জানলে কি কোরে সে কথা?

উত্তরে বোললাম, তোমার কোন্ এক অনবহিত মুহূর্তে গল্প কোরেছ, সেই বীরত্বের কাহিনীটি! সেটি আমার মনে দৃঢ় গাঁথা হোয়ে আছে!

ঠিক তো! কিন্তু আমি সে কথা কবে ভুলে গিয়েছি।

তার কারণ আছে।

কি কারণ?

তুমি মহাবীর স্বামী! ওসব ছোট-খাট কথা তোমার মনে না থাকায় কিছু যায়-আসে না। কিন্তু আমার যে ওটা মস্ত খুঁটো! তা ছাড়া, তুমি গোড়ায় আমাকে বলওনি। দাদার কাছে প্রথম শুনি—তারপর সেজ-বৌদিদির কাছে।

সে আঁধার কবে? শরৎ জিজ্ঞেস করলেন।

ভাগলপুরে প্লেগ হওয়ার সময় তাঁদের আরেরিয়া নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি বোলেছিলেন, শরৎটা গোঁয়ার।

শরৎচন্দ্র নাক মুখ উঁচু কোরে বোললেন, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! ভগবান তুমি যে গত হোয়েছো, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হোল। Q. E. D.

শরৎ খানিকটা যেন ভেবাচেকা খেয়ে রইলেন। জানি, ওটাও ওঁর একটা "পোজ" ছাড়া আর কিছুই নয়। সবটা চেপে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া আর কি!

বোললাম, যতই না কেন বোকা সাজ কিম্বা ভুলে যাওয়ার ভান কর, ইউ আর কট্ রেড্ হ্যান্‌ডেড্!

কিসে?

"নেক্সট্ ইজ গন-পাউডার।"

তুমি আমাকে পাগল কোরে দেবে। পেটে পেটে অনেক বুদ্ধি ধর, দেখি!

এসব গুরু-মারা বিদ্যে।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতায় কেটে গেল।

তারপর শরৎ বোললেন, একপক্ষ যদি টেম্পার লুজ করে তো প্রসংগ বন্ধ করাই উচিত।

একজনকে পাগল কোরে দেওয়া ভাল কি? অনুমতি হোলে বলি। তুমি যেন টেম্পার ঠিক রাখতে পারছ না।

নাঃ, টেম্পারটা ঠিকই আছে। শুধু অপার বিস্ময়!

তবে তাড়াতাড়ি কাজ সারি?

সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

তা হলে অনুমতি দিচ্ছ? বলি?

বল।

আমাদের বাড়িতে কিরণশশী বোলে কি কেউ কোনদিন ছিলেন?

মনে হোচ্ছে না।

তবে থাক—বোলে কোন লাভ নেই। তুমি তো অস্বীকার কোরবেই জানি।

না না, তুমি বল,—তোমার দৌড়টা দেখছি।

আচ্ছা শরৎ, কিরণশশীকে কিরণময়ী কোরলে—ব্যাপারটা কতখানি চাপা পড়ে?

মৃদু হেসে শরৎচন্দ্র বোললেন, কিছুটা তো পড়ে।

বোললাম—তবে চাপাই থাক। ও আলোচনার কি দরকার?

চুপ কোরে বোসে বোসে শুনি—

লোককে ধোকা বোঝাবার আর্টে তুমি সিদ্ধিলাভ যে করেছ, তা ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণুও অস্বীকার কোরবে না।

শরৎচন্দ্র বোললেন, ধরেছ অনেকখানি; তবে সবটা ধরা প্রায় অসম্ভব। দেবানন্দপুরে ওর আরম্ভ বটে। পুরী পালানও সত্যি। সাবিত্রী নিশ্চয় তার নাম নয়। তাকে হারিয়ে ফেলাও সত্যি। কিন্তু লেখকের কেরামতির কি কোন প্রশংসা নেই, বোলতে চাও তুমি?

না। বোললাম, ষোল আনার জায়গায় বিশ আনা দিলেও সবটা দেওয়া হোল কি না চিন্তার বিষয়। সেখানে আমি দাতাকর্ণ।

এ বিদ্যে তুমি একদিন পাখি-পড়া কোরে শিখিয়েছ আমাদের; কিন্তু আমরা কেউ শিখতে পারিনি। সবাইএর 'কচের' অবস্থা। প্রয়োগ কোরতে কেউ পারে নি। ওইখেনেই তোমার প্রতিভা। আর আমাদের ল্যাজে গোবরে!

শরৎচন্দ্র হো হো কোরে হেসে উঠলেন। বোললেন,—একেবারে ঠিক কথাটি বোলেছ। তবে একটা কথা তোমাদের অনেকবার বোলেছি। আজও বলি—

প্রতিভা আমি মানিনে। রবীন্দ্রনাথ যাই বলুন, তাঁর চরণে আমার সহস্র প্রণাম। আমি নিজে কোন দিন প্রতিভা মানিনে। মানবও না। আমার বিশ্বাস, ওটিকে অসীম পরিশ্রমে অর্জন কোরতে হয়। বাবার শক্তি ছিল, কিন্তু তিনি তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কোরতে পারেন নি।

দীর্ঘদিন ধোরে এর সাধনা কোরতে হয়। প্রকৃতি পরিশ্রমের মূল্য দেন

দান ধ্যান করাটা তিনি অপব্যয় মনে করেন। অর্জন কোরতে হবে, আদায় কোরে নিতে হবে। ভিক্ষা কি দানের কোন মর্যাদা থাকাই উচিত নয়।

তুমি "হেরিডিটি" মান না ?

মানি ; কিন্তু তার মূল্য খুব কম। যেন একটা অস্ত্রের তুমুখো ধার। আসল কথা, সেখেনে কাঁচা লোহায় হবে না—হওয়া চাই ইস্‌পাত। কাঁচা লোহাকে ইস্‌পাতে পরিণত করা যায় চেষ্টা আর পরিশ্রমের কৃতিত্বে। সেইটেই আসল কথা। অব্যবহারে তাতে মর্চে ধোরতে পারে। আলটপকা পোঁড়ে পাওয়া জিনিসের অপব্যবহার হয় বেশী। ব্যবহার হোলে ভোঁতা ছুঁরিতেও ধার তোলা যায়।

শরৎ খানিকটা চুপ কোরে থেকে বোললেন—তুলনা কি অ্যানালজি দিয়ে বোঝাতে গেলে বোঝান ঠিক হয় না। উপদেশ আত্মস্থ করা চাই। খাদ্য হজম না কোরতে পারলে পেটের অসুখ হয়।

যাক ও আলোচনা এখন। আসল কথায় এস। তুমি বোলচো—প্রতিভা সাধনা দিয়েও পাওয়া যায়।

না, তা বোলচিনে, বোললেন তিনি। সাধনা দিয়েই তোমাকে পেতে হবে। স্বোপার্জ্জিত হওয়া চাই। বড়লোকের ছেলে টাকার অপব্যয় করে—নয় কি ? তাই কোনক্রমে তিন পুরুষ পর্যন্ত যায়।

আমার শিক্ষাদীক্ষা—সব কিছু মামার বাড়ির পাওয়া, তা আমি ভালো কোরেই জানি। আমার দিদিমার দোষ ছিল—তাই তাঁর ছেলেমেয়েরা ঠিক যা হওয়া উচিত ছিল হোতে পারেনি। আমার মা-ই সব চেয়ে কম আস্‌কারা পেয়েছিলেন। তাই, সব ছেলেমেয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছিলেন। বাকীরা অতিরিক্ত আস্‌কারা পেয়ে মন্দ পথে চোলে গিয়েছিল। মা যদি আরও কিছুদিন বাঁচতেন, তাহলে আমাদের সংসার অনেক ভাল হোতে পারতো। আমার লেখাপড়া তাঁর আগ্রহ আর চেষ্টায় যা কিছু হোয়েছে। আমাদের সংসার ভেংগে গেল মার অকাল-মৃত্যুতে।

আমাদের শ্বশুরপুর যাওয়াটাই বাবার একটা প্রকাণ্ড ভুল হোয়েছিল। তিনি সেখানে গিয়ে—যাক, সে আলোচনায় দরকার নেই।

শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বোললেন, আমার পালিয়ে যাওয়াটা বোধহয় মোটের উপর ভালই হোয়েছিল। যাক—এ প্রসংগের আর কোন প্রয়োজন নেই।

* *
*

বোললাম, তোমার রেঙ্গুন যাওয়াটার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বোললেন, নিতান্ত দরকার হোয়েছিল। পরম আত্মীয় হোলেও উপ-যাচক হোয়ে আমার সে বয়সে কোন আত্মীয়ের বাড়িতে দীর্ঘদিন থাকা যে উচিত হয় না, এই ধারণা আমাকে পীড়াই দিচ্ছিল। আমি তো দিদির বাড়ি চোলে যেতে পারতাম। গিয়েও ছিলাম এবং বুঝেই এসেছিলাম যে সেখানেও থাকা ঠিক হবে না। পাড়াগাঁয়ের লোকদের কালচার কম। আর ওদের বাড়িতে ভাইএদের মধ্যে বেশ একটু অ বনিবনাও শুরু হোয়ে গিয়েছিল। মুখুয্যে মশাই সেটা বুঝেই আমাকে অর্থ সাহায্য কোরেছিলেন অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার জন্যে।

আমার ভুল হোয়েছিল চাটুয্যে মশাইকে বোঝার। রেঙ্গুনে গিয়ে তা বুঝেও কোনরকমে কার্যসিদ্ধির জন্যে টিকেছিলাম। অত অল্প দিনে বর্মী-ভাষা আয়ত্ত করা যায় না। আর মনে কোরতে পারিনি যে, অত বড় সার্জন মন্দ লোকটা ধাঁ কোরে মরে যাবে। তাই যখন বুঝলাম যে, বাঁচা সম্ভব নয়—তখনই সোরে গেলাম।

এই বোলে শরৎচন্দ্র একটা এমন মুখের ভংগী কোরলেন, যা দেখে দুঃখই হয়।

তিনি তারপর আর আমাকে কোন কথা কোন দিন এই সম্পর্কে বলেননি; কিন্তু জানি যে সে কি অবস্থা! বিদেশে বিভূঁএ সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা। সেখেনে যে পালায়, সে বাঁচে!

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর যাঁরা এদেশে এসে তাঁর বন্ধু বোলে পরিচয় দিতেন, তাঁরা আড়ালে আবডালে তাঁর নিন্দেও কোরতেন, শুনেছি। ওটা মানুষের একটা স্বভাবের সামিল ধোরে নিলে আর দুঃখ করার কিছুই থাকে না। ওর একটা লঘু মনস্তত্বও আছে। লঘুচিত্তের লোকেরা অন্যের নিন্দে কোরে নিজের সাফাই জানায়!

চাটুয্যে মশাইএর মৃত্যুর পর অনুদিদি, তাঁর স্ত্রী, আমার দাদাকে (মণীন্দ্রনাথ) সংগে কোরে রেঙ্গুনে যান। সেখানে গিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের সংগে দেখা কোরতে পারেন নি। লোকের মুখে শুনেছিলেন যে, শরৎচন্দ্র পীড়িত হোয়ে কোন হাসপাতালে আছেন। তাঁর এমন কোন অসুখ যে সকলের সংগে দেখা করেন না। দাদার তখন ধর্ম-প্রমুখ মন, তাই তিনি আর দেখা করার চেষ্টাই করেন নি। শরৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা মোটেই ভাল হয়নি। সেটা স্বাভাবিক।

*   *   *   *

শরৎচন্দ্রের জীবনী লেখার জন্য হরিদাস বাবু আমাকে অনুরোধ করেন। পরে তা সম্ভবপর হয়নি "বিশেষ কোন-কোন ব্যক্তির" আপত্তি থাকায়।

সেই সময়ে রেডিওতে আমি "অজ্ঞাত শরৎচন্দ্র" নামে অনেকগুলি ভাষণ দি। এবং প্রবাহ মাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে তাঁর জীবনী লিখতে শুরু করি। ভারতবর্ষের লেখাটা যে-কোন কারণেই হোক বন্ধ কোরতে আমরা বাধ্য হোয়েছিলাম।

কিছু কিছু চিঠিপত্র আমাদের কাছে যে নেই, তাও নয়; কিন্তু তারকা-মণ্ডিত চিঠিপত্রগুলির ওপর নির্ভর করা চলে না।

ব্রজেন বাবুর প্রকাশিত অনেক চিঠি এই দোষদুষ্ট হয়েছে দেখি। সেই সকল পত্রগুলি ছাপা না হওয়াই উচিত ছিল।

একদিন মহাবোধি হলে শরৎচন্দ্রের মিটিং বোসছে। কেন জানিনে, তবে আমার দুর্বুদ্ধি হোয়েছিল নিশ্চয়, গিয়ে উপস্থিত হোলাম। কে সভাপতি হোয়েছিল মনে নেই, জাঁদরেল গোছের কেউ হবেন নিশ্চয়। আমার ডাক পড়লো। দুচার কথা বোলেছিলাম মনে হয়।

তখন মহাবীর স্বামী গোছের একজন উঠে এমন চিৎকার কোরতে লাগলেন যে চারিদিক থরহরি কম্পমান। বোললেন তিনি যে, শরৎচন্দ্রের জীবনী লেখার ভার তাঁরাই নিলেন !

চিনিও তাঁদের,—চিনিনেও। শরৎচন্দ্র বেঁচে থাকতে তাঁর বাড়িতে পাণ্ডা পাঠিয়ে দরজার সামনে গাড়ি রেখে তার মধ্যে বোসে থাকতে মধ্যে মধ্যে দেখা যেত বটে। মুখোমুখী হবার সাহসের কোন পরিচয় একদিনও পাওয়া যায় নি।

অনেক বাগাড়ম্বর কোরে শেষে বোললেন,—জীবনী লেখার ভার তাঁরাই নিলেন। আমার তো ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল !

তার পরই চিঠির সৃষ্টি। চিঠির শিলাবৃষ্টির এক নম্বর, দু নম্বর, তিন নম্বরে শরৎ পরিচয়ের বালাপোষ গায়ে দিয়ে ব্রজ-সুন্দর বার হোলেন।

আমার বক্তব্য এই যে, শরৎ-পরিচয় যদি লিখতেই হয় তো—যাঁরা শরৎচন্দ্রকে তাঁর সঠিক স্বরূপে জানতেন, তাঁদের আহ্বান করা উচিত ছিল ব্রজেন বাবুর—যেমন তিনি উপেন্দ্রনাথকে ডেকেছেন। এখনও শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্ট জীবিত আছেন। ব্রজেন বাবুর বইটিতে এখনও অনেক ভুল আছে। সেগুলি যথা সময়ে প্রকাশ হোয়ে পোড়বে নিশ্চয় একদিন। যেমন পোড়েছে শ্রীনরেন দেব মশাইএর "খেয়ালি পোলাও"এ।

* * *

রেঙ্গুন থেকে ফিরে শরৎচন্দ্র বছরে অনেকবার কোরে ভাগলপুরে যেতেন। সেই সময় তাঁর মনের একটা প্রবল ইচ্ছা আমাকে জানিয়ে ছিলেন।

আমাকে বোললেন, দেখ, তুমি লেখা বন্ধ কোরে দিলে কেন ?

এর উত্তর আমি তোমাকে দিতে গেলে, অনেক অপ্রিয় কথা উঠে পড়ে। তাই না বলাই ভাল।

যদি লিখি তো আর নিজের নাম দিইনে। তুমি এতক্ষণ যে "যমুনায়" খগেন বাঁড়ুয্যের গল্পের প্রশংসা কোরলে, তা আমি শান্তভাবে শুনে গেলাম। মনে মনে হাসলাম।

কেন বল তো ?

ওটা আমারই লেখা গল্প। খগেন বন্দ্যোর নয়। তুমি কেন আমাকে সাহিত্য জগতে জোচ্চোর খাড়া কোরেছ। "কুন্তলীন" পুরস্কারে আমার নাম দিয়েছ—তা আমাকে কবে বোলেছিলে মনে পড়ে ?

পড়ে—যেদিন রেঙ্গুন যাই, তার আগের দিনে তোমাদের মেসে গিয়ে—তোমায় বাইরে ডেকে এনে বলি।

তার আগে বলনি কেন ?

আমাকে খগেন অনুরোধ করাতে আমি লিখে তার হাত দিয়ে যমুনা আপিসে পাঠাই। তাঁর সাহিত্যিক হওয়ার বড় সাধ ছিল।

'কুন্তলীন পুরস্কারের'—প্রথম বৎসরের গল্পের লেখকের নাম ছিল না, মনে পড়ে ?

পড়ে।

কেউ মনে কোরেছিল জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা, আর কেউ বোলতো রবীন্দ্রনাথের লেখা।

সেইটে বন্ধ করার জন্যে—নিয়মের কড়াকড়ি হোয়েছিল—তাও তোমার অবিদিত নয়।

তবে তুমি কেন আমার নাম দিলে ?

শৃগাল সিংহের চামড়া গায়ে দিয়ে বার হোলে তার বিপদ হয় অনেক। শরৎচন্দ্র বেঁচে নেই আজ। কিন্তু তাঁর জীবনী লেখার সময় নরেন দেব মশাই—এই নিয়ে আমাকে কত লজ্জা দেবার চেষ্টা কোরেছেন তা অনেকে জানেন।

এসব কথা প্রকাশ করার প্রয়োজন, একদিন মনে হোয়েছিল কোনো দিন হবে না। কিন্তু বয়সের সংগে মানুষ বিজ্ঞতর হয়।

হরিদাস বাবু "শেষের পরিচয়" শেষ করার কথা আমাকে সর্ব প্রথমে বোলেছিলেন। কিন্তু আমি রাজি হই নি।

শরৎচন্দ্রের কথা তাঁর মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে চাপা হচ্ছিল। ছয় মাস পর্যন্ত তিনি ওটা চালাতে বোলেছিলেন। পরে তাঁর কর্মচারী শরৎ দেন

যে, আর ছাপা হবে না। তখনই আমাদের "প্রবাহ" চালানির জল্পনা কল্পনা হয়।

* * *

কোলকাতা আসার আগে শরৎচন্দ্র নিজের চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সব নিজে-নিজেই ব্যবস্থা কোরছিলেন, সেগুলোতে তাঁর অসুখটার উপশমের কোন লক্ষণ প্রকাশ না পেয়ে বেড়েই চোলেছিল। তাই, তাড়াতাড়ি চোলে আসার একান্ত যে প্রয়োজন তা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝে ওঠার দিকে মনই দিতে চাইছিলেন না। শরৎচন্দ্র বুঝেও বোধ হয় ভয়ে বুঝতে চাইছিলেন না। মধ্যে মধ্যে আবার এমন কথাও বোলতেন, যা থেকে বোঝা যেত যে, তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর জীবনের শেষ আসন্ন। কিন্তু ব্যবস্থাগুলো ঠিক তেমনি হোচ্ছিল, যেমন হোয়ে থাকে ফাঁসির আসামীর জন্যে। মানে,—খুব পেটভোরে খেতে পারলেই তিনি তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন! তাই ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থার পর যন্ত্রণায় অসম্ভব ছটফট কোরতেন।

কিন্তু রুগীকে ভাল ডাক্তারের হাতে দেওয়ার কথা কেউ কানেই তুলতে চায় না।

যে অসুখ হোয়োছিল, তাতে খাওয়াটা বন্ধ করার দরকার। কে শোনেই বা কার কথা! বিশেষ কোরে আমাদের বড় মা-টি!

তাঁর হাত থেকে উদ্ধার না কোরতে পারলে শরৎচন্দ্রের আর কিছুতেই রক্ষা নেই বুঝে, আমি শরৎকে বোলতে লাগলাম—শরৎ, চল, এক্সরে করিয়ে আসল অসুখটা কি, তা জেনে তার ব্যবস্থা করা যাক।

উত্তরে শরৎ বলেন—কি হবে?

তোমার মত একজন বিজ্ঞান-ভক্ত মানুষের এ কথা বলা শোভা পায় না। তা কোরতে, অর্থাৎ এক্সরে কোরতে দুচার দিন লাগবে—তারপর তুমি ফিরে এসো—ডাক্তারদের ব্যবস্থাগুলো জেনে নিয়ে! জানি, তুমি কিছুতেই ভয় পাও না। উত্তরে শরৎচন্দ্র বোললেন—কিন্তু ভয় আমাকে ছেঁড়া কাঁথার মতো জড়িয়েছে।

অবশেষে তিনি রাজি হোলেন।

"তখন আবার সবাই আসতে চায়!"

কোন রকমে একবার বেরিয়ে না পোড়তে পারলে আর শরৎচন্দ্রকে বাঁচানো অসম্ভব বোলে মনে মনে স্থির কোরো—আমি প্রায় বিদ্রোহ কোরে বোসলাম।

তখন শরৎ কোন প্রকারে রাজি হোলেন। বোললাম তাঁকে,—রমেশ বাবুকে সংগে নিলে হয় না শরৎ?

কেন?

পথের ভরসা, সংগে ডাক্তার একজন থাকা ভাল; নয় কি?

বাঃ, এইতো ঘন্টা কয়েকের পথের ব্যাপার।

বড়-মা জেদ ধোরলেন,—আমি যাব সংগে। তোমার দেখা শোনা কে কোরবে?

শরৎ এই বোলে বোঝালেন তাঁকে, যাবো আর আসবো। আর মামা তো সংগে রইলেন। হোঁদলা সেখেনে আছে; তাকে তার কোরে দেবো।

অবশেষে কোলকাতায় আসাই স্থির হোল।

সতের

জন্ম আর মৃত্যু ঘরে ঘরে মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিকের ব্যাপার হোলেও তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় থেকেও যেন নেই! আমরা জানি, জন্মালে একদিন মরতেই হবে; তা থেকে অব্যাহতি নেই কারুর। তবুও মৃত্যুর সংগে আমরা অপরিচয়ের সম্বন্ধ রেখে দূরে দূরে থেকে যেন অনেকখানি নিরাপদ আছি বোলে মনকে তোক দি! ঘোর অশান্তির মধ্যে অনেকটা সান্ত্বনা; মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের সৃষ্টি কোরে সেই অব্যর্থ নিশ্চয়তাকে আড়াল করি, দূরে রাখতে চাই! এটি কি মানুষ-জীবনের একটি প্রহেলিকা নয়?

শরৎচন্দ্রের মতো একজন অতিবুদ্ধিমান মানুষের মনের এই প্রহেলিকাটি দেখায় আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য একটা কিছু যা হোয়েছিল, তা আজও ঠিক কোরে বুঝে উঠতে পারিনি।

বিচারক সব জেনেও, যখন নিজের বিচারের পালা আসে, তখন কেবল যেন নিজেকে ভেঙে ফেলেন। শেষ-জীবনে সেই সুচতুর বুদ্ধিমান মানুষটিকে কখনো নিজেকে ভেঙে ফেলেচেন দেখি, আবার পরের মুহূর্তে—ভাঁটো হোয়ে খাড়া হোয়ে উঠচেন! যখন একলা থাকেন, তখন নিজের প্রকৃত সত্তাকে হারিয়ে ফেলে, চিন্তার জট পাকিয়ে ফেলে—ডাকেন আমায়। আবার অন্যের উপস্থিতি হোলেই সামলে ওঠেন বিচিত্র ক্ষিপ্রতায়!

জানিনে, দিগ্‌গজ পণ্ডিতও নই, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও ঘটে নেই! এই যে একটি খেলার অভিজ্ঞতা আমার মনে তিনি বারম্বার সৃষ্টি কোরে বিপদে ফেলতেন আমাকে, তাই বা কেন? শৈশবে যৌবনে আমাদের শিক্ষকতা কোরতেন। শেষের ক'দিন কি তিনি আমাকে মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তার পাঠ দিয়ে জীবন-আহুতির জন্যে শক্ত কোরে তুলছিলেন? বাস্তবিক সেই প্রচণ্ড দাহের মধ্যে যে থাকবার সৌভাগ্য পায়, তার কাঁচা লোহাত্ব ঘুচে গিয়ে ইস্পাতত্ব লাভ হয়। সেই পাঠ, সেই শিক্ষা, সেই ট্রেনিং দেওয়ার জন্যেই কি তিনি আমাকে ডাক দিয়েছিলেন শেষের দিনের সেই পরমাশ্চর্য জীবনের প্রবলেম্ কি কোরে সলভ করা যায় তা শেখবার জন্যেই?

মাস তিনেকের কঠোর ট্রেনিংএ একটা শিশুকে যেন দ্রুত গতিতে বার্ধক্যের সীমানায় তিনি পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

সে সব কথার যদি ক-খ-গও বলি তো পৃথিবীর মানুষের কাছে আমি নিজেকে পরম অপরাধী কোরে তুলব নিশ্চয়।

কোলকাতায় পৌঁছবার আগে কোন একটা ষ্টেশন থেকে তিনি কোলকাতার বাড়িতে তার কোরবেন যে রাত ৮৷৯ টার সময় পৌঁছবেন। ছেলেটি যেন বেরিয়ে না যায়। আর তাঁর গাড়িটা যেন ষ্টেশনে কালী নিয়ে এসে অপেক্ষা করে। এই পরামর্শ সকালেই স্থির হোয়ে গিয়েছিল।

* * *

সকালে চা খেতে খেতে শরৎ বোললেন, যাচ্ছি বটে রবিবারে, কিন্তু রিটার্ণ টিকিটে ফিরব চারদিন পরেই।

বোললাম, তা ফিরো, চল তো আগে।

কেন, ফিরতে দেবে না, না কি?

দেবেই না বা কেন? আর তুমি····· শোনই বা কার কথা, আর রাখই বা কার কথা!

বিলক্ষণ—বোলে শরৎ কি ভাবতে লাগলেন আনমনা হোয়ে।

* * * *

এদিকে নেপথ্যে পরিপন্থী সভা বোসে গেছে আড়ালে আবডালে।

লক্ষণ ভায়া পাঁজি থেকে উদ্ধার কোরেছেন যে, রবিবারে "যাত্রা নাস্তি" যেহেতু, পুনশ্চ ত্র্যহস্পর্শ।

কিন্তু এ কথা শরৎচন্দ্রকে বলা চলে না। কারণ তিনি শুধু কুসংস্কারমুক্ত হোলেও রক্ষা ছিল। হয়তো বা জিদ্ ধোরে বোসবেন,—ঐ দিনেই যাব।

বড়-মা সম্মুখ-সমরে আগু বেড়ে যুদ্ধ কোরতে কোমর বেঁধে প্রস্তুত! তাঁর যা কিছু সম্বল কিন্তু চোখের জলে বুক ভাসানো। কিন্তু বিপক্ষ-পক্ষ যে আমল দেবেন না—তাও প্রায় তাঁর জানা কথা! তাই প্রকাশচন্দ্রের উপর প্রধান সেনাপতির ভার পোড়লো। তার পেছনে পাঁজি-পুঁথি নিয়ে থাকবেন লক্ষণ ভায়া, তৃতীয় বুদ্ধিমানের কূট তর্ক। এবং সব শেষে বড়-মা'র সশব্দ ক্রন্দন।

* * * *

অভিনয় শুরু হোল।

নির্লিপ্ততা দেখাবার জন্তে আমি বোসলাম কিঞ্চিৎ অদূরে, মুকুল আর বাঘাকে নিয়ে অন্ধ কষাতে। কান রইল সেই যুদ্ধক্ষেত্রে শব্দের "পোজে"।

প্রকাশচন্দ্র ধীরে পদবিক্ষেপে শব্দহীন অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

কি রে খোকা?

রবিবারে তো যাওয়া হয় না।

মা কি বলেন?

সোমবার।

আমি তো তাই ভাবছিলাম। কালকের মধ্যে কাজগুলো শেষ হোয়ে

উঠচে না···বেশ সোমবারেই। কিন্তু দেখিস প্রকাশ, ট্রেণ ফেল হওয়ার লজ্জা আর যেন না পাই! কুড়েমিরও শেষ নেই আমাদের। এই পনর-কুড়ি দিনে একটা টাইম টেবল পর্যন্ত আনা হোল না! যা, যা, কাউকে পয়সা দিয়ে বোলে আয় আনতে। ভুল হয় না যেন।

যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল।

*　　　*　　　*　　　*

সোমবার শুনে শরৎ আমার দিকে ফিরে বোললেন, যাক—একদিন, একদিনই লাভ। দেশ ছেড়ে যেতে চায় না মন আমার। কাল না হয় তুমি যাও, আমি যাব পরশু।

একদিন এগিয়ে কেন আমি?

কতদিন এসেছ, দিন কুড়িক তো হবেই—বেশীই বোধ হয়। বন্ধু-বান্ধবদের সংগে দেখা-শোনা কোরবে। একটু মুখ বদলানও তো হবে।

কে আমার বন্ধু, কার সংগে দেখা-শুনো! তার কোন দরকার আছে বোলেও তো মনে হয় না। তা ছাড়া, যে কাজে এসেছি—তাই কোরতে চাই।

উত্তরে শরৎ বোললেন, তবে চল, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।

এবার গোপালকে নিও।

কেন?—জীবন?

জীবন বড় ভুলো।

কি রে গোপাল! তুই যাবি?

সে চুপ কোরে থাকে।

বোললাম, গোপাল শোকার্ত, ওর বৌ মোরেছে—সবে পরশু। তাছাড়া ও তোমার কোলকাতার বাড়িও দেখেনি। ওর শোকটা কম হোতে পারে জায়গা বদলে।

সে বেশ হবে—এই পরিবর্তনে। কি রে গোপাল,—যাবি?

যাব, বাবু।

তবে, তোর ভাই কাজ কোরবে ঐ ক'দিন। চারদিন পরে—মানে, শুক্কুর বারে তো ফিরচি।

* * * *

তখন রূপনারায়ণে জোয়ার আসচে। এগিয়ে গিয়ে দু'জনে দেখতে লাগলাম—উদ্‌বেল জলরাশির অধীর উচ্ছ্বাস। অধীর শুধু নয়, উন্মামতাও আছে তাতে।

এই বাড়িটা—শরৎ বোললেন—আমায় যে কি মর্মান্তিক আকর্ষণে টানে যেন আমাকে পেয়ে বোসেছে!

বোললাম, সেই রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের মতই; তফাৎ যাও—তফাৎ যাও—সব ঝুট্‌ হ্যায়—

শরৎচন্দ্রের চোখ দুটি বাষ্পকরুণ হোয়ে যেন অশ্রু বর্ষণ করে আর কি!

* * * *

সেদিন সোমবার সকাল। পাঁজির মতে সব বাধা-বিঘ্ন দূর হোয়ে গিে জ্যোতিঃ সম্পদে উদ্ভাসিত হোয়ে—দেবদূতের মতোই প্রতিভাত হোে উঠেছে—স্বর্গলোকের আলোক-রশ্মিতে—এই ধূলি-মলিন পৃথিবীটা!

নিঃশব্দে নেমে আসচে—কানে নয়, মানুষের প্রাণের নিভৃত কন্দরে অতি সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলিতে:—"সময় হোয়েছে নিকট! এখন বাঁধন ছিঁড়ে হবে।" ওরে তোর সঞ্চয়ের ছিন্ন কন্থা আর মিছে বইতে হবে না, নামি রাখ ধূলি-বহুল অশ্রুসিক্ত মলিন মাটির উপর ঐ কাদায়! জানিস্‌নে যে, আ তোর আহ্বান এসেছে স্বর্গলোক থেকে! মুক্তির সে পরম আহ্বান!

আগে চল্! আগে চল্! মোরে থাকা মিছে, আগে চল্—ও-রে, আগে চ

পালকি এলো।

শরৎ দেখছেন তাকিয়ে তাকিয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে বোললে মস্ত ভুল হোয়েছে তোমার পালকির কথা তো বলা হয়নি!

উত্তরে বোললাম, রিকশ চড়িনে, পালকিতেও চড়িনে।

কেন? শরৎ জিজ্ঞেস কোরলেন।

ওরা তো আমার মতোই মানুষ—কেবল অপরাধ ওদের দারিদ্র্য। অপরাধ তো আমারও আছে। আমিওতো গরীব ইস্কুল মাষ্টার ছাড়া ত কিছুই নই।

তবে ? যাবে কিসে ?

কেন ? শ্রীচরণ বাবুর জুড়িতে। ওই বিষয়ে আমি পরিপক্ক। তুমি অসুস্থ বোলে পালকি ! আমি তো খোদার খাসি !

শরৎ বোললেন,—তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে।

তাই যাবো।

তাহলে খেয়ে নাও।

বড়মাকে বোলে রেখেছি তো। হোলেই ডাক পোড়বে। আর, আমরা তো আপিসের ট্রেনে যাব না। বড় ভিড় হয়। কিসের তাড়াতাড়ি ? একটু পরে গেলে ক্ষতি কি ?

অন্যমনা হোয়ে কিছুক্ষণ থেকে শরৎ বোললেন—কোলকাতায় গেলে সারব ? বিধান তো বোললেন,—ম্যালেরিয়া।

তাই যদি বলেন, তেমনি ব্যবস্থা হবে। তবে আমি যতটুকু জানি,— তোমার জ্বর নেই, তবুও ম্যালেরিয়া ?

উত্তরে শরৎ বোললেন, আমার আধ কপাল হোল—বোললেন কি-না—, ম্যালেরিয়া !

এখন হয়তো বোলবেন টাইফয়েড ! আত্মসমর্পণ করা ? সেটাই যে পারিনে।

খাওয়ার ডাক এলো।

খাওয়ার পর শরৎ বোললেন—তুমি এগিয়ে যাও না।

নাঃ। তুমি তাহলে যাবে না।

কি কোরে জানলে ?

মন বোলছে, তোমাকে রওনা কোরে তবে যাবো।

পালকি এলো।

শরৎ উঠে গোবিন্দজিকে প্রণাম কোরতে গেলেন। সেই দাশ সায়েবের গোবিন্দজী, যিনি রাজাকে ফকীর করেন !

ফিরে এলেন গুণ গুণ কোরে গান গাইতে গাইতে।

"পথের পথিক কোরেছ আমায়—সেই ভালো, ওগো সেই ভালো। আলেয়া জ্বালালে প্রান্তর ভালে সেই আলো মোর সেই আলো"—

শরৎচন্দ্র রওনা হোলেন—চোলেছি পিছু পিছু; প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে ধানের সোনালি ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে, বেঁকা চোরা উঁচু নীচু পথ দিয়ে। বাহকদের হুম্ হুম্ শব্দ!

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ওপর মন্দ-মধুর হাওয়ার স্পর্শটি যেন প্রিয়জনের কোমল শীতল হাতের স্পর্শের মতই সন্তাপ-দুঃখহরা! পেছনেই আছি!

ডোবার জল শীতের শুকনো হাওয়াতে দিন কয়েকের মধ্যে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেছে প্রায়! সেই জলে, অর্থাৎ মাছ বেশী জল কম,—বিচিত্র কৌশলে মাছ ধোরেছে গরীব ঘরের মেয়েরা!

বাঁধের পাড়ে লম্বা লম্বা ছিপ ফেলে বোসে গান ধোরেছে মেছুড়ে ছেলেরা :—

কালো মায়ের রূপের আলোয়
উজল হের সারা ভুবন!

বাঁধের নীচে জলের ওপর বিচিত্র বর্ণের মাছ-রাঙা পাখিগুলো—পাখা কাঁপিয়ে লক্ষ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অধীর উদ্যমে কম্পমান!

কুড়ি একুশ দিন আগে—এই পথেই, ঠিক এমনি কোরেই চোলেছিলাম একদিন! সেদিন ছিল মনে কতই না আশার জোর; আর আজকে? সন্দেহ নেই, প্রশ্ন নেই, দ্বিধা পর্যন্ত নিঃশেষে বিশ্রামিত!—শুধু নিরাশার যেন তপ্ত মরু! বাঁচবার পথে নিরাশার অন্ধকার যেন কালো পর্দার মতো ঘনিয়ে আসছে! মনের ঘন অন্ধকার থেকে যেন কে ফিস ফিস কোরে কি বোলছে—তাতে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে নিরাশায় গাঢ় গূঢ় হোয়ে ওঠে!

আনমনে চোলেছি তো চোলেছি; চমকে উঠলাম পালকি বাহকদের হুম্ হুম্ শব্দে!

শীর্ণ বিবর্ণ মুখ, শাদা চুল, পালকির মধ্যে শুয়ে পোড়ে কি দেখে, কি ভাবে ঐ মানুষটি! তার আয়ত দুটি চোখ বিস্ফারিত কোরে ঐ দিগন্তের সীমানায়!

কালো মায়ের রূপের ঝলক!

কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের জলের অপরাধ তাড়াতাড়ি মুছে ফেলি।

পালকি থেকে নিজেকে আড়াল কোরে—শ্লথ গতিতে,—মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলেছি!

বন্ধুর পথ পায়ে দেয় বাধা! কানে কানে কার যেন চাপা কণ্ঠের নিস্পন্দ বাণী:

ফিরে যা, ফিরে যা!

*　　　　*　　　　*

ইষ্টিশানের রোয়াকের উপর উঠতেই সোজা নজর পোড়লো গিয়ে শরৎচন্দ্রের পালকি থেকে বার কোরে দেওয়া শীর্ণ দুখানি পায়ের ওপরে। দামী কাজ করা নীলচে রংএর মোজার তলায় চকচকে বার্ণিশ তোলা বাদামী রংএর জুতো!

কি অপূর্ব সাজ মহাপ্রয়াণের!

আর এক পাও যেন এগোনো যায় না!

শরৎচন্দ্র গোপালকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন।

দূরে দাঁড়িয়ে যে বড?

এমনিই······

বড় রোদ লেগেছে—না? চোখ দুটো যে লাল? কি হোয়েছে—সুরেন?

আমার একখানা হাত ধোরে চাপ দিতে লাগলেন—আদর কোরে তিনি। জরাজীর্ণ হাতখানি! মৃত্যুর করাল স্পর্শে তখনি যেন হিম-শীতল!

টিকিট কেনার সময় জিজ্ঞেস কোরলেন, রিটার্ণ কিনি?

বুকের মধ্যে থেকে যেন কঠিন কি একটা ঠেলে উঠে কথা বোলতে দেবে না! চোখের মধ্যে যেন বিশ্বের বাষ্প আগলা হোয়ে ঝোরে পড়ে আর কি? তাই মাথা নেড়ে জানলাম, না।

কেন, হে?

কোন্ দিন কেমন থাক, ঠিক তো নেই। শুক্রবারে ফেরা যাবে কি না, কে বোলতে পারে!

ঠিক বোলেছ। দেখছো,—আমি কেমন যেন "বোকটা" হোয়ে গেছি!

তবুও তো, অনেকের চেয়ে বুদ্ধিমান আছ!

তা থাকতে পারি হয়তো—একটু উজ্জীবিত হোয়ে শরৎ হাসলেন।

তোমার সেকেন্ ক্লাস—আমরা থার্ডেই যাবো।

তা কি কখনো হয়?

সবাই চলো ইণ্টারে—গোপালও; ওকে তফাৎ কোরে···কটা পয়সাই বা বাঁচাবে।

*　　　*　　　*

গাড়ি এলো, উঠলাম আমরা। জিনিস-পত্রগুলো ঠিক উঠেছে কি না দেখে,—সবাই সুস্থির হোয়ে বোসতে না বোসতে—এক ছোকরা হৈ-হৈ কোরে উঠলো—যেন ভূত দেখেছে সে!

ইস্ শরৎ বাবু! এ কি-ই-ই চেহারা হোয়েছে আপনার!

মনে তার হয়তো শরৎচন্দ্রের প্রতি পরম শ্রদ্ধা কি ভালোবাসা ছিল। কিন্তু বুদ্ধির ঘটে তার বর্তমান ছিল অষ্টরম্ভা, ষোল কড়াই কাণা!

কোন উত্তর না দিয়ে শরৎচন্দ্র অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। না রাম, না গঙ্গা!—কোন জবাবই দিলেন না।

কিন্তু শুভানুধ্যায়ী তথাকথিত "বিচ্ছুরা" অতো সহজে ছাড়বার পাত্র হয় না দেখি!

শরৎচন্দ্র তখনও টেম্পার লুজ করেন নি। একটু হেসে বোললেন, ওহে, আমার নিজের চেহারা দেখার জন্যে, নিদেন পক্ষে আমারও একখানা ভাঙা আর্শি থাকা সম্ভব। ওরকম হৈ হৈ করার দরকার কি? মানুষের অসুখ হোলে সে জানতে পারে। মাথায় হাতুড়ি ঠুকে তাকে জানিয়ে দেওয়ার দরকার হয় না"। ছোকরা চুপ হোয়ে গেল।

পরের ইষ্টিশানে গাড়ি থামলে একজন ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন, কেমন আছেন, শরৎবাবু?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বোললেন, কেমন দেখছেন?

আগের চেয়ে ইম্প্রুভড্।

শরৎ ছোকরাটির দিকে চেয়ে বোললেন, দেখছো ? ইনি আজ-ডাক্তার !

ছেলেটি লজ্জা পেয়ে গাড়ি থেকে নেবে গেল।

শরৎচন্দ্র বললেন, যাচ্ছি কোলকাতা। ইনি আমার সুরেন মামা,—একস্-রে করাতে বল্লেন। দেখি, কি বলেন ওঁরা।

গাড়ি ছেড়ে গেল।

শরৎ বোললেন, একটা বড় ভুল হোয়েছে। হোঁদলকে তার করা হয়নি। ভুল হোয়েছে।

পরের স্টেশনে কোরে দিলে হবে না ?

হবে। সেখেনে গাড়ি দাঁড়ায়ও বেশীক্ষণ।

কালীকে গাড়ি নিয়ে আসতে বলা হোল—আর হোঁদলকে বাড়িতে থাকতে বলা হোল। যথা কালে আমরা হাওড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম এবং কালীকে গাড়ি সমেত দেখা গেল।

* * * *

বাড়িতে হোঁদলচন্দ্র নেই। শরৎ রাগ কোরে বোললেন, কেউ কারুর নয় এ দুনিয়াতে। মনে হোল ব্যাপারটা শেষ হোল ঐ খেনেই।

আহারের সময় ফিরলে শরৎ তাঁকে জিজ্ঞেস কোরলেন, কোথায় গেছলি ?

“জীবনের আনন্দ কোরতে।”

উত্তর শুনে আমরা অবাক্ হোয়ে গেলুম।

এ কথা শুনে রাগ হয়ই। হোঁদল বাবুকে সকালে কুলি ডেকে জিনিসপত্র নিয়ে চোলে যেতে হোল বাড়ি ছেড়ে। তারপর কি হোল তা পরে শুনতে পাবেন পাঠকেরা। এখন ধামা-চাপা থাক।

শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে যে, তাঁর জীবনের আনন্দ বোলে যে ভাবটি প্রকাশ কোরেছিলেন, তার আসল অর্থ সংগীত চর্চা কোরতে গিয়ে-ছিলেন। তাঁর মনে মনে ধারণা ছিল, তিনি আকবরের সময় জন্মালে মিঞা তানসেনকেও ডাউন কোরতে পারতেন।

জানিনে, শরৎচন্দ্র সেদিন জীবনের আনন্দ বোলতে কি বুঝে ছিলেন এবং এও বুঝেছিলাম যে, লঘু পাপে গুরুদণ্ডই হয়েছিল তাঁর।

যখন শরৎ নার্সিং হোমে গিয়ে একান্ত পীড়িত হোয়েছিলেন—যমে মানুষে টানাটানি কোরছে, তখন তিনি তাঁকে গিয়ে বোলেছিলেন—তোমার মামা, তোমার বাড়িখানি বন্ধক দিয়ে তোমার চিকিৎসা চালাচ্ছেন।

শরৎচন্দ্র আমায় সেই প্রশ্ন কোরলে উত্তরে বোলেছিলাম—কোলকাতায় এত বোকা লোক নেই শরৎ, যে আমার কথায় বাড়ি বাঁধা রেখে টাকা ধার দেয়। ও পাগলের প্রলাপ, শোন কেন?

ভগবানের সৃষ্টিটা বৈচিত্র্যেই পূর্ণ!

শরৎচন্দ্র নেই—সেদিনের সব লেঠা চুকেবুকে গেছে, তবুও সেই মানুষটির আমার ওপর বিরাগের বিষাগ্নি একতিলও নেভেনি। সাপের যেমন দাঁত আছে, মানুষেরও দেখি সেই রকম কি যেন একটা আছে!

যাক অবান্তর।

* * *

শরৎচন্দ্রের বাড়ি ফেরার টান দেখে ভয় হোল যে জীবনের কাছিটা বা ছিঁড়েই যায়। গেলাম চুপি চুপি কুমুদ বাবু ডাক্তারের কাছে। সব বৃত্তান্ত বোলে বোললাম—আমি যে এসেছি তা বোলবেন না। তবে দু-এক দিনের মধ্যে বিধান বাবুকে আনার ব্যবস্থা না কোরলে—শরৎ বাড়ি ফিরে যাবেন, নিশ্চয়।

বোললেন কুমুদ বাবু, আজই যাচ্ছি দেখা কোরতে—পাঁচটা ছটার সময় বিকেলে। আপনি বাড়ি থাকবেন,—আমি তাঁকে নিয়ে আসবো।

বেশ তো,—বেলা পাঁচটার সময় আমি নিশ্চয় বাড়ি থাকবো।

ফিরে এলাম।

শরৎ প্রশ্ন কোরলেন, কোথায় গিছলে?

কুমুদ বাবুর কাছে, বিধান বাবুকে দেখানো তো দরকার।

শরৎচন্দ্র নাকে একটা শব্দ কোরে বোললেন, উনি তো বোলবেন ম্যালেরিয়া! আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার নাম গন্ধ নেই।

তা তো জানি, এমন হাওয়া-বাতাসের দেশে সাধ্য কি টিকে থাকে ম্যালেরিয়া!

ঠাট্টা কোরছো ?

মোটেই না ;—বিশেষ কোরে তোমার ও-বাড়িতে।

এবার শরৎ প্রসন্ন হোলেন। বোললেন,—তবুও তুমি জান না ওর দোতালার ব্যাপার !

বিলক্ষণ জানি।

কি রকম ?

আমার কট্‌কি চটি সেবার ছুঁচোবাজি দেখিয়েছিল ! ঝড়ে যে জুতো উড়ে যায় তা আমার জানাই ছিল না। জান শ্রীমান কালিদাস কি বলেন ?

না তো !

বলেন, শরৎবাবু যে জিনিয়াস তা ঐ বাড়িখানা দেখলেই বোঝা যায় !

শরৎ মহা খুশী হোয়ে রকিং চেয়ারে বার কতক দুলে নিলেন।

কালী এলো।

এখন কুমুদ বাবু ডাক্তারকে পাওয়া যাবে না, কালী ?

নাঃ—তিনি সকালে রুগী দেখতে যান। বেলা তিনটে চারটের সময় গেলে পাওয়া যাবে।

কালী, গাড়িটা ঠিক আছে তো ?

কেন ?

আজ দুপুরে যাব কিছু বাজার কোরতে।

উড়ে বামুন এলো,—কি রান্না হবে বাবু ?

ঐ মামাকে জিজ্ঞেস কর। তোমার রান্নায়—লঙ্কা দেবে তো, সইবে না আমার। আমার দিকে ফিরে বোললেন—কি খাব ?

ওটমিল পরিজ।

ও পারবে না তৈরি কোরতে।

ও আবার কেন ? আমি কোরে দেবো।

পারবে ?

কিছুই শক্ত নয়।

আছে ?

দেখেছি, বড় মা দিয়েছেন।

ঠাকুর মোশাই উনুন ধোরেছে? গরম জল চড়িয়ে দাও,—আমি আসছি। কালী,—ভালো দুধ আনতে হবে যে,—

শরৎ বোললেন, দুধের গাড়ি চোলে গেছে?

না।

কিছু দুধ নিয়ে নাও। মামার চা হবে—একটু বেশী কোরে নিও।

শরৎ পরিজ খেয়ে বোললেন, এ কি দিলে?

পরিজ।

বাবা! পরিজ যে এত চমৎকার হয়, তা জন্মে জানিনে। ওরা এ সব কিছু জানে না তৈরি কোরতে।

ঠাকুর চা দিয়ে গেল।

শরৎ ডাকলেন, কালী ও কালী—মামাকে টোষ্ট করে দাও,—না হয় বাজার থেকে কচুরি কি পাঁপর এনে দাও।

* * *

একটুখানি ঘুমিয়ে পোড়েছিলেন শরৎ। উঠে বোললেন, ভয় পাচ্ছিলাম আসতে এখেনে—কেই বা সেবা করে? এখন দেখছি, তোমার হাতে থাকলে হয়তো সেরেও যেতে পারি। মনে মনে রাগ হোচ্ছিল। তুমি যেন জোর কোরে ছিনিয়ে আনছ মনে হোচ্ছিল; কিন্তু এসে দেখছি খুব ভাল হোয়েছে। মনে হচ্ছে—দিনকতক এমনিভাবে তোমার সেবার হেফাজতে থাকলে সেরে যেতেও পারি।

"যেতেও পারি"—মনে কোরলে সারতে দেরী হবে। মনে কোরতে হবে—নিশ্চয় সারবো। সন্দেহের ছন্দাংশ থাকবে না। মরা মানুষ ইচ্ছাশক্তির জোরে ফিরে আসে।

তা ফের আসে না-কি?

সত্যবান আসেনি? যমকে ফিরে যেতে হোয়েছিল।

সেদিন এক সময়ে ডাঃ কুমুদ বাবু এসে বোলে গেলেন,—রাত্ত ৮টা ৮॥ টার সময় বিধান বাবু আসবেন দেখতে আপনাকে, বেরিয়ে যাবেন না কিন্তু।

আপনিও সংগে আসচেন তো ? শরৎ জিজ্ঞেস কোরলেন।

উত্তরে তিনি "নিশ্চয়" বোলে চোলে গেলেন।

দুপুরে আহারাদি সেরে শরৎ বোললেন, চল, একটু ঘুরে আসি—ঘরে বন্ধ হোয়ে থাকলে আরও মন খারাপ হয়!

ঘোরা মানে তো কিছু টাকার শ্রাদ্ধ। যে সব জিনিসের কোন দরকার নেই তাই কেনা! মানা কোরলে কথা শোনে কে? আমার টাকা তো ভূতে খাবে! একথা মুখে লেগেই আছে।

একদিন খুব গম্ভীর হোয়ে বোললাম, তুমি ফের যদি ওই সব অলক্ষুণে কথা বল, তো আমি চোলে যাব।

ও! দুঃখ পাও বুঝি! আর বোলবো না!

সে যে কত খুটিনাটি জিনিস কেনা হোচ্ছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। একটা বিলিতি কুড়ুল কিনলেন। এর কি দরকার তোমার?

এটা ষ্টীলের—ধার ওঠে চমৎকার—বড় বড় গাছ পাঁচ-সাত মিনিটে কেটে ফেলা যায়।

সেরে উঠে গাছ কাটবে?

না হে, পাড়াগাঁয়ে থাকতে কখন কিসের দরকার হয়, কেউ বোলতে পারে কি?

হুইল, সুতো, বোঁড়শি—সে যে কত কি, তার নেই ঠিক-ঠিকানা।

খুব ঘুরে ফিরে এসে—কুমুদ বাবুর বাড়ি যাওয়া গেল। সেখানে সিজন ফ্লাওয়ারের চারা বসাচ্ছে মালী। এটা কি, ওটা কি ফুল, তাকে প্রশ্ন কোরে হায়রাণ কোরে তুললেন। বোললেন আমাকে, ইচ্ছে করে আবার সেই ছোট বেলার মত একটা বাগান করি।

তোমার বাড়িতে বাগান করার জায়গা কোথায়?

সে আমার প্ল্যান মাথায় ঘুরছে

তবে কর-না কেন?

রোগ;—কোরবো; আগে শুনে নি ডাক্তারেরা বলে কি। সে সব প্ল্যান আমার মাথায় ঘুরছে! দেখি, আজ বিধান কি বলেন।

* * *

বাড়ি ফিরে শরতের যেন শয্যা-কণ্টকি হোল। ওঠেন বসেন, ঘড়ি দেখেন। সাড়ে আটটা বাজার তো অনেক দেরি! সময় আর কিছুতেই কাটতে চায় না।

পাঁচটা তখনও বাজেনি। বোললেন,—চল একটু ঘুরে আসিগে।

কোথায়?

মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে। ভালো সিগারেট কিনতে হবে। এগুলো আর ভালো লাগছে না।

কেন?

শরৎ ম্লান হাসি হেসে বোললেন, কিছুই যেন ভালো লাগে না। কি যে হোল আমার!

মনে থাকে যেন, বিধান বাবু ৮॥ টা টাইম দিয়েছেন। তার আগে ফেরা চাই। যদি 'কিছু নয়' বলেন তো কাল ফিরে আমি ভাগলপুরে চলে যাব।

আমাকে সারিয়ে তবে ফিরতে পাবে।

যদি কিছুই না হোয়ে থাকে তো যাওয়ার বাধা কোথায়?

তাহলে তোমার সঙ্গে চোলে যাবো। তোমাকে সহজে ছেড়ে দেবো না।

বেশ তো একটা চেঞ্জ হবে। গঙ্গা এসেছেন। পাথর ঘাট জারি হোয়েছে।

এখনও অনেক সময় আছে। বাড়িতে থাকতে মন চাইছে না।

তবে চলো।

হগ সাহেবের মার্কেটে না গিয়ে গেলেন কুমুদ বাবুর ল্যাবোরেটারিতে।

এখানে এলেন, শরৎবাবু?

বাড়িতে মন টিকছে না। কখন যাবেন আপনারা?

সাড়ে আটটা।

তার আগে ফিরবো নিশ্চয়।

ডাক্তার বোললেন, কিছু যেন খাবেন না।

শরৎ রস কোরে বোললেন, সিগারেটও নয়?

কুমুদ বাবু হাসতে লাগলেন, তা এক-আধ টান দিতে পারেন।

মার্কেটে গিয়ে খুব কড়া সিগারেট কিনলেন। তারপর এস. পি. চ্যাটার্জিদের ফুলের দোকানে যাওয়া হোল। তাঁরা বোললেন, একটু দেরি কোরবেন?

কেন?

ভালো ভালো তোড়া দেবো আপনাকে।

কিসে নেবো?

সে চিন্তা কোরতে হবে না।

আমার তো ভাস্ নেই।

তাও দেবো। কাজ হোলে ফিরিয়ে দেবেন। নৈলে রাখবেন—যতদিন ইচ্ছে। আপনাকে দিতে পারা তো পরম সৌভাগ্য আমাদের।

কতকগুলো অব্‌সিন্ গল্প লিখতে পারি, এই তো আমার গুণ-গরিমা!

গাড়িতে বোসে অপেক্ষা করা হোচ্ছে।—এক মুসলমান বুড়ো এসে কতকগুলো খাতা দেখিয়ে বোললে, এগুলো আপনাদের নিতেই হবে।

কেন?

ঘরে খাবার নেই, খালি হাতে যাব না।

কত দাম দিতে হবে?

এক রূপাইয়া!

পকেট থেকে দুটি টাকা বার কোরে বোললেন, এক রুপেয়া দাম, আউর দুসরা রুপেয়া খোদাকা দোয়া!

বৃদ্ধ খুশী হোয়ে বোললে, জিন্দে রহো বাবুসাব।

বিস্তর ফুল নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম—তখনও অনেক সময় বাকী আছে ডাক্তারদের আসার।

শরৎ নিজের লেখার ঘরে ফুলগুলো সাজিয়ে রেখে কালীকে বোললেন, আমাকে চা দাও।

আপনি?

ওঁর প্রসাদ একটু জুটবে নিশ্চয় ;—কি বল মামা ?

অঙ্কশাস্ত্রে কিন্তু উত্তরে একই হয় ।

কি রকম ?

উপরে পাঁচ নীচে পাঁচ, যেমন $\frac{৫}{৫}$=১ । আমি মামা, তুমি শিক্ষাগুরু,— উত্তরে ১ হবে না ?

তার মানে ভাগাভাগি !

না কালী,—তুমি দু'জনকেই দাও । আমাকে যদি বড় কাপে দাও তো বেশী খুশী হবো !

কালী বোললে, দু'জনকেই বড় কাপে দেবো । আমি কেন অপরাধী হবো ?

শরৎ হেসে বোললেন, কালীর বুদ্ধি হাজ !

বিধানবাবুর সময়ের জ্ঞানটা এত ওতপ্রোত হোয়ে গেছে যে,—আর ঘড়ি দেখতে হয় না, ঘড়িরাই বোধ হয় ওঁকে অবাক হোয়ে দেখে হতবুদ্ধি হোয়ে যায় !

ঠিক সাড়ে আটটা—হর্ণ বেজে উঠলো । কালীকে বলাই ছিল । দুজনে উপরে উঠে এলেন ।

ব্যাপার কি শরৎবাবু ? আবার কি বাধিয়ে বোসলেন !

এবার শরৎ উত্তরে দিলেন, ম্যালেরিয়া নয়—উদুরী !

কেন ? কি খাচ্ছিলেন ?

তপসে মাছ !

তাই ! কোন ডাক্তারদের না পাঠিয়ে নিজে উদরসাৎ কোরছিলেন ? হিঁদুরা তাইতো ভোগরাগের ব্যবস্থা কোরে খেতো সেকালে । দেখি, জামাটা খুলে ফেলুন ।

এদিক ওদিক টিপে, খাবড়ে বোললেন, কিংকিংস । বোলতে না বোলতে, আমাদের শব্দটা বোধের মধ্যে আসবার আগেই হর্ণ বেজে উঠলো—গাড়ি শুদ্ধ দুই ডাক্তার উধাও !

ডাক্তার দুজনের চোলে যাওয়ার ভংগীতে সে ঘরে বাজ না পোড়লেও আমাদের দুজনের অবস্থা হোল স্তব্ধ বজ্রাহতের মতোই ! দুজনেই ঐ উচ্চারিত

ভয়াল "কিংকিংসের" মানে জানিনে! শরতের কি মনে হোয়েছিল তা জিজ্ঞেস করার সাহসও হয়নি, ইচ্ছেও হয় নি! কেন না, আমার যা মনে হোয়েছিল, তাতে নিজেকে পরম অপরাধী বোলেই মনে হোয়েছিল। মাঝখানে যেন মৃত্যু-নদীর ব্যবধান! শরৎ সে নদী উত্তীর্ণ হোয়েছেন—আর আমার মনের উপর ভেবাচেকার স্তব্ধতা সমাকীর্ণ! কানে বাজছে কিনি কিং কিনি কোরে কিংকিংসের শব্দ!

শরৎ বোললেন, ওর মানে কি হে? জানো?

জানিনে তো! তবে একটা নিশ্চয় ভয়ংকর কিছু!

কেন? তিনি জিজ্ঞেস কোরলেন।

ডাক্তার দুজনের উর্ধ্ব পুচ্ছে পালানো দেখে তো তাই মনে হয়।

শরৎ কিছুক্ষণ পরে বোললেন, সুরেন, আর রক্ষে নেই! আমায় কালে ধোরেছে নিশ্চয়!

ও কথা যে আমারও মনে হোয়েছে, তা গোপন করা ছাড়া-উপায় কি? বোললাম, আগে ওর কি মানে তা জানার দরকার তো! কালাকালের বিচার পরে।

এমন সময় শ্রীমান নরেন দেব এসে ঘরে ঢুকলেন।

ব্যাপার কি?

শরৎ বোললেন, জান নরেন, কিংকিংসের কি মানে?

না তো।

শরৎ বোললেন, আমার বড় ডিক্‌সনারি আছে। সেটা দেখলে বোঝা যাবে।

দেখে বোঝা গেল যে, অন্ত্রের ব্যাধি! নাড়ি জট-পাটকেল।

তা হোলে তো "এক্স-রে" করার দরকার।

তা হোলে, শরৎ বোললেন, অপারেশন কোরতে হবে।

বললুম, তার আগে এক্স-রে করাতেই হবে।

তা যা কোরতে হয়, করান যাবে; চল কাল বাড়ি ফিরি।

বাড়ি? এইতো তোমার বাড়।

সকালে একবার যেতে হবে কুমুদ বাবুর কাছে।

শরৎ বোললেন, যেতে তোমার হবে না, এতক্ষণে কুমুদ বাড়ি ফিরেছেন। ফোন কোরলে বুঝতে পারা যাবে।

ফোন করা হোল,—কুমুদ বাবু তখনও ফেরেন নি।

পরের দিন কুমুদ বাবুর বাড়ি গেলাম। তিনি বোললেন, এক্স-রে করাতেই হবে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যান।

গেলাম। ক্যাপটেন মুখার্জি বোললেন, আপনাদের কথা মতো কাজ হবে না। ডাক্তারের চিঠি চাই।

কুমুদ বাবুর চিঠিতে হবে?

হবে বৈ-কি! নিশ্চয় হবে।

বাড়ি ফিরে শরৎকে বলাতে তিনি বোললেন, সম্ভব কুমুদ বেরিয়ে গেছেন। ও-বেলা ওঁর ল্যাবোরেটারিতে যেতে হবে। নয়তো ৩৷৪ টের সময় বাড়িতে। কি হবে এসব কোরে, সুরেন? চলো, দেশে ফিরে যাই। যা হবে তা তো বোঝাই গেছে। আর বৃথা চেষ্টা। কথায় আছে, 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'।

দেশে ফিরে যাওয়াটা স্রেফ বোকামি হবে।

তবে?

বেলা ৩৷৪ টের সময় ওঁর বাড়িতে যাওয়া যাবে। ব্যাপারটা কি, সেটা ঠিক কোরে জানতে হবে তো। ভয় খেয়ে পালিয়ে যাওয়ার মানে পরিপূর্ণ কাপুরুষতা।

শরৎ কালীকে ডাকলেন, কালী, ও কালী!

কি বাবু?

কুমুদকে বাড়িতে কখন পাওয়া যাবে জেনে এসো। তারপর—আজ কি খেতে দেবে সুরেন?

কি চাও খেতে, বলো।

আজও ওট-মিল পরিজ কর, বেশ চমৎকার হয়। তাছাড়া পেটের কোন ট্রাবল হয় না। তোমার ঠাকুরের ঘরে গিয়ে রান্না-বান্না কোরতে অসুবিধে হয়।

একটা হিটার, একটা ইলেকট্রিক ষ্টোভ কিনে আনা যাক। তোমার রান্না ঘরে গিয়ে কাজ কোরতে ভারী অস্থবিধে হোচ্ছে নিশ্চয়। চল তবে; কালী, আমাদের একটু ঘুরিয়ে আনবে? দুধের কথা বোলে দিয়েছিলে, দিয়ে গেছে কি?

গেছে।

তুমি মামার কাছে রান্নাগুলো শিখে নাও না।

কালী এসে বোললে, বাবু, একটা ছাগল হোলে যখন ইচ্ছে তখন দুধ পাওয়া যাবে—আর ছাগলের দুধ খুব ঠাণ্ডা।

বেশ তো। কোথায় পাওয়া যাবে?

শিয়ালদার হাটে।

কবে কবে হাট হয়?

শুক্রবার আর সোমবারে।

আজ বেলা হোয়ে গেছে। সোমবার সকাল সকাল গিয়ে একটা কিনে আনা যাবে।

*   *   *   *

সোমবার সকালে একটা দুধুলি ছাগল কিনতে বার হোয়ে যাওয়া গেল।

শরৎ বোললেন পনর টাকার বেশী দাব দেবেন না। পনর টাকা, মনে হোল আমার, বেশ "ফেয়ার" দাম। এখন দুধ দেবে কতখানি?

কালী বললে, দুধ তো গরু-ছাগলের মুখে। ভালো কোরে খেতে দিলে দুধও দেবে। ঘাস দিতে হবে, দানা দিতে হবে। চরিয়ে আনতে পারলে আরও ভালো।

*   *   *   *

একজন মুসলমান ফিকে খয়েরি রংএর একটা ছাগল নিয়ে ঢুকলো বাজারে। সে আমাদের দেখেই চিনেছে—মানে, আমরা যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তা বুঝতে তার কিছুমাত্র দেরি হয়নি।

শরৎ বোললেন, কি হে, বিক্রি কোরবে না-কি?

উত্তরে সে বোললে, এ জন্তু কেউ বেচে? একবার দেখুন এর ঢং—বোলে

সে একটা বাঁটে হাত দিয়ে বেঁকিয়ে টান দিতেই সিমেণ্টের রোয়াকের উপর দুধের ধারা ৬।৭ হাত দুরে গিয়ে পড়লো। যেন ফোয়ারা!

আমরা শুধু অবাক নই, হিপনটাইজড হোয়ে গেলাম যেন!

শরৎ জিজ্ঞেস কোরলেন, কত দুধ দেয় দিনে?

দুধ তো ওদের মুখে—যেমন খাওয়াবেন তেমনি দেবে। ওর লেখা-জোখা নেই,—মাপ নেই।

কি দাম চাও বড় মিঞা?

পঁচিশ টেকা।

বেশী হোচ্ছে।

আপনি কি দেবেন?

বারো।

আপনি ভদ্দর লোক, পনর দিন, লিয়ে যান। ওর কম হবে না।

শরৎ দিলেন ১৫৲ টাকা।

গাড়িতে তুলে নিয়ে রওনা দেওয়া গেল।

শরৎ বোললেন, 'হিগলিং' পছন্দ করিনে। জিনিসটা—খাওয়ানর ওপর নির্ভর কোরছে!

মিঞা সেলাম কোরে বক্র হাসলে।

কালী গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে এক গাল হাসলে। বোললে, দিনে দু সের দেবেই।

বাড়ি ফিরে দুর্গোচ্ছবের ধুম পোড়ে গেল। ছোলা-মটর এলো—ভিজিয়ে দেওয়া হোল। ঘাস কিনে এলো। একটা হৈ হৈ রৈ রৈ সব। যেন আকাশের চাঁদ নেমে এসেছে!

* * *

সকালে বাঁটে হাত দিয়ে কালী অনেক কোস্তা-কুস্তি কোরে এক ফোঁটাও দুধ বার কোরতে পারে না। শরৎ অবাক হোয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন, আর হাসেন। কি কালী, কি বুঝছো?

শালা মেজিক দেখালে! ব্যাপার কি?

শরৎ গম্ভীর হোয়ে বোললেন, সাগর শুখায়ে যায়। বেটা ভোজবাজি দেখালে! ব্যাপার কি সুরেন?

এমন একটা কিছু আছে—যা আপাতত আমাদের বুদ্ধির বাইরে! ওর দুধ হচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কিছুই নেই। সেই দুধ যাচ্ছে কোথায়? ওর লম্বা বাঁট, পালানটাও বড়। ও দুধটা নিজেই খাচ্ছে! এই তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস!

শরৎ চোখ বড় বড় কোরে বোললেন, খুব সম্ভব। এখন উপায় কি?

সহজ,—ওর মুখটা পালানে যাতে পৌছতে না পারে বুদ্ধি কোরে তাই কোরতে হবে।

সে কি কোরে হবে?

বেশ শক্ত কাপড়ের থলি কোরে ওটা বেঁধে দেওয়া আর সিং দুটো বাক্সের কাঠের সংগে ফুটো করে বেঁধে দেওয়া। মুখের কাছে খাবারেব টিন থাকবে। মানে—পালানে মুখ কিছুতেই পৌছবে না। ও-বেটা এই রকম একটা কিছু. হিকমৎ কোরেছিল হয়তো!

ঠিক বোলেছ!

দু'জনে লেগে যাওয়া গেল। বাক্সটার মাঝখানে একটা তক্তা দিয়ে পালানটা ছোট ফুটোর মধ্যে দিয়ে বাইরে কোরে দিয়ে আর একখানা কাঠ দিয়ে ওর বসার জুৎ কোরে দিয়ে মুখের কাছে প্রচুর খাবার, জল, দানা দেওয়া হোল।

পরের দিন সকালে একস্‌পেরিমেণ্ট সাক্‌সেস্‌ফুল! দুধ দুয়ে নিয়ে ছেড়ে দিতেই দেখা গেল যে বাকি দুধটা ছাগল নিজেই খেয়ে নিচ্ছে।

* * *

বড়মা-রা আসতেই উড়ে ঠাকুর বোলছে তাঁকে যে, যে ছাগল নিজের দুধ খায় তাকে বাড়িতে রাখলে হয় কর্তা, নয় গিন্নী মরে। তিনি এমন কান্না শুরু কোরলেন যে, সে ছাগল বিদায় করা ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না।

তখন শরৎ এক ময়ূর কিনে বোসলেন। এদিকে কাঠ এলো—প্রকাণ্ড

গ্যালারি তোয়ের হোল। তাতে টব বসলো। একগাড়ি মাটি এলো। আর নানা জাতীয় গাছ কিনে শরৎচন্দ্র শৈশব-যৌবনের গাছের ফিরে-ফিরতি বাগান-খেলা শুরু কোরে দিলেন। মানে, নিজেকে সর্বদাই একাজে-সেকাজে ভুলিয়ে রাখার বিধিমত চেষ্টা কোরতে লাগলেন।

ওদিকে এক্স-রে শুরু হোয়ে গেল। মানে, বাড়িতে দোল দুর্গোৎসবের ব্যাপার।

একদিন চুপি চুপি আমায় বোললেন, আমার উইলটা করিয়ে দাও। তোমাকে আমার এষ্টেটের একজিকিউটার কোরে যাব।

উত্তরে বোললাম, সর্বনাশ! তা যদি কর তো আমি থাকবো না এখেনে এক দণ্ডও।

তখন বাবার গল্প কোরলাম। তিনি তখন এক জমিদারের ম্যানেজার। একদিন তিনি বাবাকে ডেকে বোললেন, আপনাকে আজই কোলকাতা যেতে হবে।

কেন?

আমি একটা ভারি দুষ্কর্ম কোরেছি। একটা পাজি প্রজাকে খুন কোরে পুঁতে দিয়েছি। ম্যাজিষ্ট্রেট তো আপনার হাতধরা। কিন্তু কাগজগুলোর মুখ বন্ধ কোরতে হবে। কিছু কিছু টাকা দিয়ে আসতে হবে।

বাবা উঠে-পোড়ে বোললেন, আমায় ক্ষমা করুন। আমি খুনে মালিকের কাজে ইস্তফা দিলাম। আজই চার্জ বুঝিয়ে বাড়ি যাব।

সেই রাতে বাবা চোলে এলেন চাকরি ছেড়ে সটান বাড়ি। জমিদার উইলে তাঁকে একজিকিউটার কোরেছিলেন। বাবা তাতেও ইস্তফা দিয়ে দায় মুক্ত হোয়েছিলেন।

দোহাই তোমার শরৎ! আমাকে কিছুতে জড়িও না। যদি জড়াও, আমি আজই পালাব।

শরৎচন্দ্র স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বোললেন, তবে উইল করার সাহায্য কর! কোরবে না?

কোরবো। উপরে গিয়ে বিজুবাবুকে (উমাপ্রসাদ) ফোন করে বোললাম এক্ষুনি এলো। শরৎ তোমায় ডাকছেন।

আমি আর নীচে গেলাম না। বিজুবাবু এলেন; আর দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের কি পরামর্শ হোল—তার একটি কথা আজও আমি জানিনে। আর দরকারও হয় নি।

* * * *

শরৎচন্দ্রের শব দাহের দিন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র অনুযোগ কোরেছিলেন যে, কতদিন নার্সিং হোমে গেলাম কৈ আপনার সংগে এদিনও দেখা হয় নি!

আপনারা—উত্তরে বোলেছিলাম,—যে কাজ কোরতে যেতেন, তা নির্বিঘ্নে কোরতে পারবেন বোলেই তো আমরা সোরে যেতাম। সেই ব্যবস্থাই ছিল। আপনাদেরও সময় নির্ধারিত ছিল আসার; আবার, আমাদেরও সময় নির্ধারিত ছিল খেতে যাওয়ার। তাই, "চোরে-কামারে" দেখা হোত না!

শুনে নির্মলবাবু হাসতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্রের বুদ্ধিও ছিল যেমন, আবার ভব্যতা-বোধও ছিল তেমনি চমৎকার। লোকে অনেক সময়ে তাঁকে বুঝতে পারতো না।

সে কি রকম? জিজ্ঞেস হোল।

মনে করুন, আপনি আর আমি প্রতিবেশী। আমার ছেলে যদি আপনাদের সংগে কোন অন্যায় ব্যবহার করে—আর আপনি যদি সোজা পুলিশ করেন তো—শরৎচন্দ্রের মতে আপনি অন্যায় করেন। শরৎচন্দ্রের মতে, আপনার উচিত ছিল তাঁকে প্রথমে বলা। তিনি যদি কোন উচিত ব্যবস্থা না করেন তো আপনি পুলিশ কোরলে তাঁর ক্ষোভের কোন কারণ থাকে না! সমাজে হৃদ্যতার সংগে থাকতে হোলে এমনি কোরে পরস্পরের ইজ্জৎ-সম্মান রক্ষে কোরেই থাকা উচিত। এ দেশের এই কালচারই একদিন ছিল; কিন্তু বর্তমানে আমাদের অহমিকা দোষে তা আমরা হারিয়ে ফেলছি। এই যে অতি সূক্ষ্ম বিচার—এককালে আমাদের ছিল এটি; কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এটি ক্রমে লোপ পেতে বোসেছে। তাঁর মতে এমন কোরে চিন্তা একদিন ভারতবর্ষেই ছিল। তার লোপ পাবার উপক্রম হোয়েছে বর্তমানে।

পাশের বাড়ির ছেলের অসুখ কোরলে আমাদের দেশে প্রতিবেশী যদি খবর না নেয় তো ত্রুটি হয়। কিন্তু ওদের দেশে সে সংবাদ নিতে যাওয়াটাই অপমানের। তারা মনে করে যে, তারা যথেষ্ট সক্ষম; প্রতিবেশীর সহানুভূতি কি সহায়তা করার চেষ্টা অপমানজনক।

শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে ভারতীয় ভব্যতা-বোধের বহু দৃষ্টান্ত আছে। সেটা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। আর দিয়েও গেছেন।

শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীনের' নায়িকা 'সাবিত্রী'—সে তো মেসের ঝি। সে দরিদ্র বোলেই মেসের ঝি। কিন্তু সে সর্বত্র নিজের মর্যাদা রক্ষা কোরে চোলতে জানে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ছিল চরিত্রের উৎকর্ষে। অর্থের খাতির অসভ্য জাতিরা কোরে থাকে। ভারতবর্ষের সভ্যতার জন্ম হোয়েছিল অরণ্যে; হর্ম্যে নয়, অট্টালিকায় নয়, উচ্চ প্রাচীরের আবেষ্টনীর মধ্যে নয়। তখন অর্থ ছিল না বড়, তখন ত্যাগই ছিল ধর্ম, চরিত্রই ছিল ধর্ম।

সেকন্দর—এশিয়া ভূভাগ ধ্বংস কোরতে কোরতে ভারতবর্ষে এসে পুরুরাজার কাছে মাথা নত করে ফিরে গেলেন। "তুমি রাজা, আমিও রাজা—তোমার কাছে আমি রাজোচিত সম্মান পাবার আশা এবং দাবী করি।" এই ছিল ভারতবর্ষের উপযুক্ত উত্তর। মানুষ মানুষের কাছে মনুষ্যোচিত ব্যবহার পাবার দাবী করে। তা যারা দিতে জানে না—তারা মর্মে মর্মে বোঝে যে ভারতবর্ষের পায়ের কাছে বোসে অনেক কিছু শিখে যেতে পারে।

ভারতবর্ষ কোনদিন লুণ্ঠন কোরতে অন্য কোন দেশে যায় নি। তারা অন্য দেশকে সংস্কৃতি দান কোরতে যেতো। শরৎচন্দ্রের বইগুলির মধ্যে এই ভারতীয় সংস্কৃতির শিক্ষা আছে।

আমাদের মনের সেই তারগুলোতে মুসলমান-ইংরেজ আমলে মর্চে ধোরে গিয়েছিল। বঙ্কিম তাকে মার্জিত কোরেছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর বর-হস্তে তা ঝংকৃত কোরে—দেশে ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কারের নোতুন কোরে উদ্বোধন কোরে গেছেন। চরিত্রহীন বইখানিতে চরিত্রহীনতা কি তাই বোলেছেন। পথের দাবীতে স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে গেছেন। পরাধীনতা নির্বীর্যের অভিশাপ—সেই কথাই বইখানির মধ্যে চমৎকার কোরে পরিস্ফুট হয়নি কি?

কেন তিনি নারীর মূল্যের মনোরথ যাচাই কোরে গেছেন? পুরুষ বীরত্ব-বীর্যের আধার। নারী ধর্মের অধিকরণ।

জাতির শৈশবে গল্প ভালো লাগে। আবার এক বয়সে সেই গল্পের অর্থ বোধ হয় এবং পরিণত বয়সে জাতি তার উপদেশকে জীবনে সফল করার প্রচেষ্টা করে। সেখেনেই মানুষ দেবত্ব লাভ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র দেশকে সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

সেই শিক্ষা আজও আমরা নিতে পারি নি। তাই আজ আমরা চোরের জাত হোয়েছি। লুটতরাজ চুরি-বিদ্যা আমরা বিদেশী বণিকের কাছে শিখেছি। তারই মহড়া আজও চোলেছে! কোটিপতিদের আজও আমরা চৌর্য পরিচেষ্টায় প্রলুব্ধ দেখছি!

* * * *

সেদিন সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল, অবশ্য আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে—অস্ত্রোপচার হোতে অসম্ভব দেরি হোয়ে যাওয়াতে।

মাদ্রাজে কি একটা বড় গোছের সভা-সমিতি বোসে যাওয়াতে কোলকাতার বড় বড় ডাক্তাররা ছুটলেন সেদিকে। শরৎচন্দ্রকে দেখা শোনার ভার পোড়লো ডাক্তার দাশগুপ্তের ওপর।

তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং সাধু-সজ্জন। মাদ্রাজে যাওয়ার আগে শরতের বাড়িতে একদিন ডাক্তারদের জমায়েৎ বোসলো।

শরৎচন্দ্র ছোট ছেলের মতো বায়না ধোরে বোসলেন। বিধানবাবুকে তিনি বোললেন, যদি কেউ অপারেশন করেন তো সে আপনাকেই কোরতে হবে। আমি যদি মরি তো—আপনার হাতেই মোরতে চাই!

বিধানবাবু হেসে বোললেন, তবে শুয়ে পোড়ুন, কাজটা সেরে দিয়ে চোলে যাই! বোলেই শরতের কেনা বিলিতি কুড়ুলখানা তুলে নিয়ে বোললেন, শুয়ে পড়ুন, কাজটা শেষ কোরে দিয়ে যাই। সে দৃশ্য দেখে সকলে হো হো কোরে হেসে উঠলেন!

হয়তো জোর কোরলে তাঁদের মাদ্রাজে যাওয়ার আগে এই কাজটা সমাধা

হোতে পারতো। হয়নি তার কারণ,—ললিত বাবু হাজার বারোশো টাকা চাওয়াতে।

"অসম্ভব" বোলে শরৎচন্দ্র এমন গোঁ ধরলেন যে—অপারেশনের কথা বোললে তিনি প্রায় ক্ষেপে উঠতে লাগলেন।

এই "হজবরল"র অবস্থায় ডাক্তারেরা মাদ্রাজ রওনা হোয়ে গেলেন।

ডাক্তার দাশগুপ্ত ছোটখাট এক্‌স্‌পেরিমেন্ট কোরে দেখতে লাগলেন সত্যই ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে। মানে, এগুলো রোগ নির্ণয়ে কোন ভুল ভ্রান্তি আছে কি-না তা ঠিক কোরে যাচাই করা। আমার হোতে পারে ভুল, কিন্তু মনে হোয়েছিল—ডাক্তারেরা অশুভস্য কালহরণম্ কোরছিলেন।

দাশগুপ্ত মশাই তখন অসুখটার সঠিক নিধারণের অক্লান্ত চেষ্টা কোরে চোলেছিলেন।

ঠিক এই সময় আর একজন ব্যক্তির সমাগম হোয়েছিল, যাঁর মনের ভাঁড়ারে অসীম শক্তির সমাবেশের পরিচয়ে অবাক এবং উৎফুল্ল হোয়ে যেতে হয়। তাঁর কাছে কোন বাধা বাধাই নয়! কোন কাজই অসম্ভব নয়। তার ওপর, দেখা গেল শরৎচন্দ্রের ওপর তাঁর অপরিমেয় ভক্তি। আবার সংগে আছেন তাঁর অর্ধাংগিনী; তাঁর বুদ্ধিটি অতি ধীর এবং শান্ত! মাদ্রাজের মিটিং-এ গেছেন ডাঃ রায় এবং ডাঃ কুমুদশংকর। তখন ডাক্তার দাশগুপ্ত ধীর শান্ত অভিনিবেশে অশুভস্য কালহরণম্ কোরে চোলেছেন। আর আমাদের মতো মূঢ়মতি ব্যক্তিদের মাথায় "চক্রম্ ভ্রমন্তি!" শরৎচন্দ্রের বজ্রমুষ্টি থেকে একটি ফুটো পয়সাও গলে না! সে যে কি অবস্থা, তা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই! দিন যায় তো ক্ষণ যায় না!

এক্স-রে যখন চোলছিল তখন শরৎচন্দ্র ছোটদের গল্প লিখে দিচ্ছিলেন এম. সি. সরকারদের। সেখানে গিয়ে সব কথা বলাতে বেশ কিছু মোটা টাকা পাওয়া গেল। এক্স-রের দাম সম্বন্ধে তিনি পরিষ্কার কোরে বোললেন যে, অনেক টাকা ডোনেশন দিয়েছেন—অতএব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। ললিত বাবুর কি সম্ভব কুমুদ বাবু দিয়েছিলেন। টাকা পাওয়াতে সেগুলো মিটিয়ে দেওয়া হোল।

একদিন মুকুল বাবু ডাঃ ম্যাকেকে নিয়ে এলেন। তিনি পরীক্ষা কোরে বোললেন, বাড়ি থেকে এঁর চিকিৎসা চোলতেই পারে না। শীঘ্র সরিয়ে ফেলা দরকার।

উপায় ?

ডাক্তারের জানা নার্সিং হোমের নাম বলাতে সেখানে ফোন কোরে দেওয়া হোল এবং অচিরে ব্যবস্থা হবে, উত্তর এলো। টাকা জমা দিতে হবে।

ম্যাকে সাহেব এবং মুকুলচন্দ্র গিয়ে সব ঠিক কোরে এলে সাজো সাজো রব পোড়ে গেল।

* * *

যথাকালে পৌঁছে সেখানে তাদের ভড়ং দেখে আমরা তো মনে কোরলাম, জীবন্ত অবস্থায় শরৎচন্দ্রের স্বর্গবাস শুরু হোয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র চিৎ হোয়ে গদির উপর শুয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার কোরে ধরালেন।

সংগে সংগে যেন বিদ্যুৎ চোমকে গেল। এক নার্স ক্ষিপ্র গতিতে এসে মুখ থেকে সিগারেটটি টেনে নিয়ে মিহি স্বরে বোললেন, দিস্ ইজ নট অ্যালাউড হিয়া—

ব্যস—মনে মনে মনে যুদ্ধ শুরু হোল তখনি। তারপর ম্যাকে এসে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, দেখা করার সময় ভিন্ন অন্য সময় কোন লোককে আসতে দেওয়া হবে না। দেখা করার সময় লেখাই ছিল। অতএব আমাদের জানতে দেরি হোল না।

অনেক কাপড়-চোপড়, একটা খুব দামী জুতা—ইত্যাদি ইত্যাদি সংগে এসেছিল। সেগুলি রেখে আমাদের অনতিবিলম্বে বাড়ি চোলে যেতে হোল। কেন না, শরৎচন্দ্র সেখেনে কিছুতে থাকবেন না বোলে বায়না ধোরলেন।

* * *

টাকাকড়ির সঠিক হিসেব মনে নেই, তবে বেশ কিছু মোটা টাকাই জমা দিতে হোয়েছিল।

আমরা গুপ্‌তড় কোরে বেরিয়ে গেলাম। ডাঃ ম্যাকে বোললেন—সকালে ৮-৯র মধ্যে ভিজিটিং-আওয়ার। বিকেলে ৫-৬ টা।

তথাস্তু!

বাড়ি ফিরে দেখলাম—বড়মার কান্না চোলেছে ঢিমে তালে।

প্রকাশকে বোললাম—তোমরা বিকেলে যেও, আমার সংগে।

বিকেলে গিয়ে শরৎকে একটুও খুশী দেখতে পেলাম না। জলের মাছ ডেংগায় তুললে যা হয়। কিছু জিজ্ঞেস কোরতে সাহস হয় না। চেহারাটা অপ্রসন্নতায় ভরা!

জিজ্ঞেস করি করি কোরছি, শরৎ নিজেই বোললেন, এখানে পোষাবে না আমার।

কেন বল তো?

এরা নেটিভদের সংগে মানুষের ব্যবহার করে না। মনে করে আমরা জানোয়ার। দেখি চব্বিশ ঘণ্টা; কাল তোমায় বোলবো। ভদ্দর লোক ঐ ম্যাকে সায়েবটি—আর সব অভদ্র পাজি।

পরের দিন সকালে এসে যা দেখলাম তাতে বুঝলাম যে, কি একটা মহামারি ব্যাপার ঘোটে গেছে রাতে।

ম্যাকে সাহেব—অতিরিক্ত গম্ভীর। কর্ত্রী মেম আমাকে ডেকে বোললেন, রুগীকে না-রাখাই স্থির কোরেছি,—তুমি অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর। আমি দুঃখিত।

পরে ডানহাম এসে,—আমাকে অনেক হাত পা নেড়ে উপদেশ দিলেন। তিনি নন সাত আট ফুট আর আমি ৪।৫ ফুটের বেশী হব না। মোট কথা এই বুঝলাম যে, রুগীকে যত শীঘ্র সরিয়ে নিতে পার নেও। ম্যাকে বোললেন, "রাখা অসম্ভব। আমি খুব দুঃখিত এবং লজ্জিত।"

তাড়াতাড়ি শরৎচন্দ্রের সংগে দেখা কোরতে গেলাম। উঁরা কোন কথা ঠিক কোরে বলাটা অভদ্রতা মনে কোরিলেন। শরৎচন্দ্র সংক্ষেপে যা বোললেন তাতে বুঝলাম যে, নার্সদের সংগে খণ্ড-প্রলয় হোয়েছে রাতে এবং তারা

আর শরৎচন্দ্রের ঘরে কেউ আসতেই চায় না এবং আসবেও না। সম্পূর্ণ নন-কোঅপারেশন।

ভগবানের নাম স্মরণ কোরতে কোরতে পথে বার হোয়ে দেখি কুমুদ বাবু চোলেছেন। অর্থাৎ মান্দ্রাজ থেকে ফিরেছেন। তিনি গাড়ি থামিয়ে সব কথা শুনে বোললেন, যদি নার্সিং হোম না পাওয়া যায় তো বাড়িতে ফিরিয়ে বাইরের ঘরে রাখতে হবে। ওখেনে রাখা আর চোলবে না।

একবার দেখবেন না।

নাঃ। আমার যাওয়া ঠিক হবে না। তবে যদি নার্সিং হোম পান তো আমি সংগে কোরে নিয়ে যেতে পারি। খবর দেবেন। ৫টা আন্দাজ আমার বাড়িতে আসবেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা কোরবো।

* * * *

শুনেছিলাম আমার এক দূর সম্পর্কের নাতির একটি নার্সিং হোম আছে। তাঁর ঠিকানার নম্বর না জানলেও খানিকটা খোঁজ কোরে পাওয়া যেতে পারে মনে কোরে—হাঁটতে লাগলাম; আর ভব্য গোছ লোক দেখলে জিজ্ঞেস করি,—মশাই, কাছাকাছি কোথাও 'নার্সিং হোম' আছে বোলতে পারেন?

বেলা বারোটার সময় এক নার্সিং হোমে গিয়ে পৌঁছলাম। ডাক্তারটি ফিরেছেন। ঢুকে পোড়ে জিজ্ঞেস কোরলাম, মশাই, আপনার কি নার্সিং হোম আছে?

আছে।

দেখতে পাই কি?

চলুন দেখাই।

দেখলাম ওপরে তিনি থাকেন আর নীচের গোটা তিন চার ঘরে-নার্সিং হোম।

জিজ্ঞেস কোরলাম—কি রেট আপনার?

ঘর অনুসারে।

বড় ঘরটার কি চার্জ হবে?

বারো টাকা দিনে।

শুধু ঘরের চার্জ, না নার্স শুদ্ধ; আপনিই তো ডাক্তার?

সব পাবেন। নার্সের চার্জ আপনাকে দিতে হবে না। তবে ওষুধ-পত্রের দাম লাগবে।

তা তো স্বাভাবিক।

আপনাদের বাড়ি কোথায়?

আপনি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে চেনেন?

চিনি বই কি,—তাঁকে কে না চেনে!

আমি তাঁর সম্পর্কে মামা হই।

কোথায় বাড়ি আপনাদের?

ভাগলপুরে।

কি নাম আপনার?

সুরেন গাঙ্গুলি।

আপনাকে তো আমি চিনি।

বটে? কি রকম?

আমি, অখিল বাবুর ছেলে।

তাহলে তো সম্পর্কে নাতী নও। কি নামটি তোমার?

সুশীল।

সুশীল, ঐ বড় ঘরটা ঠিক কোরে রাখ। রাতেই বোধ হয় শরৎচন্দ্রকে নিয়ে কুমুদ বাবু আসবেন।

আপনি?

আমিও।

সুশীল, তোমার 'ফোন' আছে?

আছে দাদু।

একবার কুমুদবাবুকে (শঙ্কর) ডেকে দেবে?

নিশ্চয়।

কুমুদ বাবু, নার্সিং হোম পেয়েছি। আপনাকে আসতে হবে।

নিশ্চয় যাব।

নম্বর বোলে দিলাম। এবং সেখেনে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মন বলে,—এমন সুন্দর যোগাযোগ, তাহলে হয়তো বাঁচান যাবে!

*   *   *

সেই মেম সাহেবের নার্সিং হোম থেকে শরৎচন্দ্রকে কোন প্রকারে বার কোরে আনা গেল। ঢোকা হোয়েছিল বহু জিনিসপত্র নিয়ে—বেশী কি বোলবো—জুতো জোড়াটা পর্যন্তও পাওয়া গেল না! কি লজ্জা! সুটকেশ খালি। সব কিছু নাকি "ধোবী" বাড়ি যাত্রা কেরেছে!

অলমতি বিস্তরেন!

পরে মোটা দাবী এসেছিল। তা তো পরিশোধ করা হোয়েছিল, এমন কি ডাঃ ডানহ্যামের ফি পর্যন্ত!

*   *   *

শরৎচন্দ্র সকালে আমায় ডেকে বোললেন, দেখ, এদের দুটো নার্সই ইংরেজিতে কথা কয়। আমার ওদের সংগে ইংরেজিতে কথা কইতে বড় 'স্ট্রেন' হয়। সুশীলকে বোলে আমার জন্যে একজন বাঙালী নার্স ঠিক কোরে দিলে বেশ হয়। তার চার্জ আমিই দেব।

সে ব্যবস্থা হোল।

শরৎচন্দ্রকে দেখতে বহুলোক আসতে লাগলেন। সকলেই গিয়ে দেখা কোরতে চান।

শরৎচন্দ্র আমায় বোললেন, দেখ, আমার এই অবস্থায় সকলের সংগে দেখা কোরতে হোলে ভারি 'স্ট্রেন' হয়। সবাইকে আমার ঘরে না আসতে দিলে ভাল হয়।

আর একটা কথা—বিলাস আমাকে দুটো ক্যানেরি পাখি দেবেন বোলে-ছিলেন। বোধ হয় ক্রিস্‌মাসের ছুটিতে তিনি আসবেন। তাঁকে তুমি একটা খবর দিয়ে দাও। যদি আনেন।

যথাকালে পাখি দুটি এলো এবং তাঁর ঘরে রাখা হোল। তারা সারাদিন গান কোরতো। শরৎ শান্ত হোয়ে সেই গান শুনতেন।

একদিন আমাকে বোললেন, দেখ, তোমার মনে আছে বোধহয় যে সামতায় আমি গোলাপ বাগান কোরেছিলাম। একটা গোলাপের টব দিতে পার কি ?

সে ব্যবস্থাও হোল।

হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস কোরলেন, তুমি রাতে কি বাড়িতে শুতে যাও ?

না, এখানেই থাকি।

কোথায় থাক ?

গাড়িতে শুয়ে থাকি।

কষ্ট হয় তো!

না, অব্যেস হোয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে তিনি বোললেন, তুমি বাড়ি চোলে যাও, তোমার ভারি কষ্ট হোচ্ছে।

হেসে সে কথা উড়িয়ে দিলাম। তোমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তবে যা করবার কোরবো।

কেন ? সে তো ঠিক হোয়ে গেছে। তুমি আমার কোলকাতার বাড়ির বাইরের অংশে থাকবে। আর বৌ থাকবেন ভেতরের দিকে। আর প্রকাশরা সামতার বাড়িতে। পুকুর আছে, জমি আছে, তারও কোন কষ্ট হবে না। তা ছাড়া বইএর ইন্‌কম্‌ আছে। আমি হাসতে লাগলাম!

হাসছো যে ?

আনন্দে! আর তুমি কোথায় থাকবে ?

আগে বাঁচি তো!

* * *

সেদিন বিকেলের দিকে বিধান বাবু ডেকে পাঠালেন, আমাদের নার্সিং হোমে এসে। প্রকাশ ও আমি যেতেই বোললেন, শরৎবাবুর অপারেশন না হোলে তিনি পরশু মারা যাবেন। অপারেশন করা চাই, কি বলেন ?

প্রকাশচন্দ্র কেঁদে বুক ভাসাতে লাগলেন। বিধানবাবু আমার দিকে ফিরে বোললেন, আপনি কি বলেন ?

অপারেশন কোরতেই হবে ; কিন্তু টাকা আমাদের হাতে নেই। তার ব্যবস্থা না হোলে,...শুনেছি ললিত বাবুই ১২।১৩ শ' টাকা চান!

সে ব্যবস্থা আমি কোরবো। তাঁকে চারশো টাকায়...

*   *   *

যাঁরা একদিন বোলেছিলেন টাকার প্রয়োজন হোলে দেবেন, তাঁহাদের টাকার কথা বলাতে তাঁর মাথা চুলকে তাইতো! তাইতো!! কোরতে লাগলেন।

অবিনাশ ঘোষাল আমাকে সংগে কোরে নানা স্থানে ঘুরে এক জায়গা থেকে সংবাদ আনলেন যে, শরৎচন্দ্রের সব বইগুলোর সিনেমা-রাইট্ বিক্রি কোরলে ছ' হাজার টাকা পাওয়া যেতে পারে। সে প্রস্তাব শরৎচন্দ্রের কাছে কোরতে আমার সাহস হোল না। অগত্যা হরিদাস বাবুর কাছে যাওয়া ছাড়া আর গতি রইল না।

গেলাম। তিনি হাজার টাকা দেবেন বোললেন, প্রকাশচন্দ্রের সই পেলে।

অগত্যা প্রকাশচন্দ্রকে সংগে কোরে তাঁর কাছে উপস্থিত হোলাম। তিনি হাজার টাকা দিলেন।

অপারেশনের খরচ বাবদ প্রায় হাজার টাকার একটা ফর্দ দিলেন কুমুদ বাবু। চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল থেকে তোড়-জোড় আনতে বেশ অনেক টাকা খরচ হোল।

অপারেশন হোল। তাতে দেখা গেল যে যকৃৎটা একেবারে পোচে গেছে। সাময়িকভাবে কাজ চালাবার জন্যে একটা নল বসিয়ে দিয়ে—তরল খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা মাত্র হোল। টাকা যা খরচ হোল তা পাঁচ ছ' শোর কম হবে না।

ললিতবাবু বোললেন, বৃথা নার্সিং হোমে রেখে টাকা খরচের প্রয়োজন কি? বাড়ি নিয়ে যান। অস্ত্রের পর ললিতবাবু আর ফি নেন নি।

বাড়িতে তাঁকে নীচের হল ঘরে রাখার ব্যবস্থা হোল। ললিত বাবু রাত নটা দশটার সময় এসে দেখে বোললেন, কাল ভোর ছটার সময় অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে এসে আমি বাড়ি পৌঁছে দেবো।

সব ঠিক হোল। সন্ধ্যের কিছু আগে আমি বাড়িতে খেতে যাবার সময় শরৎকে বোললাম,—কাল সকালে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব। একটি কথা মনে রেখো—মুখ দিয়ে কিছু খাবে না। শরৎ বোললেন, দেখ, তুমি আমাকে খুব চেন। কারণ না বোললে আমি কোন আদেশ উপদেশ মানিনে; বুঝিয়ে দাও,—কেন খাব না।

মুখ দিয়ে খেলে তোমার নিশ্চয় বমি হবে। যদি বমি হয় তো পেটের সব বাঁধন কেটে গেলে আর রক্ষা করা যাবে না। এতো অতি সহজ কথা।

শরৎ আদর কোরে আমায় গায়ে হাত বুলিয়ে বোললেন, এবার তুমি আমাকে খাইয়ে দিয়ে যাও।

খাওয়ান, মানে টিউবে কোরে—আঙ্গুরের রস খাইয়ে দিয়ে বোললুম,—খেতে যাচ্ছি। নটা দশটার সময় ফিরবো।

শরৎ বোললেন, কেন কষ্ট কোরে আসবে?

বাঃ—সকালে ললিত বাবু এসে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন, ঠিক হোয়ে গেছে। আজ তোমার খাট, বিছানা বাইরের ঘরে আনা হোয়েছে। এখেনে থেকে মিছে খরচপত্র হচ্ছে। তুমি একটু সারলে—তোমাকে কুমুদবাবু ইয়োরোপে নিয়ে গিয়ে উচিত ব্যবস্থা কোরে ফিরিয়ে আনবেন।

* * *

বাড়ি এলাম। বড়মাকে বোললাম, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে আজ—কাল সকালে শরৎকে বাড়ি আনতে হবে।

খেতে বোসলে ছোট মা (প্রকাশচন্দ্রের স্ত্রী) এসে বোসে বোললেন,—তাঁকে সংগে আনলেন না কেন?

আসার সময় তাঁকে দেখতে পাইনি। আমি হেঁটে এসেছি। এক্ষুনি খেয়েই ফিরবো। এমন সময় প্রকাশ এসে বোললেন, দাদা বোলে দিলেন—আপনি সকালে যাবেন। আমি গাড়ি ছেড়ে দিলাম।

বেশ,—আমি হেঁটেই যাব।

কি দরকার? প্রকাশ বোললেন।

উত্তরে বোললেম,—শেষ রক্ষা দরকার, হেঁটেই যাব।

হেঁটে যাবার সময় দুই বৌ আমার যাওয়ায় বাধা দিতে লাগলেন।

বোকা মানুষ তো,—তাঁদের তুষ্ট কোরলাম!

তখন রাত দুটো হবে। ফোন্ বেজে উঠলো।

কে?

রয়টার।

ইংরাজিতে প্রশ্ন হোল: ডাঃ চাট্টার্জি কেমন?

ভালই।

কোথা থেকে বোলছেন?

বাড়ি থেকে।

ফোন্ স্তব্ধ হোল।

বড়মা দৌড়ে এলেন। কি মামা?

কিছু না,—কাগজওয়ালারা জানতে চাচ্ছে।

শুনে মনে হোল কিছু একটা গোলমাল হোয়েছে। রয়টার জানতে চায় কেন?

নার্সিং হোমে ফোন্ কোরতেই জবাব এলো—ডাঃ চ্যাটার্জি বমি কোরছেন।

সর্বনাশ!

উঠে পোড়লাম। ছুটে পাইখানায় যাচ্ছি—বড়মা বেরিয়ে বোললেন, কি হোয়েছে মামা?

আমাকে যেতে হবে।

চা কোরে দি? বোলে তিনি ষ্টোভ জাললেন।

চা খেয়ে—তখনও বেশ অন্ধকার—ছুট দিলাম।

পৌঁছে দেখি শরৎচন্দ্র বমি কোরছেন এবং মৃত্যুঞ্জয় পাশে দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকতেই তিনি অদৃশ্য হোলেন।

একি শরৎ?

আমি মুখ দিয়ে আফিং-এর জল খেয়ে—

চারিদিক অন্ধকার দেখলাম!

ডাঃ সুশীলকে ডাকতে তিনি এলেন।

তিনি ফোন্ কোরলেন কুমুদবাবুকে। তিনি এলেন।

বমির পর বমি!

অবশেষে শরৎচন্দ্রের জ্ঞান লোপ হোল। আমাদের সকল প্রচেষ্টার শেষ হোল।

ললিত বাবু এলেন।

ফিরে গেলেন।

এইখেনেই শরৎচন্দ্রের জীবনের বিয়োগান্ত নাটকের শেষ!

অলমতি—?

॥ ওরিয়েন্টের জীবনী সাহিত্য ॥

মনীষী-জীবন কথা, ১ম ভাগ—সুশীল রায়	২৲
মনীষী-জীবন কথা, ২য় ভাগ—সুশীল রায়	২৲
আমাদের গান্ধীজি—ধীরেন্দ্রলাল ধর	৬৲
গান্ধী-চরিত—ঋষি দাস	৪॥০
সেকস্‌পিয়র—ঋষি দাস	৬৲
বার্নার্ড শ'—ঋষি দাস	৪॥০
বন্দী-জীবন—ধীরেন্দ্রলাল ধর	২৲
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মচরিত	১০৲
রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত	৪৲
মাহাত্মা গান্ধী—রোমাঁ রোলাঁ	২॥০
বিবেকানন্দের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ	৬৲
রামকৃষ্ণের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ	৬৲
ভগবান বুদ্ধদেব—কৃষ্ণধন দে	২৲
অমিতাভ—ইন্দিরা দেবী	১।০
জীবন-খাতার কয়েক পাতা—সুনির্মল বসু	৩॥০
স্বপনবুড়োর শৈশব—স্বপনবুড়ো	৩৲
নব যুগের মহাপুরুষ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	৬৲
সাধিকামালা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ	৬৲
আবুল কালাম আজাদ—ঋষি দাস	২৲

॥ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি ঃ কলিকাতা-১২ ॥

॥ ওরিয়েন্টের সমালোচনা ও প্রবন্ধ সাহিত্য ॥

মহামতি বিদুর—মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্য বেদান্ততীর্থ	৩৲
ভক্ত কবীর—অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দাস	৫৲
কি লিখি—আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	৩৷৹
বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত	৫৲
রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ, ১ম খণ্ড—প্রমথনাথ বিশী	৪৲
রবীন্দ্র-বিচিত্রা—প্রমথনাথ বিশী	৪৲
রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১২৲
রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১০৲
বাংলার বাউল ও বাউল গান—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১৫৲
বৈভাষিক দর্শন—অনন্তকুমার ভট্টাচার্য ন্যায়তর্কতীর্থ	২০৲
গান্ধী ও মার্কস—কিশোরীলাল মশরুওয়ালা। ভূমিকা আচার্য বিনোবা ভাবে	৩৲
বাঙালী সংস্কৃতি-প্রসঙ্গ—অধ্যাপক গোপাল হালদার	৪৲
বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড—কবিশেখর কালিদাস রায়	১০৲
গান্ধীবাদের পুনর্বিচার—এন. এম. দান্তওয়ালা	৸৹
অহিংস বিপ্লব—আচার্য জে. বি. কৃপলানী	৷৹

॥ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি : কলিকাতা-১২ ॥